আঁধার রাতের বন্দিনী

আমীরুল ইসলাম

আঁধার রাতের বন্দিনী

৪

রচনায়
আমীরুল ইসলাম

সম্পাদনায়
শিবলী সাদিক

প্রকশনায়
নাঈমা প্রকাশনী

আধাঁর রাতের বন্দিনী

৪

রচনায়

আমীরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

প্রকাশ কাল

জুলাই ২০০৭ইংঈসায়ী

বর্ণ বিন্যাস

মর্নিং সান কম্পিউটার

বাংলাবাজার ঢাকা

দুরালাপনী-০১৮১ ৮৮০৩০৮২

ডিজাইন

রোমান এন্টার প্রাইজ

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড

ঢাকা ১১০০
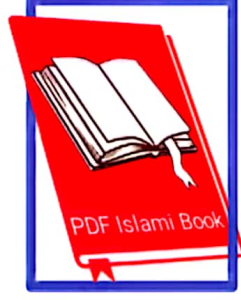
মূল্য ঃ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র।

PRICE : TAKA ONE HUNDRED FORTY ONLY

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দুত, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর মহান সাহাবাগণ এবং পরিবার- বর্গের প্রতি।

আর তোমার রহমত প্রস্রবণ উছলে প্রবাহিত হোক সেই রাসূল (সাঃ)এর সমস্ত উম্মতের উপর।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনমুক্ত রুচিশীল সাহিত্য সভ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তির আত্বার খোরাক যোগায়। যে কোন একজন পর্যটক সাহিত্যের সিঁড়ি বেয়ে স্বীয় অবিজ্ঞতা কে অন্যের সামনে সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সুন্দর পৃথিবী অপরূপ প্রকৃতির এই দৃশ্যাবলীর বর্ণনা সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে কখনো অসম্ভবের কিছুই নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সাম্প্রতিককালের কিছু সংখ্যক স্বার্থপর নাট্যগ্রন্থ, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও অনৈতিক গল্প রচনা করে সমাজকে কলুষিত করে তুলছে। যুব সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অশলীলতার গহীন অরণ্যে।

সুতরাং পাশ্চাত্য ও অশালীনতায় ছেয়ে যাওয়া এই কলুষিত সমাজকে, ইসলামি ভাবধারা সম্পন্ন গল্প-কাহিনী,উপন্যাস ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের একটি স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণে আমাদেরকে সহযোগিতা করলেন উপন্যাস জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাসিক জনাব আমীরুল ইসলাম সাহেব।

তিনি রচনা করেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক উপন্যাস। দ্বীনপ্রিয় এই লেখকের হৃদয় ভেদ করে বের হয়ে এসেছে শীরা-উপশিরায় ঢুকে পড়া অপসংস্কৃতির দাবানলের কাব্যগুলি। আর সেই দাবানল ইসলামের শ্বাশ্বত সুন্দর আদর্শ দিয়ে নির্বাপিত করেছেন লেখক তাঁর "আঁধার রাতের বন্দিনী" নামের এই বইটিতে।

অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় কালচার অবসান হয়ে ইসলামের সোনালী আদর্শের নব জাগরণ, নব উত্থান যাদের লালিত স্বপ্ন, আঁধার রাতের বন্দিনী বইটি সেই সব পাঠক- পাঠিকাদের হৃদয়ের খোরাক হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি সর্ম্পুণ নিখুঁত ও নির্ভুল করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরও মানুষ যেহেতু ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়, অজ্ঞাতসারে কোন ভুল থেকে যাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই কোন সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে সদয় অবগতির বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে, তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই জ্ঞানসাধকের বইটি পড়ে দিশেহারা মানুষ যদি সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং পার্থিব জীবনের মোহ পরিত্যাগ করতঃ পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহে আত্বনিয়োগ করে তবেই আমাদের এই শ্রম ও প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত
পরিচালক
নাঈমা প্রকাশনী, ঢাকা।

দু'টি কথা

প্রিয় পাঠক- পাঠিকা ইসলামি উপন্যাস জগতে জনাব **আমীরুল ইসলাম** এক জন সুপরিচিত লেখক। তার খুরধার লেখনিতে রাশিয়া আফগানসহ অন্য সব মুসলিম দেশে মুসলমানদের উপর যে জুলুম নির্যাতন হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে, মুসলমানরা উক্ত জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুগে যুগে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

আশা করি ঘুমন্ত মুসলিম তরুণ তরুণিরা এ উপন্যাস পাঠে গাঁ ঝাড়া দিয়ে নতুন উদ্দিপনায় জেগে উঠার প্রয়াস পাবে। আমি আশাবাদি আপনারা এই উপন্যানটি পড়ে কিছুটা হলেও সাহিত্য রসের সন্ধান পাবেন,সাথে সাথে আফগান সমরকন্দ রাশিয়া উজবেকিস্থান সহ এঅঞ্চলের অন্য সব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন,

বইটি নিঁখুত ও নির্ভুল করতে যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। মানুষ যেহেতু ভুল ত্রুটির উর্ধে নয়,অজ্ঞাতসারে ভুল থেকে যাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, আপনারা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি। আমি লেখক ও প্রকাশকের দীর্ঘায়ু কামানা করছি।

সম্পাদক
শিবলী সাদিক
তারিখ ঃ ২১/০৭/০৬ ইং

ঃ স্বরণে ঃ

যারা এযুগের শ্রেষ্ঠ সাধক
যারা এযুগের শ্রেষ্ঠবীর,
যাদের দ্বারা হয়েছে চূর্ন
কুফুরী তাগুতের গর্বশীর॥
যারা মা-বোনের ইজ্জত লাগি
করেছে কঠিন মরণ পণ,
যারা মুমিনের শোণিত বদলা
নিতে বিলিয়েছে আপন ধন॥
যারা জ্বেলেছে দ্বীনের চেরাগ
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে,
যারা দ্বীনের ঝান্ডা বয়ে
ঝড় তুফানে যায় এগিয়ে॥

তাঁদেরই দুই সহ যাত্রী
মোল্লা উমর বীর উসামা,
হাত ছানিতে ডাকছে আমায়
বাজিয়ে সেই রণ দামামা॥
আঁধার রাতের বন্দিনী আজ
সপে দিলাম তাঁদের হাতে,
বিশ্ব মুসলিম উঠুক জেগে
ইসলামেরই ঘোর প্রভাতে।।

শ্রদ্ধাবনত
আমীরুল ইসলাম
১৮/০৯/০৪ইং

[এক]

আমি জিহাদের তাবলীগ করতে আমার পাগলা ঘোড়া দাবরিয়ে আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ী এলাকা চষে বেড়াতে লাগলাম। আফগান রাষ্ট্র পতি মহামতি নাদির শাহ আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমার যাবতীয় সুবিদা অসুবিদার খোঁজ নিচ্ছেন । আমি প্রতিটি প্রদেশে প্রদেশে, শহরে শহরে, মসজিদে মসজিদে ঘুরে ঘুরে বলসেবিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য দাওয়াত দিতে লাগলাম। বিরামহীন ভাবে ৩ মাস পর্যন্ত দাওয়াত দিয়ে ১৫ জন যুবক সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর এ কয় জন দ্বারাই এক নির্জন উপাত্যকায় ট্রেনিং সেন্টার খুলে দিলাম। এ সব যুবকরা সবাই তাসকন্দ, সমর-কন্দ, ও বুখারার। কেউ মাদ্রাসার ছাত্র, আবার কেউ বা স্কুল-কলেজের । এদের মধ্যে দু,এক জন অশিক্ষিতও রয়েছে। আমার প্রশিক্ষণ শিবির কাবুল থেকে ২০ ক্রোশ উত্তরে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়। সহজে সেখানে কোন ইনসান পৌছতে পারবে না।

রণকৌশল বা যুদ্ধ বিদ্যা কঠিন একটি বিষয়। সত্য কথা বলতে কি ! নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এ বিদ্যা আমি অর্জন করতে পারিনি। বিভিন্ন জন থেকে কিছু কিছু বিদ্যা অর্জন করেছিলাম। এটা পর্যাপ্ত পরিমাণ নয়। এপর্যন্ত যে সব অভিযান পরিচালনা করেছি, তা এক মাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের খাস রহমতে। এখন আমার ইচ্ছা, ভাল একজন উস্তাদ পেলে আমি আবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করব। তাই মহামতি নাদির শাহের নিকট তাঁর সেনাবাহিনী থেকে এক জন কমান্ডার দেয়ার জন্য আবেদন জানালে, তিনি আমাকে দুজন উস্ত্মাদ দিলেন। একজন হলেন অবসর প্রাপ্ত গেরীলা কমান্ডোর প্রধান, আর এক জন হলেন অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। ওনাদেরকে পেয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের শোকর আদায় করলাম। প্রাথমিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস। আমি ৩ মাসের যাবতীয় খরচ নিজেই বহন করলাম। পোষাক, খাদ্য, ঔষধ, তাঁবু ছাড়াও প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে দিলাম।

আমরা প্রশিক্ষণ শিবিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে মাহমুদা বললো. " প্রিয়তম ! আপনারা উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য যাচ্ছেন, আমি কি ঘরে বসে

থাকব ? আপনিতো বলেছিলেন, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়,তখন নারী পুরুষ থেকে নিয়ে না-বালেগ ছেলে-মেয়েদের উপরও ফরয হয়। আমার ইচ্ছা আমিও আপনার সাথে যাব। আপনারা ময়দানে প্রশিক্ষণ নেবেন, আর আমি খিমার অভ্যন্তরে আপনাদের দেখে দেখে সেগুলোর অনুশীলন করব। আশাকরি আমার প্রস্তাব অনুগ্রহ করে কবুল করবেন।

মাহমুদার প্রস্তাব আমার নিকট খুবই পছন্দ হল। আমি তাকে আমার অন্তরস্থল থেকে অসংখ্য মোবারক বাদ জানিয়ে বললাম, প্রিয়তমা! তোমার প্রস্তাব নিয়ে আমি এক্ষনি আমাদের কমান্ডার সাহেবের নিকট যাচ্ছি, তাঁর এযাযত ছাড়া তো হবে না। এই বলে আমি ঘোড়া দাবরিয়ে কমান্ডার সাহেবের নিকট গিয়ে মাহমুদার দিলের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। কমান্ডার সাহেব আমার কথা শোনে থ হয়ে গেলেন, একটু চিন্তা করে নিয়ে এযাযত দিলেন। অতঃপর আমরা চলে গেলাম প্রশিক্ষণ শিবিরে।

কমান্ডার সাহেব সর্বপ্রথম আমাদেরকে সেনাবাহিনীর স্তর বা পদবী গুলো শিক্ষা দিলেন। তার পর কার কি দায়িত্ব তাও বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর আরম্ভ করলেন শারিরীক কসরত। শরীর গঠনের ব্যাপারে আমাদেরকে যে ধরনের কষ্ট করতে হয়েছে তা নিম্মরূপ–

১। দৌড়। (ক)সমতল ভূমিতে জুতাসহ ১ ঘন্টা

(খ)সমতল ভূমিতে জুতা ছাড়া ১ঘন্টা

(গ)জুতাসহ পাহাড়ে ১ঘন্টা

(ঘ)জুতা ছাড়া কংকরময় ও পাহাড়ী ভূমিতে ১ঘন্টা

প্রতিদিন একাধারে ৪ঘন্টা দৌড়া-দৌড়ি করা বাধ্যতামূলক। জুতা পড়া বা জুতা খুলার যত টুকু সময় লাগে এত টুকু বিশ্রাম। তাছাড়া কোন বিশ্রাম নেই। এর মধ্যে জীবন চলে গেলেও পানি পান করার এযাযত ছিল না।

২। শারিরীক ব্যায়াম।

(ক) মাথার কয়েক প্রকার

(খ) সীনার (বক্ষের) কয়েক প্রকার

(গ) বাহুর কয়েক প্রকার

(ঘ) পেটের কয়েক প্রকার

(ঙ) হাঁটুর কয়েক প্রকার

(ছ) পায়ের কয়েক প্রকার

অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেকটা অঙ্গের বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম করাতে লাগলেন। কংরময় প্রান্তরে করলিং করে প্রতি দিন এক হাজার মিটার যেতে হত। প্রথম এক মাস পরিমানে কিছু হালকা ছিল দিন যতই বাড়তেছিল ট্রেনিং ততই কঠিন থেকে কঠিনের দিকে যাচ্ছিল। প্রথম দিকে খাবার দেয়া হত দুই বেলা, তার পর কমিয়ে এনে সারাদিনে দেয়া হত এক বেলা আর পানি এক লিটার। এক মাসের মধ্যে আমাদের ১৬ জন সাথীর মধ্যে দু'জন রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। তার পর থেকে রাতের বেলায় আমাদেরকে লোহার শিকল দিয়ে বেধেঁ রাখা হত। প্রথম দিকে দু দিনে এক বার গোসলের ছুটি দেয়া হত। তার পর আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে ১৫ দিনে এক বার গোসলের ছুটি দেয়া হত। আমরা সবাই প্রায় দেড় মাসে মরনাপন্ন অবস্থায় উপনিত হলাম। আমাদের চিকিৎসার জন্য কাবুল থেকে সরকারী হাসপাতালের বড় ডাক্তার আনা হল। ডাক্তার এসে আমাদের চিকিৎসা করলেন এবং এক সপ্তাহের বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। উক্ত ডাক্তার সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার নিকট জিহাদ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলেন, আমি যথা যথভাবে কুরআন ও হাদিসের আলোকে তা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। আমি ডাক্তার সাহেবের পরিচয় জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বললেন,"আমার নাম ডাক্তার আমানুল্লাহ্ মিকাইলী। বাড়ী উজবেকিস্থান। আমি ১০ বৎসর যাবৎ কাবুলে চাকুরীরত আছি। বর্তমানে আমি কাবুলের নাগরীক। এখানে আমি বাড়ী করে আছি। আমার পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে বলসেবিকরা শহীদ করে দিলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে কাবুল নিয়ে আসি। সেখানে এখনো আমাদের বাড়ী ঘর ও জায়গা জমি রয়েছে। সে জায়গা জমি বিক্রয় করে একেবারে চলে আসার চিন্তা করতেছি। এতটুকু আলাপের পরে কমান্ডার বাঁশী বাজালে আমরা সবাই গিয়ে মাঠে জমা হলাম। এদিকে ডাক্তার সাহেব চলে গেলেন, আর কোন আলাপ করার মওকা মিলেনি। তবে তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, জিহাদের ফান্ডে তিনি মোটা অংকের সাহায্য দিবেন। এক সপ্তাহে আমাদের শারিরীক অবস্থার অনেকটা উন্নতি হলেও নতুন আইটেমের প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ায় আবার ক্লান্ত হয়ে পরি। আমি আমার সাথীদেরকে এই বলে শান্তনা দিতে লাগলাম যে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করলে ঈমান থাকে না। প্রশিক্ষণ এটাও জিহাদের মধ্যে সামিল। আমরা যদি প্রাথমিক ট্রেনিং নিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করি তাহলে

এটা হবে শাহাদাৎ, এতে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে তাদের ভগ্ন হৃদয়ে শান্তনা দিতে লাগলাম।

একাধারে দুই মাস প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আমাদের নিকট প্রশিক্ষণের কলা-কৌশলগুলো অনেকটা হালকা মনে হচ্ছিল। আমরা ১৫ থেকে ২০ কেজি ওজনের মালামাল পৃষ্ঠ দেশে নিয়ে কংকরময় প্রান্তের দিয়ে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার ক্রলিং করে যেতে পারি। তাছাড়া উক্ত ওজনের মালামাল নিয়ে দু-একটি দুর্গম পাহাড় পাড়ি দিতে পারি। দু-তিন দিন পানাহার ছাড়া থাকার অভ্যাস করেছি। ১০ থেকে ১৫ ফুট উপর থেকে জাম দিয়ে নিচে পড়তে শিখেছি। নতুন নতুন অস্ত্র চালানো শিখেছি। দু-চারজন অস্ত্র ধারীদের সাথে খালি হাতে ফাইট করে তাদের হাতিয়ার ছিনিয়ে আনার কৌশল রপ্ত করেছি।

মাহমুদা আমাদেরকে দেখে দেখে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। প্রায় রাত্রেই সে ওগুলো আমাকে দেখায়। তার কার্যকলাপ দেখে আমি আনন্দে আত্বহারা, উল্লাসে মাতোয়ারা, পোলকে দিশেহারা। আমি তাকে বললাম, মাহমুদা ! তোমার অক্লান্ত পরিশ্রম আর আলিশান হিম্মত দেখে আমি সত্যিই গর্বিত। তোমার মত মহিয়সী নারীকে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। তুমি তোমার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখ। অন্যথায় যদি একেবারেই পঙ্গু হয়ে যাও তাহলে জিহাদের আসল কাজ থেকে মাহরুম থেকে যাবে। শরীরকে মানিয়ে প্রশিক্ষণ নিও।

গোয়েন্দা প্রথম দিন থেকেই আমাদের ক্লাশ নিতে লাগলেন। কিভাবে গোপন কোন ষড়যন্ত্রের উৎস স্থলে পৌছাযায়, গোপন তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা যায়, কোন সমাজে কি ভাবে ঢুকতে হবে, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে কিভাবে কাজ করতে হবে, গোয়েন্দা হিসাবে যদি মানুষ চিনে ফেলে তা হলে কি করতে হবে। মানচিত্র অংকন, মানচিত্র দেখে এলাকার সন্ধান নেয়া ও দূরত্ব নির্ণয় করা। এক স্থান থেকে আর এক স্থানে কি করে সংবাদ পৌছানো যায়। সাংকেতিক অক্ষর ও পত্র লেখার নিয়ামাবলী আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন।

গোয়েন্দাগিরী করা ও রিপোর্ট তৈরীতে মাহমুদা আমাদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর আমাদেরকে প্রায় ৮ দিন ব্যাপী পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আমরা কেউ পত্র লিখে, কেউ সংবাদ পাঠিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। এতে সবাই ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করেছে।

মাহমুদা আমাকে একটি কাঁথা দিয়ে বললো! প্রিয়তম! আমি এই কাঁথাটি তৈরী করেছি, এটি আমাদের গোয়েন্দা উস্তাদকে হাদীয়া দিয়ে দিন।" আমি বললাম, আরে পাগলী! হাদীয়া দিতে হয় ভাল জিনিস। তোমার যদি হাদীয়া দিতে এতই খাহেশ থাকে তা হলে আমাদের ইয়ামেনী চাদরটি দিয়ে দাও। কাঁথা দিতে খুবই লজ্জা লাগছে। সে বললো, এটা তো নিজ হস্তে তৈরী, স্মৃতি হিসাবে এটার মান অনেক বেশী"। আপনি এত অভিমান না করে কাঁথাটি নিয়ে দিন।

তার পীড়া পিড়ীতে কাঁথাটি নিয়ে কমান্ডারের কাছে পেশ করে বললাম, জনাব! আপনার ছাত্রী মাহমুদা আপনাকে এ কাঁথাটি হাদীয়া স্বরূপ দিয়েছে। এটা তার নিজ হস্তে তৈরী। কমান্ডার সাহেব আমাদের সম্মুখে কাঁথাটি মেলে দিলেন। কাঁথা হাদীয়া দেখে সব সাথীরা হাসছিলেন। লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে গেল। কমান্ডার সাহেব একটু গভীর ভাবে চোখ বুলিয়ে বিস্ময় ভাবে বলে উঠলেন, "সুবহানাল্লাহ! যে জাতির মায়েরা এমন মেয়ে প্রসব করেন, সেজাতিকে পদানত করবে এমন কোন শক্তি নেই।"

অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন "প্রিয় শিক্ষানবিস ভায়েরা! তোমাদের মধ্যে কেহ এমন আছ কি যে এ কাঁথার রহস্য উদঘাটন করবে? আমরা কাঁথার দিকে বার বার নজর দিতে লাগলাম। কিন্তু কোন কিছু বুঝতে পারিনি। তার পর কমান্ডার একটি ছড়ি হাতে নিয়ে কাথাঁয় নির্দেশ করে বললেন, দেখ গোটা কাঁথাটা হল রাশিয়ার কয়েকটি প্রদেশের মান চিত্র। এতে আছে,

তাজিকিস্তান,উজবেকিস্থান,তুর্কেমেনিকস্থান,কাজাকিস্থান,কিরগিজিয়াং মঙ্গোলিয়া, আজারবাইজান সহ জর্জিয়াং, আর্মেনিয়াং মোলদাভিয়া নিয়ে মস্কো পর্যন্ত। এর মধ্যে যে, ছোট ছোট প্রস্ফুটিত ফুল অংকন দেখতে পাচ্ছ ওগুলো মুসলিম এলাকা। ফাঁকে ফাঁকে যে খেজুর বৃক্ষ দেখছ এগুলো ইসলামী বিদ্যাপীঠ। আর যে খানে যেখানে বন-জঙ্গল অংকন করেছে এগুলো বিজাতিদের আবাসাস্থল। আর যেসব ছোট বড় পাহাড় দেখছ এগুলো সামরীক ঘাটিসমুহ নির্দেশ করছে। মাঝে মাঝে যে টিনের ঘর গুলো দেখছ এগুলো জার নিকুলাই এর পুরাতন সেনা ছাউনি।

আমরা একাঁথা দেখে হয়রান পেরেশান হয়ে গেলাম। কমান্ডার খুশী হয়ে মাহমুদাকে পাঁচ হাজার রুপী পুরস্কার দিলেন। তারপর একাঁথা নাদির শাহের নিকট প্রেরন করেন। পরবর্তিতে এ কাঁথাটি কাবুল যাদুঘরে স্থান পেয়েছিল। তিন মাসে আমরা প্রাথমিক ট্রেনিং সমাপ্ত করে কাবুলে ফিরে এলাম।

দুই

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে আমরা লোক সংগ্রহের জন্য আবার জিহাদের তাবলীগ করতে লাগলাম। মাহমুদা ক্ষণিকের তরেও আমার পিছু ছাড়তে রাজী নয়। হিজাব পড়ে আমার সাথে সাথে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সফর করতে লাগল। আমরা আবার কয়েকটি প্রদেশ ঘুরে উত্তর প্রদেশে গিয়ে হাজির হলাম।

সেখানে শ্বরনার্থী শিবিরে দাওয়াত দিতে লাগলাম। আমি দাওয়াত দেই পুরুষ মহলে আর মাহমুদা দেয় মেয়ে মহলে। তিন চার মাসে স্বরনার্থীর সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই হল আলেম-ওলামা ও দ্বীনদার পরিবারের লোক। এসব পরিবারের মধ্যে এমন একটি পরিবারও নেই যাদের উপর বলসেবিকরা জুলুম, অত্যাচার আর নির্যাতন করেনি। এদের মধ্যে রয়েছে অনেক ধর্ষিতা মা-বোন। কেউ সন্তান হারা কেউ বা স্বামী হারা। কারো নেই পিতা, কারো নেই মাতা।

মাহমুদা যখন আপাদমস্তক হিজাব পড়ে ঘোড়ায় চড়ে স্বরনার্থী শিবির গুলো পরিদর্শন করে তখন মহিলারা অপলক নেত্রে তাকে অবলোকন করতে থাকে। এমনিতে সে সদালাপী ও মিষ্ট ভাষি। ওর কথা শুনতে অনেক মহিলারাই আগ্রহী। সে বুদ্ধি করে একটি মহিলা এস্তেমার ব্যবস্থা করল। তার দাওয়াত এক খিমা থেকে অন্য খিমায় পৌছতে লাগল। এভাবে শিবিরের এক প্রান্থ থেকে অপর প্রান্থ পর্যন্ত এস্তেমার দাওয়াত পৌছে গেল।

দুদিন পর বিকাল ৩ টায় নদীর অববাহিকায় তিনশবার উপরে মহিলা এসে জমায়েত হলো। মাহমুদা সবাইকে সম্বোধন করে বললো, "হে আমার প্রিয় অসহায়, নির্যাতিতা ও নিপীড়ীতা বোনেরা! আজ আমি অত্যন্ত দুঃখ ভরা মন নিয়ে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আশাকরি আপনারা আমার কথা গুলো হৃদয়ের কানে শ্রবণ করবেন।

মুহতারামা ! আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহর বান্দি। ইজ্জত আর সতিত্ব আমাদের অহংকার। পর্দা আমাদের গর্ব। আমরা আমাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি। আমরা আজ কাঁচা মাল ও ভোগ্য সামগ্রীতে

পরিণত হয়েছি। আমাদের ইজ্জত নিয়ে কাফের বেঈমানরা ছিনি-মিনি করছে। আমাদের উড়না নিয়ে ওরা টানা-টানি করছে। আমার কত নিরপরাধ যুবতী বোনকে তারা নেংটা করছে তার কোন সংখ্যা কেউ বলতে পারবে না। আমাদের ইজ্জতের হেফাজতে কেউ এগিয়ে আসছে না।

হে আমার মা ও বোনেরা ! আমি শোনেছি কমিউনিষ্টদের জুলুম-অত্যাচারে অনেক পিতারা তাদের যুবতী মেয়েকে কমিউনিষ্টদের হাতে তুলে দিয়েছে, "ছি, নাউযু বিল্লাহ্। আমি শোনেছি অসহায় পিতার সম্মুখে যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। দুর্বল ভাই এর সম্মুখে যুবতী বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। মায়ের সম্মুখে মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে।

প্রিয় মা-বোনেরা, কমিউনিষ্ট হায়েনা আমাদের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা কেড়ে নিয়েছে আমাদের সাধিকার, তাহজিব, তামাদ্দুন ও কৃষ্টি কালচার। জাতির কর্ণধার, উম্মতের রাহাবর, নবী (সাঃ) এর ওয়ারিস আমদের পরম শ্রদ্ধেয় ওলামায়েকেরাম ও মাশায়েখে এজাম দেরকে ফাঁসিকাষ্টে ঝুলিয়ে, গরম তেলে ফেলে, হাত পা কর্তন করে নদীতে নিক্ষেপ করে, গাছে পেরেক মেরে অতি নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। হাজার হাজার ওলামায়েকেরামকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কমিউনিজম না মানার অপরাধে শত শত পরিবারকে তাদের ভিটে-মাটি থেকে বঞ্চিত করেছে। লুটে নিয়েছে জীবনের অর্জিত সোনা-দাণা, ও টাকা পয়সা। দখল করেছে মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য।

প্রিয় বোনেরা আমার, আপনারা জানেন বলসেবিকরা আমাদের এতক্ষতি করতে পারতনা। এ ক্ষতি আর পরাজয়ের পিছনে দায়ী-(ক) কিছু নামধারী আলেম। যারা মোটা অংকের টাকা পেয়ে দ্বীন ও ঈমানকে বিক্রি করে দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে। (খ) ভীরম্ন বা কাপুরুষ আলেম। যারা মওতের ভয় আর দুনিয়ার মহাব্বতকে আঁকরিয়ে ধরে হক কথা বলেন না। নিজেরা জিহাদ করেন না আর অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেন না। (গ) মুসলিম বেশধারী মুনাফিক। যারা মুসলমানদের নিকট বন্ধু পরিচয় দিয়ে তাদের কাছে ভিরত এবং সমস্ত গোপন বিষয় বলসেবিকদের নিকট পাচার করত। এরা অবৈতনিক গোয়েন্দার কাজ করেছে। (ঘ) কারপন্যের মতো সম্পদশালী মুসলমান। যারা নিয়মিত যাকাত আদায় করেনা। পর্শিদের হক আদায় করেনা। অভাবী রোগী,ও

অসহায়দের খোঁজ নেয় না। ফলে অভাবিরা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। সেসব ধনিরা আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ জিহাদের ফান্ডে অর্থ খরচ করে না। সম্পদশালীদের উপর জীবনে এক বার হজ্জ করা ফরয। তার পর হজ্জ ওমরা, যারা করবে সবই নফল। পর্শিদের অভাব-অনটন দূর করা, রোগীর চিকিৎসা করা ফরয। সেসব ধনিরা প্রতি বৎসর হজ্জে গেছে ওমরা করছে কিন্তু প্রতিবেশীর হক আদায় করে না। ফরয ছেড়ে নফল নিয়ে টানাটানি করছে। মুজাহিদরা ময়দানে গোলা-বারুদ, অস্ত্র-সস্ত্র, খাদ্য, ঔষধ, কাপড় ও সাওয়ারির জন্য কষ্ট করছে। কিন্তু ধনিরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়নি। জিহাদে অর্থ সাহায্য করা ফরয। কিন্তু ধনিরা তাদের হক আদায় না করার কারনে মুজাহিদরা নিয়মিত যুদ্ধ করতে পারছেনা। শত শত শহীদ পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছে, সন্তানরা এক মুঠো অন্নের জন্য কাঁদছে। মাছুম বাচ্চারা রোগের আক্রমনে বিছানায় ছট ফট করছে। কিন্তু ধনিঁরা তাদের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখেনি। যাদের জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তারা যখন শহীদ পরিবারের এ করুণ চিত্র দেখল তখন তাদের অন্তর থেকে জিহাদে যাওয়ার আশা আকাঙ্খা চিরতরে দূর হয়ে গেল। এজন্যে যে, আমিও যদি শহীদ হয়ে যাই তা হলে আমার বিবি বাচ্চার খোঁজ কেউ নেবে না। এরা অসহায়ের মত পথে পথে ঘুরবে। এসব চিন্তায় যুবকরা জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

প্রিয় বোনেরা আমার, আমি দেখেছি তাসখন্দ, সমরকন্দ, ও বুখারার বৃত্তশালীরা স্বপরিবারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দু-তিন মাস অবকাশের জন্য প্যারিস যেতে। দেখেছি চিত্ত বিনোদনের জন্য বুম্বাই যেতে। সেসব ধনিদের গৃহে, টেলিভিশন, সহ অপ্রয়োজনীয় লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল। যা তাদের কোন উপকারে আসবে না। তাদের আলমীরা বুঝাই করেছে লক্ষ লক্ষ টাকার মূর্তি দিয়ে।

প্রিয় মা-ও বোনেরা, মুসলমান তো দুনিয়াতে অন্যের গোলামী করতে আসেনি। মুসলমানরা হল আল্লাহর খলিফা। তারা দুনিয়াকে শাসন করবে। মুসলমানরা ভীরু আর কাপুরুষের জাতি নয়। মুসলমানরা হল বীরের জাতি তারা কোন দিন পরাজয়, পারাভব মানে না। তারা কোন দিন বাতিলের সাথে আপুশ করতে জানে না। মুসলিম সালারের তাজি পূর্ব-পশ্চিমের সাগর-মহাসাগর, খাল-বিল আর নদী নালার পানি পান করেছে। মুসলিম

সালারদের ঘোড়া উত্তর-দক্ষিণে চষে বেড়িয়েছে। ইসলাম বিজিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের তলোয়ার কোষ বন্ধ হয়নি। সারা দুনিয়ার কুফুরী শক্তিকে পরাজিত করে, সমগ্র দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তারা নিশ্বাস ফেলেছেন।

প্রিয় মা-বোনেরা, মুসলমান মায়েরা কাপুরুষ সন্তান প্রসব করেনি। মুসলিম মায়ের এক ফুটা দুধের দাম অনেক। তারা কোন কাপুরুষ

সন্তানকে দুধ পান করাননি। মুসলিম মহিলাদের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। তারা রনাঙ্গনে বীরদর্পে লড়েছেন, বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছেন। আমরা বিবি খানছা (রাঃ) এর উত্তরসুরী, যিনি তার চার ছেলেকে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে ছিলেন। আমরা, উম্মে জিয়াদ, ও সুফিয়ার উত্তর সুরী যারা জিহাদের ময়দানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

হে আমার প্রিয় বোনেরা, আপনারা কি ভুলে গেছেন সেই ইতিহাস, যে মুসলিম মেয়েরা মুজাহিদ পুরুষ ছাড়া কোন কাপুরুষকে বিয়ে করেননি। যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া কোন যুবক হিজাজের কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সাহস পায়নি। পিতা-মাতা নিজে সন্তানদেরকে এলমে দ্বীন শিক্ষার পাশা-পাশি যুদ্ধ বিদ্যাও শিক্ষা দিতেন। এমন একজন সাহাবার নাম খোঁজে বের করা যাবেনা,যিনি ঈমান আনার পর কোন যুদ্ধে শরিক হননি।

হে আমার মা-বোনেরা, আপনারা যদি ইজ্জতের সাথে দুনিয়াতে থাকতে চান, দুনিয়াও আখেরাতের কামিয়াবী হাছেল করতে চান, রিপুজী জিন্দেগীর অবসান ঘটিয়ে পৈত্রিক বা স্বামীর নিবাসে ফিরে গিয়ে, সুখ-শান্তি আর ইজ্জতের সাথে জীবন-যাপন করতে চান, তা হলে আপনারা আপনাদের স্বামীদেরকে, ভাই ও নিজের সন্তানদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন। নিজ হাতে যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে দিন। শহীদের মা, শহীদের বিবি,আর শহীদের বোন হওয়ার জন্য চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকুন। আপনাদের সোনাদানা ইলায়ে কালিমাতুল্লার জন্য স্বামী বা সন্তানদের হাতে তুলে দিন। আল্লাহর দ্বীনই যদি মিটে যায় তবে এ সোনা-দানা দিয়ে কি করবেন। কি জবাব দিবেন আল্লাহর নিকট। আর নিজেরা কিছু ট্রেনিং নিয়ে রাখুন। তাহলে নিজের ইজ্জত হেফাজতে রাখতে পারবেন। মাহমুদা সুলালিত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জিহাদের কিছু কলা কৌশল সবাইকে দেখালো। সেগুলো পালন করার জন্য সকলেই হাত তুলে অঙ্গিকার ব্যক্ত করল।

তিন

পাঁচজন মুনাফিক গোয়েন্দা হত্যার পর বলসেবিকরা উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গোয়েন্দাদেরকে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও ইরানে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে প্রায় বেশির ভাগই হল আরবি শিক্ষিত। গোয়েন্দাদের মধ্যে মহিলা গোয়েন্দাদের সংখ্যাও নগন্য নয়। এদেরকে সহজে চেনা যেত না।

একবার হিজাব পড়া অর্ধ বয়স্কা এক মহিলা, তার সন্তানাদীসহ শরনার্থী শিবিরে এসে আশ্রয় নেয়। তার সাথে ১৭ বৎসরের পরমা সুন্দরী এক যুবতী, ১২ বৎসরের সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট একজন ছেলে আরা ৫বৎসরের এক চন্দানন তুল্য মেয়ে। এরা সবাই উক্ত মহিলার সন্তান পরিচয় দেয়। সবাই ইসলামী বেশভূষায় সু-সজ্জিত। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর কণ্ঠও তার সুমধুর। সে কুরআনে হাফেজ। মধুর সুরে সে কুরআন তিলাওয়াত করে। আমরা প্রায় সময়ই তার যবান থেকে তিলাওয়ত শোনতাম। আমরা এ অসহায় পরিবারটির থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম।

সব ব্যবস্থা করে দিয়ে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা আপনারা কোথা থেকে কিভাবে এখানে এসে পৌছলেন, তা জানাবেন কি ? মহিলাটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "বাবা আমরা বড়ই অসহায় ও নির্যাতিত। আমাদের বাড়ী ছিল উজবেকিস্থান। আমার স্বামী ছিলেন (মাওলানা) সুজা খান দামলা। তিনি ছিলেন উজবেকিস্থান বাহরুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক। দুমাস আগে বলসেবিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এখনো তিনি জিবিত আছেন কি না তা আল্লাহ্ জানেন। তার পর আমি আমার সন্তানাদি নিয়ে বাড়ীতেই অবস্থান করতে ছিলাম। গত কিছু দিন আগে বলসেবিকরা আমার যুবতী মেয়েকে তাদের হাতে দিয়ে দিতে বলে। আমরা এতে অসম্মতি জানালে আমাদেরকে বলপূর্বক বাড়ী থেকে বের করে দেয়। তার পর আমরা নিরুপায় হয়ে আফগানিস্থানের দিকে হিজরত করি। ১০/১২ দিন যাবত হাটতে হাটতে এখানে এসে হাজির হয়েছি। আমি পূর্বেই শোনেছিলাম এঅঞ্চলে আমাদে দেশের অনেক লোক হিজরত করেছে। তাই আমরাও এখানেই আসলাম।"

মহিলাটির কথা শোনে আমি বড়ই ব্যথিত হলাম এবং বললাম, মা আপনারা আর কোন চিন্তা করবেন না। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, এখন বিলাপ করলে কোন ফল হবে না। দুদিন পর থেকে আপনারা নিয়মিত রেশন পাবেন। আপনাদেকে যে তাঁবু দিয়েছি এটা আপনাদেরই যখন যা প্রয়োজন হয় তা আমার কাছে বলবেন; আমি চেষ্টা করব তা পুরণ করতে আপনার ছেলে শরীফের লেখা-পড়ার প্রতি নজর রাখতে হবে। আমি মহামতি নাদির শাহের নিকট দরখাস্ত করেছি আমাদেরকে দুজন উস্তাদ দেয়ার জন্য। ওনারা শরনার্থী শিবিরের বাচ্চা-কাচ্চাদেরে এলেম শিখাবেন। তিনি সরকারী খরছে দুজন আলেম দিবেন। ওনারা আগামি ৪/৫ দিনের মধ্যে এসে যাবেন। তখন শরীফ তাঁদের কাছে এলমে দ্বীন শিক্ষা করবে। আর আপনিও আপনার মেয়ে হেলেনা আর মোমেনাকে নিয়ে থাকতে থাকেন ভাল পাত্র যদি পাই তবে হেলেনাকে বিয়ে দিয়ে দেব। যুবতী মেয়ে এভাবে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। আর আমি ওয়াদা করতেছি যে, আগামী তিন দিনের মধ্যে আপনার স্বামীর সন্ধানে লোক পাঠাব। তিনি যদি জিবিত থাকেন আর পাওয়া যায় তবে যে ভাবেই হোক আপনার স্বামীকে ছিনিয়ে এনে আপনার কলিজা ঠাণ্ডা করব ইনশাল্লাহ।

আমি যখন মহিলার সাথে আলাপ করছিলাম, তখন মাহমুদাও আমার সাথে ছিল। আমরা সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের খিমায় চলে আসি। তার পর মাগরীবের নামায আদায় করে আমি তিলাওয়াত করতে ছিলাম। মাহমুদা নামায শেষ করে তার ডাইরীতে লিখল-

১। আমরা মহিলার সাথে আলাপ করার সময় মহিলার কণ্ঠ কান্নার মত একটু কাঁপছিল, আসলে এটা কৃত্রিম বলে মনে হয়। মহিলার চোখে এক ফোটা অশ্রুও দেখিনি। ২। শরীফ মোমেনার সাথে খেলা করছিল। তার মধ্যে পেরেশানীর কোন চিহ্ন দেখিনি। ৩। হেলেনা নিশ্চিন্তে মনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শোনছিল এবং মাঝে মধ্যে শরীফের খেলাও দেখছিল এমন কি রেফারীর দায়িত্বও পালন করছিল। ৪। কাজাকিস্তান থেকে পায়ে হেটে এ পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে আফগানিস্তানে আসলে কম পক্ষে ২০ থেকে ২৫ দিন সময় লাগবে। মহিলা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ১০/১২ দিনে পায়ে হেঁটে কি করে আসতে পারলেন তা বোধগম্যের বাইরে।

তিলাওয়াতের পর তার ডাইরীটা হাতে নিয়ে এসব লিখা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, মাহমুদা এসব পাগলের প্রলাপ লিখলে কেন? সে উত্তরে

বললো প্রিয়তম ওদের সাথে কথোপকথনের সময় আমি যে ৪টি পয়েন্ট সনাক্ত করেছি, এ ৪ টি পয়েন্টের উত্তর বের করতে আমাকে গবেষণা করতে দিন। হয়ত কোন রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে। মাহমুদার কথা শোনে আমি রাগান্বিত হয়ে বললাম "মাহমুদা নিরিহ ও নির্যাতিত মানুষ নিয়ে এধরনের হীন চিন্তা করোনা। মুসলমানের উপর অহেতুক সন্দেহ করা শক্ত গোনাহ। উওরে মাহমুদা বলল, স্বামীগো! গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ নেয়ার কারনেই এসব নোট করতে বাধ্য হয়েছি। তা না হয় এসব লিখার কোন চিন্তাও আসত না। গোয়েন্দাদের প্রথম ছবকই হল দুনিয়াতে কাউকে বিশ্বাস করবে না। সবাই কে তুমি গোয়েন্দা মনে করবে। আমরা যদি এ দিকনির্দেশনা সম্মুখে রেখে চলতে পারি তা হলে কোথাও হোঁচট খাব না। আমরা যাকেই দেখি তাকেই যদি মনে করি যে সে দুশমন পক্ষের গোয়েন্দা। তা হলে তার থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো এবং তার কথা থেকে কোন তথ্য উদঘাটন করা যায় কি না সে জন্য সচেষ্ট থাকবো। আর যদি প্রথম সাক্ষাতেই তাকে আপন করে নেই। অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ে নেই তাহলে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার গোপন ভান্ডারের সন্ধান করে নেবে। ফলে মহা বিপদের সম্মুখিন হতে হবে। তাই বলে আদর আপ্যায়ন করব না,বা দুর্ব্যবহার করব এমন নয়। অমায়ীক ব্যবহারে তার অন্তর জয় করে নেয়ার চেষ্ঠা করব। তবেই কঠিন কঠিন বিপদ থেকে অত্মরক্ষা করতে পারব।

তিন দিন পর আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন মুজাহিদ নিয়ে পরামর্শে বসলাম। আমি প্রথমে উক্ত মহিলার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে বললাম, আমাদের উপর বর্তমানে গুরুত্বপূর্ন কাজ হলো (মাওলানা) সুজা খাঁন দামলার সন্ধান করা। তিনি জীবিত আছেন কি না। না কোথাও বন্দি আছেন তার সঠিক তথ্য উদঘাটন করতে হবে। যদি জীবিত থাকেন তা হলে যে কোন মূল্যে তাঁকে উদ্ধার করে সন্তানদের নিকট পৌছে দিতে হবে এতে আপনাদের অভিমত জানতে চাই ।

আমার কথা শোনে এক জন মুজাহিদ বললেন, মুহতারাম আমীর সাহেব, আপনার সব ধরনের হুকুম মানতে আমরা তৈরী আছি। তবে এব্যপারটি আরো গভীরভাবে চিন্তা করে প্রোগ্রাম তৈরী করুন। এখান থেকে উজবেকিস্তান কম দূরে নয়। এক জন মানুষের জন্য এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে কিনা তা ভেবে দেখুন। আবার যার জন্য আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করব তাকেও আমরা জানি না।

আরে তোমরা এসব কি বলছ ? তিনি তো এক জন আলেম। আর আলেম হোক চাই না হোক, এক জন মুসলমান তো। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে যদি কোন মুসলমানের চিৎকার ধ্বনি আমাদের কানে আসে, সেখানেই আমাদের ছুটে যেতে হবে। প্রত্যেক মুজাহিদের এ ধরনের চিন্তা থাকা দরকার। এখানে কে পরিচিত আর কে অপরিচিত। কে আত্মীয় আর অনাত্মীয়, দেশী না বিদেশী সে বিচার করা আমাদের শোভা পায় না।

জনাব আমীর সাহেব ! আপনার কথা ঠিক। আমরাও তাই মনে করি। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। যুগে যুগে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ হল মুনাফিকরা। মুসলিম বেশ ধারী মুনাফিকদের মুনাফিকির কারণেই মুসলিম জাতি পরাজয় বরণ করেছে। আমার এসব কথাগুলোর দ্বারা আপনাকে সে দিকে চিন্তা করতে বলছিঁ। পর্দার অন্তরাল থেকে মাহমুদা বললো, আমীর সাহেব আপনাকে অনেক তাড়াহুড়া করতে দেখছি। এত তাড়াহুড়া ভাল নয়। আপনি এক সপ্তাহ পর সৈন্য প্রেরণ করেন। এর মধ্যে যারা নতুন নাম দিয়েছে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরকে দিয়ে একটি গ্রুপ রচনা করে প্রশিক্ষণ আরম্ভ করে দিন। আর আমার কিছু দায়িত্ব আছে তা আমি আদায় করার চেষ্টা করি।

সকলেরই একটু অনিহা মনোভাব দেখে আমি আমার চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। মাহমুদার কথামত নতুন সাথীদেরকে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে দিলাম। নতুন সাথীর সংখ্যা হল ৫০ জন। দুজন কমান্ডারকে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

এদিকে মাহমুদা প্রতিদিন ফল মুল ও হাদীয়া তুহফা নিয়ে নবাগত শরনার্থীদের খিমায় বেশী বেশী যাতায়াত করতে লাগল। এমন কি রাত্র যাপনও করতে লাগল তাদের খিমায়। সে গভীরভাবে একটি জিনিস লক্ষ্য করে দেখল যে, উক্ত মহিলা ও তার সন্তান হেলেনা ও শরীফের হাতে একই ধরনের আঁংটি রয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদাই করা কি সংকেত রয়েছে তা বুঝা যায় না। মাহমুদা চিন্তা করল আল্লাহ তা,আলা বিভিন্ন আকৃতিতে মানুষ তৈরী করেছেন এর মধ্যে রয়েছে তাঁর বৈচিত্রময় কুদরতের সমাহার। যেমন একজনের চেহারার সাথে আর একজনের মিল নেই। এক জনের কণ্ঠস্বরের সাথে আর এক জনের কণ্ঠস্বর মিলে না। একজনের পছন্দের সাথে আর এক জনের পছন্দের মিল নেই। তিন জনের হাতে একই ধরণের আংটি থাকে কেন ! সকলেই এক ধরনের আংটি পছন্দ করলেন

কেন ? এসব বিষয় নিয়ে মাহমুদা অনেক অনেক গবেষণা করতে লাগল। অবশেষে মাহমুদার একিন হল যে, আংটি নিশ্চয় তাদের কোন নির্দশন। আর তাদের চাল-চলন ও চলা-ফেরা মাহমুদার কাছে খুব সন্দেহ হয়ে দেখা দিল। তার পরের ঘটনা মাহমুদার যবান থেকে শোনুন।

তাদের প্রতি যখন আমার প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি হল, তখন থেকেই তাদের গতি বিধির উপর কড়া নজর রাখতেছিলাম। আমি তাদের খিমায় গেলেই দেখি তারা এবাদত বন্দিগীতে লিপ্ত। গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাদের এবাদত বন্দিগী। আমি কয়েক দিনই তাদের খিমায় রাত যাপন করেছি কিন্তু তাদের থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি। আমি যদি কোন প্রশ্ন করি তাহলে মহিলাটি বা হেলেনা এমন উত্তর দিয়ে পাশ কেটে চলে যায় তা আশ্চার্য্য না হয়ে উপায় নেই। ছেলেটিও বহু চৌকান্না। অনেক সময় ছেলেকে কোন প্রশ্ন করলে যদি যথা যথ উত্তর দিতে না পারে তা হলে তার মায়ের দিকে বা বোনের দিকে তাকায় তখন ওরা তার পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে দেয়।

দিনের বেলায় প্রায় সময়ই হেলেনা ও তার মা আমার সাথে শরনার্থী শিবির ঘুরে ঘুরে দেখত। আনেকের নিকট অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করত। কার নাম কি, বাড়ী কোথায় ছিল, কোন কবিলার লোক। এখানে ওরা কার মাধ্যমে কিভাবে আসল। দেশে কেহ আছে কি না। থাকলে ওরা কি করে ইত্যাদী প্রশ্ন করত।

আমি কয়েক দিন গভির রাত্রে পাহাড়ের গাঁ বেয়েঝোপের আড়ালে বসে তাদের খিমার দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। কয়েক দিন দেখেছি মধ্য রাত্রে তাদের খিমায় ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলত। আর শরীফকে দেখছি তাঁবুর সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে। শরীফের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বুঝতে পারলাম সে পাহারা দিচ্ছে। এভাবে কয়েক দিন দেখার পর আমি শরীফের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাঁবুর পশ্চাৎ দিক দিয়ে একদম নিকটে এসে একটি ছিদ্র পথে তাকিয়ে দেখি মহিলাটি হেলেনাকে বিবস্ত্র করে তার উরুর মধ্যে কি যেন লিখছে। কি লিখছে তা বুঝতে পারিনি। লেখার পর কি যেন তৈল মালিশ করে দিয়েছে। পর পর আমি কয়েক দিন নিজ চোখে এসব কির্তি কান্ড দেখলাম। তার পর একদিন সন্ধ্যার সময় কিছু মিষ্টি নিয়ে গেলাম। নিজ হাতে পরিবেশন করে মিষ্টি খাওয়ায়ে চলে এলাম। তার পর দুঘন্টা পরে গিয়ে দেখি সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। আমি খিমার দরজার পর্দা

উঠিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে মহিলাটিকে খালাআম্মা, খালাআম্মা বলে ডাকলাম, হেলেনা ও শরীফকেও ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। আর সাড়া শব্দ পাবই বা কেমনে, কারণ মিষ্টির সাথে ঘুমের টেবলেট ফাঁকি করে মিশায়েছিলাম। তাই জাগার প্রশ্নই আসে না। তার পর আমি হেলেনার হাতের আংটি খানা নিয়ে আমার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

রাত পোহালে সকাল ৭/৮ ঘটিকায় আমার তাঁবু থেকে ৪ জনের জন্য রুটি ও গোস্ত নিয়ে তাদের খিমায় গিয়ে দেখি ওরা ঘুম থেকে উঠেছে বটে কিন্তু ঘুমে চোখ ডুলু ডুলু করছে। তার পর সবাই এক সাথে নাস্তা করে আমি আমার খিমায় চলে আসলাম।

চার

এর মধ্যে কেটে গেল ১০ দিন। আমি আবার সবাইকে ডেকে বসলাম। মাহমুদা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল নবাগত শরনার্থীদের খিমায়। উক্ত মহিলার সাথে কি যেন আলাপ করে ফিরে এসে বললো, প্রিয়মত (মাওলানা) সুজাখান দামলার সন্ধানে কজনকে পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করছেন? আমি বললাম ৫ জন। সে বললো প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র এক জনকে পাঠান। আর চারজন থাকবে এক জনের পাহারাদার। এক জন যদি গ্রেপ্তার হয়ে যায় তা হলে তাকে উদ্ধারের জন্য বাঁকি চার জন চেষ্টা করবে। আমি বললাম তারা তো গোয়েন্দা সেজে ঘুরা ফেরা করবে। এখানে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় নেই।

স্বামী গো আপনি এ ব্যপারটাকে এত হালকা নজরে দেখবেন না। এখানে অনেক ভয়ের কারণ রয়েছে।

তা হলে তুমি এদেরকে এখনো সন্দেহের নজরেই দেখছ, তাই না ?

হাঁ অবশ্যই এদের উপর আমার যথেষ্ঠ সন্দেহ রয়েছে।

আচ্ছা, তোমার কথাই মেনে নিলাম। তারা কিভাবে কাজ করবে সে ব্যপারে একটু নসিত কর। অতঃপর মাহমুদা বললো–

আমার নিকট একটি পত্র আছে। এ পত্রটা নিয়ে একজন পত্রে উল্লেখিত ঠিকানায় যাবে। আর বাকি ৪ জন ছদ্ম বেশে তার প্রতি সতর্ক নজর রাখবে। প্রয়োজন হলে কমান্ডো হামলা চালাবে। এতটুকু বলে পত্রটি

আমার হাতে দিল। পত্রটির খামের উপর উজবেক আঞ্চলিক ভাষায় স্পষ্ট অক্ষরে ঠিকানা লেখা আছে। ঠিকানা হল, শাইখ আহম্মদ বেলোয়ারী। গ্রামঃ-বেলোয়া, পোষ্ট, রায়ডানেভো, জেলা, উজবেকিস্থান আর পত্রে লেখা ছিল–

প্রিজম উছেদা, দামাতে কেরানা রামাউস্তে. হারে হারে জেদানিস্তা বামলে. কেরি উদালে খাদে হুলে. জিতালে মিদালে এলামীদামে.রাহু বালে ছিলমে পান্থে।

উদাস্তাখতে
আমেলা, হেলেনা
আফগানিস্থান

পত্রের শব্দ বা ভাষা গুলো, না ছিল, তাজিক না উজবেক। না উর্দ্দু, না ফারসী, না পোস্তু না আরবী। আমরা সবাই পাঠ উদ্ধারের চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হলাম। মাহমুদা বলল, এভাষা ওদেরকে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। মনে হয় এটা তাদের ব্যক্তিগত সাংকেতিক ভাষা। পৃথিবীর কোন জনপদে এধরনের ভাষার প্রচলন আছে কি না তাতে সন্দেহ আছে৭ আমার মনে হয় এটা কমান্ডো পত্র। মাহমুদার উক্তিগুলো সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করার কোন ভাষা আমাদের নিকট মওজুদ ছিলনা। তাই আমরা একদম নিরব হয়ে গেলাম।

অতঃপর মাহমুদা দুজনকে রাজমিস্ত্রী আর অপর দুজনকে ক্ষেত মুজুরের ভান ধরতে বলল। আর একজনকে পত্র দিয়ে বললো আপনি খুব সাবধানতার সাথে উক্ত ঠিকানায় পত্রটি নিয়ে যাবেন। যে কোন বিপদের সম্মুখিন যওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চিন্তা ফিকির করে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন। আপনাদের খবরা খবরের জন্য আপনারা পরামর্শ করে ব্যবস্থা নিবেন। সব সময় সংকেত ব্যবহার করবেন। আমি তাদেরকে রাহা খরচ দিয়ে কাফেলা বিদায় করার সময় বললাম, হে আমার জানবাজ মুজাহিদ বন্ধুরা আপনারা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বেরিয়ে যান। আল্লাহ্ আপনাদের সার্বিক সাহায্য করুন। গায়রুল্লাহ আমাদের কোন উপকার করতে পারবে না। বেশী বেশী এবাদাত বন্দেগী করুন এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করম্নন। একমাত্র তিনিই প্রার্থনা কবুল করনে অলাজাত। সাবধান জিকীরুল্লাহ থেকে কখনো গাফেল হবেন না। তাহলে রহমত থেকেও বঞ্চিত থাকবেন। এসব হিদায়াত দিয়ে কাফেলা পাঠিয়ে দিলাম।

অতঃপর বাঁকি ৮ জন সাথীকে ৮টি ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় খরচ-পাতি দিয়ে বিভিন্ন সীমান্তে পাঠিয়ে দিলাম আরো কোন শরনার্থী শিবির আছেকি না তা খোঁজ নেয়ার জন্য। তাও বলে দিলাম যে কোন শিবিরে লোক সংখ্যা কেমন এবং তাদের কি প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরী করার জন্য। আর দুজন রেখে দিলাম আমার সাথে। আমি দুজন সাথী নিয়ে প্রশিক্ষণ সেন্টার পরিদর্শন করে কাবুলে যওয়ার এরাদা করলে মাহমুদা বললো, প্রিয়তম এখন থেকে একটা চিন্তা আপনার জেহেনে থাকতে হবে, তা হল, শরনার্থী শিবিরে সব সময় লোক রাখতে হবে। কারণ এখানে চেক রাখতে হবে সর্বক্ষণ। এখানে যে দু-এক জন গোয়েন্দা নেই তা জোর করে কেউ বলতে পারবানা। মাহমুদার এত সর্তকতা দেখে এক দিকে রাগ হচ্ছিলাম, আর এক দিকে খুশী হচ্ছিলাম এজন্য যে, এমন সর্তক থাকা খারাপ নয়। এটা ভাল লক্ষণ। তার পর দুজনকে এখানেই রেখে মাহমুদাকে সংগে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করলাম, কিন্তু সে আমার সাথে যেতে রাজি হলনা। সে বললো, আমার এখানে অনেক কাজ রয়েছে। এগুলো আমাকে ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। আপনি একাই যান। অবকাশ দিন এতে আমাদের ফায়দা হবে।

আমি মাহমুদাকে রেখে চলে গেলাম ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে দেখি ৫০ জন সাথীর মধ্যে ভেগে গেছ ৩ জন আর অসুস্থ্য ৭ জন। এখনো ডাক্তার টিম এসে পৌছায় নি। আমি সেখানে একদিন অবস্থান করে চলে গেলাম কাবুলে। সেখানে গিয়ে দেখে ৩ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি ডাক্তার টিম প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছেন। অতঃপর আমি নাদির শাহের নিকট সাক্ষাত করে আমার তিন মাসের কাজ পেশ করলাম। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। সেখান থেকে বাঁসায় ফিরে এসে রাত্র যাপন করি। ভোরে বাসায় তালা ঝুলিয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের নিকট সাক্ষাত করে খোঁজ নিয়ে দেখি বাইতুল মালে অর্থ কড়ি জমা হচ্ছিল। আমি সব জায়গায়ই ঘোষণা করেছিলাম যে আপনারা বাইতুলমালে যে যা কিছু দিতে চান তা কাবুল সিটির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিবের নিকট দিলেই পাব। খতিব সাহেব বললেন, আমি প্রতি জুমায় রাশিয়ার অবস্থার উপর আলোচনা করি এবং জিহাদের উপর বক্তব্য রাখি। এতে মানুষ অর্থ কড়ি জমা দিতেছে।

খতিব সাহেবের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে এক মাস পর এসে শরনার্থী শিবিরে হাজির হলাম। আমি আমার খিমায় প্রবেশ করতেই মাহমুদা আমার শারিরীক অবস্থা ও বিলম্বের কারণ জানতে চাইল, আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তার পর তার নিকট থেকে শরনার্থী শিবিরের অবস্থা জানলাম। সে অদ্য পর্যন্ত সমস্ত অবস্থা খুলে বললো এবং আরো একটি নতুন খবর শোনাল। মাহমুদার যবান থেকে।

প্রিয়তম গতকাল দ্বীপ্রহরে আপনার কাঙ্খীত মাওলানা সাহেব শরনার্থী শিবিরে এসে আপন সন্তানাদির নিকট পৌছেছেন। মাওলানা সাহেব এখানে আসার সাথে সাথে আমি আপনার রেখে যাওয়া দুই মুজাহিদকে ডেকে বললাম, আপনারা উনার আপ্যায়ন আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন। তাঁর যেন কোন রকমের তখলিফ না হয়। আর তাঁর প্রতি খুব কড়া নজর রাখবেন। তাঁর কথা বার্তা, চাল-চলন সব দিকেই হুশিয়ার থাকবেন।

লোকটাকে কি তুমি দেখেছ ?

হাঁ দূর থেকে একটু খানি দেখিছি।

দেখতে কেমন, বয়স কত হবে ?

দেখতে লম্বাচরা, সুন্দর। সুঠাম দেহের অধিকারী। বয়স ২৮ থেকে ৩০ বৎসর হতে পারে। বুক স্পর্শ সাদা দাঁড়ি। মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা জুব্বা, হাতে লাঠি। মাথায় ঝাঁকড়া বাবরী। বাহন ছিল তাঁর সাদা রংএর একটি ঘোড়া। স্বাস্থ্য, বডি আর বয়সের সাথে দাঁড়িটা বেমানান।

মাহমুদা! তুমি মাঝে মধ্যে এমন কিছু কথা উত্থাপন কর যা ঈমান বিধ্বংসী। এক মুঠোর উপরে দাঁড়ি রাখা প্রিয় নাবীর সুন্নত। দাঁড়ি নিয়ে ভৎসনা করলে ঈমান থাকেনা। সাবধান ! আর কোন দিন যেন এধরনের কথা না শোনি।

হযরত আমি ভৎসনা করে এসব বলিনি। আমি গোয়েন্দার চোখে তাকে দেখেছি, এজন্যই দাঁড়ি আর বাবরী নিয়ে আমার অন্তরে খটকা লেগেছে। তা না হয় এমন হত না।

প্রশিক্ষণের পর দেখি তুমি একদম আসল গোয়েন্দা বনেগেছ।

তা ঠিক! এ বিষয়টা আমি খুব ভালভাবে শিখেছি। তাই।

অতঃপর আমি রেখে যাওয়া দুজন মুজাহিদকে ডেকে এক মাসের কার গুজারী পেশ করতে বললে, তাঁরা সার্বিক অবস্থা বর্নণা করল। তার পর নবাগত শরনার্থী (মাওলানা) সুজা খান দামলার কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল–

মাওলানা সাহেবকে বলসেবিকরা তার মাদ্রাসা থেকে দু'মাস আগে ধরে নিয়ে যায়। তার পর তাঁর উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। তার পর এক জন ব্যক্তির সহযোগীতায় তিনি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তিনি পালিয়ে এসে প্রথমে বাড়ীতে যান, সেখানে পরিবার-পরিজন না পেয়ে পাগলের মত আত্বিয়-স্বজনের বাড়ীতে গিয়ে তালাশ করেন কোথাও না পেয়ে তিনি জীবন নিয়ে আফগানিস্থানে চলে আসেন। অতপর মুজহিদ বলল, গোয়েন্দা নজরে দেখলে অনেক সন্দেহ হয় লোকটার প্রতি।

কি নিয়ে তোমাদের এত সন্দেহ লোকটার প্রতি তা বল।

প্রথম সন্দেহ হল, তিনি বলেছেন দু'মাস আগে বলসেবিকরা তাকে মাদ্রাসা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। অথচ প্রায় ৬ মাস আগে রাশিয়ার সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে কথার মধ্যে যথেষ্ঠ গড়মিল রয়েছে। দ্বিতীয় নম্বর স্বাস্থ্য, বডি ও বয়সের সাথে দাঁড়ি আর বাবরীর গড়মিল। এ বয়সের লোকের দাঁড়ি অমনভাবে পাকতে পারে না তৃতীয় তাদের সাক্ষাত পর্ব। সে সময় লক্ষ্য করে দেখলাম এত দিন পর এক জন নিখোঁজ মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আপন পরিবার পরিজনের মাঝে ফিরে এলে যে ধরনের ভাবাবেগের অবতারনা হওয়ার কথা এমন কোন ভাব এদের মধ্যে দেখিনি। যত টুকু ভাব বিনিময় দেখেছি তা একান্তই মামুলী। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে এ মিলটা যেন তাদের পূর্ব পরিকল্পিত।

তাঁকে গ্রেপ্তার করার কারণ সম্পর্কে কিছু বলেছেন কি ?

হ্যাঁ, তিনি নাকি জিহাদের কথা বলতেন, তাই।

তিনি এখানে এসে কি করছেন ?

বিবি বাচ্চার সাথে দেখা সাক্ষাত করে পাহাড়ের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে শরনার্থী শিবির দেখেছেন।

এখানে ওনার পরিচিত কোন লোক পেয়েছেন কি ?

হ্যাঁ, এক জনকে পেয়েছেন। তার সাথে বেশ আলাপ আলোচনা করেছেন। কখন আসল, কিভাবে আসল কি ভাবে থাকতেছে এসব বিষয়ে আলাপ করেছে।

উক্ত লোকটির বয়স কত হবে ?

আনুমানিক বিশ-পঁচিশ হবে।

এসব বিষয় জেনে নিয়ে, দু'জন মুজাহিদ সহ ওনার নিকট সাক্ষাত করতে গেলাম। খিমার অদুরে এক বৃক্ষের ছায়ায় বসে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি সংবাদ পেয়েই চলে আসলেন আমাদের কাছে। সালাম মুসাফাহার পর কৌশলাদী জানলাম। তার পর তিনি নিজ থেকেই প্রশ্ন করলেন,

"আপনিই কি মুজাহিদদের আমীর ?

লোকে তাই বলে।

আপনার নামটা জানি কি ?

আবদুল্লাহ্ বিন মাসরুর।

হ্যাঁ আপনার নাম তো বহু বার শোনেছি, কিন্তু দেখার সুভাগ্য হয়নি । আল্লাহর শোকর দেখা হয়ে গেল। জানতে পারলাম আপনি নাকি আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছেন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। বর্তমানে আপনার মিশনের খবর কি ?

আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

নিয়মিত প্রশিক্ষণ হচ্ছে তো ?

আল্লাহর শোকর প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি খুঁটিয়ে খুটিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলেন। তার পর ওনাকে বললাম, হুজুর আপনি আমাদের সম্মানিত মেহমান এখানে থাকতে থাকুন, কোন অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ। এ বলে সেখান থেকে চলে এলাম।

পাঁচ

এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো, উজবেকিস্তান যে ৫ জন মুজাহিদ প্রেরণ করেছিলাম, তাদের কোন বার্তা পাইনি বা ওরাও ফিরে আসেনি। এরা কি জিবীত আছে না বন্দি হয়ে গেছে তারও কোন খবর নেই। তাদের চিন্তা দিলের মধ্যে খুবই পীড়া দিতে লাগল। সীমান্ত এলাকায় যে ৮ জন মুজাহিদ প্রেরণ করেছিলাম তারা ১০/১২ দিন হয় ফিরে এসেছে। ওরা এসে আরো ৫ জায়গার সংবাদ দিয়েছে যে, সেখানে শরনার্থী জমায়েত হয়েছে। এরা কোন রেশন পাচ্ছে না। খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছে।

এক দিকে ত্রান সামগ্রী ৫ জায়গায় পাঠানোর দরকার,অপর দিকে প্রেরিত কাফেলার সংবাদ নেয়ার প্রয়োজন। অন্য দিকে ট্রেনিং সেন্টারের খবর লওয়া ও এখানের প্রতি দৃষ্টি রাখা এসব কাজ কিভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ ডাকা হল। দীর্ঘ আলোচনার পর একজনকে একটি ঘোড়া ও রাহা খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম উজবেকিস্থান কাফেলার সংবাদ নেয়ার জন্য। একজনকে পাঠালাম ট্রেনিং সেন্টার দেখা-শোনার জন্য। আর ৮ জনকে পাঠালাম ত্রান বিতরনের জন্য। আমি ওদেরকে বলে দিলাম তারা যেন ৫টি ক্যেম্পের মধ্যে লোক সংখ্যা ও প্রয়োজন অনুপাতে ত্রান বন্টন করেন। আমি থেকে গেলাম এখানেই।

এশার নামায আদায় করে শয্যা গ্রহণ করলাম। রাজ্যের চিন্তায় ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ গড়া গড়ি খাচ্ছিলাম। মাহমুদা ঘুমের ভান ধরে আছে। তার মাথা আমার বালিশের এক অংশ দখল করে আছে। রাতের প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। একটু ঘুমানোর আশায় চুপ করে রইলাম। চেয়ে দেখি মাহমুদা গাত্রোত্থান করে আমার পার্শ্বে একটু সময় বসে রইল। তার পর কম্বলটি আমার উপর টেনে দিয়ে তার থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম হয়ত অজু এস্তেঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রায় সময় এমনটি করে থাকে। এর মধ্যে বেশ সময় কেটে গেল। এখনো তাঁবুতে ফিরেনি।

আমি শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তাঁবুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান খেজুর বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চোখ ফেরালাম। কোথাও জন-

মানবের কোন চিহ্ন নেই। দুর আকাশে অগণিত তারকা মিট মিট করে আলো ছড়াচ্ছে। চার দিকে ঘুট-ঘুট অন্ধকার। আলেয়ার প্রদীপ ছাড়া কোথাও কোন প্রদীপ জ্বলছে না। চার দিকে নিরব নিস্তব্দতা বিরাজ করছে। কোন প্রাণীর আওয়াজও কর্ণ কুহরে আসেনি। খিমার আশ-পাশে ঘুরে মাহমুদার কোন সন্ধান পেলাম না। অবশেষে গেলাম নদীর কূলে, সেখানেও তার কোন আলামত নেই। বিরামহীনভাবে কলকল তানে নদী বয়ে চলছে। সেখানেও তাকে না পেয়ে চিন্তার অবধি নেই। এমন তো তাকে কোন দিন দেখিনি। তাহলে এঘুট ঘুটে অন্ধকার নিঝুম রাতে সে কোথায় গেল, কেনইবা গেল। সে তো সমস্ত রজনী আমাকে তার বাহু বন্ধনে জড়ায়ে রাখতে পছন্দ করত। তাহলে আজ কি হল তার। ক্ষণিকের বিরহ যাতনা আমাকে কুপোকাত করে দিল। মাহমুদার চিন্তা অন্যসব চিন্তাকে দাফন করেদিল। কোথায় যাব, কোথায় তালাশ করে পাব তা স্থির করতে পারছিনা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শীর শীর করে রক্তগুলো যেন ছুটাছুটি করছিল। আমি খর্জুর বৃক্ষের নিচে দন্ডায়মান।

হঠাৎ চেয়ে দেখি পশ্চিম দিক থেকে একটি মনুষ্য মূর্তি এদিকে ধাবমান। তা দেখে চমকে উঠলাম আমি আস্তে আস্তে খর্জুর বৃক্ষের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করলাম। ছায়া মূর্তিটি আস্তে আস্তে এসে আমার খিমায় প্রবেশ করল। এবার বুঝতে পারলাম এ আর কেউ নয়, আমারই পলাতকা মাহমুদা। সে খিমায় প্রবেশ করার সাথে সাথে আমি দ্রুত একটি ঘন ঝুপের অভ্যন্তরে আত্ব গোপন করলাম।

মাহমুদা শূন্য শয্যা দেখে পাগলিনীর মত বাইরে এসে আমাকে খোঁজতেছিল। সম্ভাব্য জায়গাগুলো তালাশ করে আমার ঝোপের নিকট দিয়ে মন্থর গতীতে ওদিকে যাচ্ছিল। আমি আস্তে করে তার পিছনের দিক দিয়ে এমনভাবে ধরলাম যেন সে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকে আবিস্কার করতে না পারে। সে আমার হাত ছাড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারেনি। একবার ক্ষীণ আওয়াজে বললো আপনি কে? আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তার কথার কোন উত্তর দিলাম না বরং তার গন্ডদেশে একটি চুমু বসিয়ে দিলাম। আমি তাকে এমনভাবে ধরব তা সে কোন দিন কল্পনাও করেনি। তার শরীরে আমি কম্পন অনুভব করছিলাম। সে ভাবছে হয়ত কোন দুষ্টলোক তাকে ধরেছে। এই মনে করে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য কমান্ডো কায়াদায় এক কিক মেরে বসল। কিক খেয়ে আমি ধসবা

করে জমিনে লুটিয়ে পরলাম। মাহমুদা এক দৌড়ে খিমার ভিতর চলে গেল। আমি পিছন দিক দিয়ে ডেকে বললাম, মাহমুদা তোমার সন্ত্রাসীকে নিয়ে যাও। মাহমুদা আমার কণ্ঠস্বর শোনে দৌড়িয়ে এসে আমার পায়ের উপর পড়ে গিয়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। আমি আমার দুঃখকে আড়াল করে বললাম, আরে আমার তো কিছুই হয়নি, তুমি এত পেরেশান হচ্ছ কেন । তোমার সাথে একটু মজা করলাম মাত্র। তার পর শোয়া থেকে উঠতে উঠতে বললাম, তুমি এতরাত্রে কোথায় গিয়েছিলে প্রিয়তমা ? এ বলতে বলতে খিমায় চলে গেলাম। মাহমুদা প্রদীপ জ্বালিয়ে বললো, প্রিয়তম, সব বলব আপনি আগে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাকে হাসি মুখে আবার জড়ায়ে ধরে বললাম আমি ব্যথা পাইনি আর রাগও করিনি। বল তুমি কোথায় গিয়ে ছিলে ?

স্বামী গো আমি অভিসারিণী নই। আমি আপনারই একজন গোয়েন্দা মাত্র। আপনি যখন ছিলেন না তখনো আমি রাতের আঁধারে চুপিসারে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আমি আজ পরিস্কার ভাষায় আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা দুধকলা খাওয়ায়ে বিষধর সাপ পোষতেছি। সে সাপের ছোবল থেকে আত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন। সে সাপগুলো হল হুজুর কেবলা; তার বিবি, কন্যা হেলেনা ও ছেলে শরীফ। এরা সবাই লেলিনের উচ্চ ক্ষমতা সর্ম্পুণ গোয়েন্দা। তারা হুজুরের বেশে ও কৃত্রিম নির্যাতিত সেজে আমাদের এখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে আসছে।

তা তুমি বুঝলে কি করে ?

প্রথম থেকেই এদের উপর আমার সন্দেহ ছিল্ তার পর যখন তাদের প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা চালালাম, তখন একটা একটা করে গোপনীয়তা প্রকাশ হতে লাগল।

কি আলামত পেলে ?

(ক) আমি যখন হাদীয়া তুহফা নিয়ে তাদের খিমায় নিয়মিত যাতায়াত করতে ছিলাম তখন তাদের হাতে একই ধরণের আংটি দেখতে পেলাম। মানুষের পছন্দ এক নয়। কিন্তু তারা মা, বেটা, বেটি এক ধরনের আংটি পছন্দ করল কেন। নিশ্চয় এর মধ্যে যে কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। তাই এক রাত্রে ঘুমের টেবলেট খাওয়ায়ে হেলেনার হাতের আংটি খানা ছিনিয়ে নিয়ে আসি, এখনো আংটি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে তাড়াতাড়িই রহস্য উৎঘাটন হবে।

(খ) দ্বীতিয় রজণীতে দেখলাম গভীর রাতে শরীফ খিমার বাইরে পাহারা দিচ্ছে। খিমার অভ্যন্তরে একটি প্রদীপ মিট মিট করে জ্বলছিল। আমি শরীফের চোখ ফাঁকি দিয়ে খিমার নিকট গিয়ে বসে ছিদ্র পথে চোখটি তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেখি আমেনা বিবি হেলেনার পরনের কাপর খুলে উরুর মধ্যে কি যেন লিখতেছে। অনেকক্ষণ কিঁ যেন লিখেছে । তার পর মনে হল তৈলাক্ত কোন পদার্থ মালিশ করেছে।

(গ) অদ্য রাতে দেখলাম হুজুর কেবলা, হেলনার কাপড় উত্তোলন করে খুব মনোযোগের সাথে উরুর লেখা দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ পর হুজুর কেবলা নিজে ও হেলেনার উরুতে কিছু লিখেছে আমার প্রশ্ন হল হেলেনা এক জন পর্দানশীন পরমা সুন্দরী যুবতী। সে কি করে তার মাকে এবং পিতাকে তার গুপ্ত দেহে লিখতে দিল। এরা মনে হয় মুসলমান নয়। মুসলমানের ভান ধরে আছে মাত্র।

মাহমুদার কথা শোনে আমি হয়রান পেরেশান হয়ে গেলাম। সে মিথ্যা বলার মেয়ে নয় আর এখানে মিথ্যা বলবেই বা কেন। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু বিশ্বাস না করে পারছিনা। অতঃপর মাহমুদা হাত বারিয়ে আংটি খানা দিয়ে বললো, জনাব! হুজুর কেবলার হাতে এধরনের আংটি আছে কিনা তা দেখবেন। আর শরনার্থী শিবিরে আরো কারো কাছে এধরনের আংটি পাওয়া যায় কিনা দেখবেন। যাদের হাতেই এধরনের আংটি দেখবেন এদেরকেই মনে করবেন লিলিনের গুপ্ত চর। এদেরকে খুব চোখে চোখে রাখবেন যেন কোথাও যেতে না পারে।

(ঘ) আর একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড হল হযরতের সাদা দাঁড়ি ও মাথার বাবরী। এগুলো কৃত্রিমভাবে লাগায়ে রেখেছে। এগুলো আসল দাঁড়ি নয়।

এটা তুমি বুঝলে কি করে? রাত্রে এগুলো খুলে রেখে হেলেনার উরুতে কি লিখছিল, তখন এগুলো ছিল এক পার্শ্বে।

মাহমুদার এসব আজগুবী কথা শোনে আমি বিস্মৃত হলাম। অতঃপর বললাম, দেখ মাহমুদা তোমার কথা গুলো অক্ষরে অক্ষরে যাচাই করা হবে। যদি মিথ্যা প্রমানিত হয় তা হলে কিন্তু --------

প্রিয়তম একটি ছাড়া সবগুলোরই প্রমাণ পাবেন কিন্তু একটিই----

তা হলে কোনটির প্রমাণ পাবনা বলবে কি ?

আমার কথা শোনে সে খিল খিল করে হেসে ফেলল। অযথা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবার আর এক দফা হাসল। তার হাসি দেখে

আমি হাবা বনে গেলাম। তার পর সে বলল হেলেনা। এখন তার হাসার কারণ বুঝতে পারলাম। তার পর বললাম হেলেনার বিষয় টি ছাড়া অন্য সব যদি ঠিক ঠিক পাই তাহলে এটাকেও বিশ্বাস করে নেব।

মাহমুদা বলল হেলেনার বিষয়টিও আমি প্রমান করিয়ে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তা কিভাবে হবে? সে বলল, আপনার নিকট যদি তাকে এনে দেই তাহলে কি দেখতে পারবেন না।

ছিঃ এমন কথা বলো না।

আরে না জায়েজ পন্থায় না জায়েয পন্থায়। হেলেনাকে বানাব আপনার দ্বীতিয় পত্নি। তাহলে তার থেকে অনেক গোপন তথ্য পাওয়া যাবে। বুঝলেন সাহেব?

এক তাঁবুতে দুজন সংকুলান হবে না, তাহলে?

আরে কি বলেন, আমি আপনাদেরকে খিমায় রেখে শরীফের মত বাইরে বাইরে পাহারা দিব, আর আপনি হেলেনার উবু------------।

শোন মাহমুদা! এসব ফালতু কথা বাদ দিয়ে কাজের কিছু কথা বল। তুমি যে সব কিছু আবিস্কার করেছ এসবের নিরসন কিভাবে হবে তা বল।

প্রিয়তম আপনি এত গাবরাবেন না। মাসআলা অতি সহজ। আপনি তালাশ করুন এধরনের গোয়েন্দা এখানে আর কতজন আছে। বাকি ঐ সমস্ত শরনার্থী শিবিরগুলোতেও নজরদারী করুণ। সে খানেও পাবেন। তার পর হঠাৎ করে এক দিন সব কয়টারে পাকড়াও করে পাহড়ের গভীর অরণ্যে বালিশ ছাড়া শোয়ায়ে দিবেন। সেখানে চির জনম আরামছে ঘুমাবে। এসব পরিকল্পনা অন্য কোন কানে যেন না যায় (এব্যাপারে কারো সাথে কোন পরামর্শ করবেন না। আমার কথা মত কাজ করলে ইনশাল্লাহ কামিয়াব হবেন। মাহমুদা থেকে তার দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ শোনে উভয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

ভোরে গাত্রোত্থান করে নামায আদায় করে কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করলাম। তার পর নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেলাম শরনার্থী শিবিরগুলো দেখার জন্য। এর মধ্যে মাওলানা সুজা খান দামলাও এসে আমার সাথে শরীক হলেন। কিছুক্ষণ ঘুরা ফেরার পর আরো দুজন এসে আমাদের সাথে শরিক হলেন । তার পর আমরা নদীর অববাহিকায় একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বসে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ মাহমুদার

কথা মনে পরলে তাকিয়ে দেখি এ তিনজনের হাতেও একই ধরনের আংটি শোভা পাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম আসলে এরা সবাই এক। দাড়ির দিকে খুব গভিরভাবে তাকিয়ে দেখি আসলেই তা আলগা বলেই মনে হয়। মাওলানা সাহেব জিহাদের উপর খুব কড়া বয়ান দিলেন। আমরা তার সাথে সাথে জি হ্যাঁ জি হ্যাঁ আর বেশক বেশক বলে সমর্থন করে গেলাম।

ছয়

উজবেকিস্থানে প্রেরিত কাফেলা এখনো ফিরছে না বলে খুব চিন্তায় পরে গেলাম। বিকালে অস্থির বেকারার হয়ে নদীর উপকূল এলাকায় পায় চারী করছিলাম। এমন সময় চেয়ে দেখি ৬ জন মুজাহিদ উজবেকিস্তান থেকে ফিরে আসছে। আমি মহানন্দে লাফিয়ে উঠে সালাম দিয়ে বসলাম। ওরা এখনো নদীর ওপারে। একজন আমার ছালাম শোনেছে, সে হাত নেড়ে নেড়ে আমার সালামের জবাব দিল। তার পর এরা নদী পেরিয়ে এপার আসলে আমি সালাম, মোসাফাহা ও মুয়ানাকা করে সবাইকে একটি নির্জন স্থানে বসলাম। চেয়ে দেখি ৬ জনের মধ্যে এক জন আংটি অলা। এদেখে আমার মাথায় চক্কর লাগছিল। হায় এত কষ্ট করে এত অর্থ খরচ করে দেখি দুশমনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। নাম তার সারায়েভ। চিন্তা করে দেখলাম তাকে যদি তাঁবুতে ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে সফরের কারগুজারী শোনি তাহলে সবার আগে সংবাদ চলে যাবে দুশমনের কানে। আর এখানেও তাকে বসতে দেয়া ঠিক নয়। কারণ এখানে অনেক গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলাপ হবে। একটু চিন্তা করে দেখলাম একে নিয়েই আলাপ শেষ করি। আলাপের পর ফায়াসালা হবে।

আমি দলপতি ইবনে উমরকে বললাম তুমি অতি সংকেপে তোমাদের সফর কাহিনী শোনাও। তখন সে বলল, মুহতারাম! আমরা আপনার দোয়া নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে অগ্রসর হলাম। ভাই সারায়েভ ছিলেন আমাদের রাহাবর। আমরা অতি কষ্টে প্রায় ২০ দিনে পাহাড়-জঙ্গল নদী, নালা, খাল-বিল পেরিয়ে উজবেকিস্থান পৌঁছেছি। সমতল এলাকা হলে ৮/৯ দিনেই এতটুকু পথ চলা যেত। আমরা সেখানে গিয়ে পূর্বের পরিকল্পণা মোতাবিক দু'জন রাজ মিস্ত্রী আর দুজন কৃষি শ্রমিক, আর আমি পত্র বাহক। দু'দল বেলোয়া গ্রামের দুদিকে ছড়িয়ে গেলাম। এদিকে রাজ মিস্ত্রী দলের প্রধান

ভাই সারায়েভ তার সাথীকে এক জায়াগায় রেখে বলল, ভাই তুমি এখানে কয়েকটি দিন অপেক্ষা কর আমি আমার বৃদ্ধা মাকে এক নজর দেখে আসি ও তাকে একটু শান্তনা দিয়ে আসি। এবলে তিনি তার সাথী থেকে গায়েভ হয়ে গেল। কৃষক দলটি শাইখ আহাম্মদ বেলোয়ারী বাড়ীর পার্শ্বে এক বাড়ীতে কাজ নিল। আমি শাইখ আহম্মদ বেলোয়ারীর বাড়ীতে গিয়ে উনারসাথে সাক্ষাত করি এবং পত্রটা তাঁর হতে পৌছিয়ে দেই। তিনি আমাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন। তার পর মাওলানা সুজা খান দামলার কথা জিজ্ঞাসা করলে সব খবরই পাবে, তুমি বহুদূর থেকে সফর করে এসেছ, শরীর ক্লান্ত। এখন খানা পিনা খেয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নাও, তার পর সব কথা হবে। এই বলে তিনি অন্দর মহলে চলে গেলেন।

একটু পরে আমার জন্য খানা নিয়ে এসে বললেন, বাবা খানা খেয়ে নাও। আমি খানা খেলাম। তার পর শয্যা গ্রহণ করলাম। দীর্ঘ পথ চলার কারনে শরীর খুবই ক্লান্ত ছিল, তাই শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পরলাম। বিকাল ৪ টায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে আঙ্গিনায় একটু পায়চারী করে অজু এস্তেঞ্জা সেরে আসরের নামায আদায় করলাম। তখন শাইখ আহাম্মদ বাড়ী ছিলেন না। নামাজান্তে আবার একটু পাঁয়চারী করে মাগরীব পড়ে নিলাম। মাগরীবের নামাজের পর শাইখ আহাম্মদ বাড়ী ফিরে এলেন। তার পর আমাকে নিয়ে উক্ত বাড়ী থেকে এক কিলো মিটার দূরে একটি বাড়ীতে গেলেন। সেখানে আমাকে এক নিবৃত কক্ষে নিয়ে বসিয়ে বললেন, বাবা একক্ষটি তোমার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তোমার মত অনেক মুজাহিদরা একক্ষে আসার সুভাগ্য অর্জন করেছে।

বাড়ীটির চার দিকের বাউন্ডারী প্রাচীর ছিল ১০/১৫ ফুট উঁচা। একটি মাত্র গেইট। গেইটে সব সময় দারোয়ান বসা থাকে। আমাকে যে ঘরে বসালেন, সে ঘরের একটি মাত্র দরজা। তা ছাড়া কোন জানালা নেই। বাইরের আলো বাতাস প্রবেশ করে না। কোন সস্থ্য মানুষকে যদি দু চার দিন এখানে রাখা হয় তবে তাকে আর পূর্বের হালাতে পাওয়া যাবে না। হয়ত পাগল না হয় অসুস্থ হয়ে যাবে। আমি যে শাইখের হাতে বন্দি হয়ে গেলাম এতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

গভীর রাত্রে আরো দুজন গাভুর গাভুর জোয়ান নিয়ে শাইখ আমার রুমে প্রবেশ করলেন। উভয়ের হাতে রয়েছে পিস্তল। শাইখ আমার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এই শালা তোমার বাড়ী কোথায় ? নাম কি? আফগানিস্তান কবে গিয়েছিলি?

জনাব আমার নাম আতাউল্লাহ বারারী। আমি বারারের অধিবাসী। আমি জামিয়ার মেশকাত জামাতের ছাত্র। বলসেবিকদের অত্যাচারে গত ৪ মাস আগে আফগানিস্তান গিয়ে ছিলাম।

তুমি কি বারার জামিয়ার ছাত্র ?

হ্যাঁ আমি বারার জামিয়ার ছাত্র।

বারার জামিয়ার শাইখুল হাদীস আল্লামা উসমান বুখারী আর মহা পরিচালক আল্লামা ফেরাবী সাহেবের খবর রাখ? বর্তমানে তারা কোথায় আছেন?

ফেরাবী সাহেব বর্তমানে কোথায় আছেন তা আমার জানা নেই। আর আল্লামা উসমান বুখারী কে বল সেবিকরা অকথ্য নির্যাতন করতে করতে শহীদ করে দিয়েছে। তার পরিবার পরিজনকেও না কি শহীদ করে দিয়েছে। এত টুকু লোক মুখে শোনেছি।

এদের উপর এত জুলুম কেন হল তা বলতে পার কি ?

তাঁরা কুমউনিজম মেনে নেয়নি বিধায়-----------।

আচ্ছা বলতো, দেশের শতকড়া ৯০ জন কৃষক শ্রমিক, ব্যবসায়ী আর চাকরী জীবিরা তা মেনে নিয়েছে, আর ১০ জন তার বিরুধিতা করে, এটা কি ফেৎনা নয়?

জনাব! কমিউনিজমের মতাদর্শ শরীয়ত সম্মত নয়। এটা মানব রচিত একটি বিধান। এতে জনগনের শান্তি আসতে পারে না। এ মতাদর্শ বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। তাই তারা তা মানতে পারেন নি।

ইয়ে রুহানী কা বাচ্চা কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছ তা ভাবছ কি?

হ্যাঁ, আমি আপনাদের কয়েদখানায় বন্দি।

তোমার পরিনাম কি দাঁড়াবে তা অনুমান করতে পারছ কি?

হ্যাঁ আমার কাংখিত বস্তুটি হয়ত পেয়ে যাব।

তোমার কাংখিত বস্তুটি কি ?

শাহাদাৎ। যা জালেম বেঈমানদের থেকে পাওয়া যায়।

তা হলে সব জেনে শুনেই উত্তর দিচ্ছ, তাই না ?

হ্যাঁ, তা অবশ্যই।

শোন রুহানী! তোমরানা নারী সমাজকে ফতোয়া দিয়ে জাহান্নামের ভয় দেখায়ে কোনঠাসা করে রেখেছিলে, এদের প্রগতীর পথে বাধার সৃষ্টি করছিলে এখন তোমাদের ফতোয়া কোথায় ? এখন কোন মোল্লা-মুন্সিকে

যদি মহিলারা পথে ঘাটে দেখে তা হলে জুতা নিয়ে দৌড়ায়। কোথায় গেল ফতোয়া ?

ফতোয়া ফতোয়ার স্থানেই রয়েছে। যারা ফতোয়া না মেনে তোমাদের কথা মেনেছে, তারা আজ মাথায় হাত মেরে মেরে হায় হায় করতেছে। অনেকেই আত্ব হত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

যারা ধর্মের আবরণে লুকিয়ে থাকতে চায় তাদের দ্বারা দেশ আর সমাজের কোন উন্নতী হয় না। এজন্যই আমরা ধর্মের আবরন থেকে নারী জাতিকে মুক্তি দিয়েছি। তারা এখন স্বধীনভাবে চলা ফেরা করতে পারে।

এটা বেশ্যাদের পক্ষেই সম্ভব।

মোল্লা হয়ে বাস্তবতাকে কিভাবে অস্বিকার কর? দেখনা বর্তমানে মেয়েরা পুরুষের সাথে সাথে কাজ করে যাচ্ছে। কোন প্রশ্ন নেই, প্রতিবাদ নেই।

আপনারা তো প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন প্রতিবাদ করবে কে ?

দেশে যে রক্ত ক্ষয় হয়েছে তা এক মাত্র আপনার মত ছাগল পাগল হুজুরদের কারণে। তা না হয় এমন হত না।

হাঁ ছাগল যদি বাঁচার তাকিদে ভেঁ ভেঁ আওয়াজ নাকরে আপনার মত শিয়ালের খোরাক হয়ে যেত তা হলে আপনাদের অসুবিধার কোন কারণ হত না।

মোল্লাজী একটু মুখ সামলিয়ে কথা বল।

তোমার মত নেতা খেঁতার ধমকে সে দমবে না।

তোমাদের ফতোয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ অবিবাহিত যুবতী মেয়েরা পিতা-মাতার ঘরে যৌন ক্ষুধায় ছটফট করছিল, আবার মেইল-ফ্যোট্রোরীতে, কল-কারখানায় লক্ষ লক্ষ যুবকরা যৌবনের তাড়নায় কাঁতরাচ্ছিল। তাদের ব্যপারে তোমরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করনি। আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে যখন তোমাদের ফতোয়ার কবর রচনা করেছি,এখন তারা সে যাতনা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এখন তারা পবিত্র মন নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সংযম প্রদর্শন মানুষের কাজ। কুকুর-কুকুরীদের নয় তাদের উচিৎ ছিল কুকুর হয়ে জন্ম নেয়ার। তাহলে এসব বাধা বিপত্তি থাকত না। তা ছাড়া আপনার মত শাইখদের দ্বারাই লেজ বাঁকা জানোয়ারের কাজ সম্ভব।

কি ? আমাকেসহ দেশের দুই চতুর্তাংশ মানুষ কে কুকুর বানিয়েছে। মানুষকে কুকুর বানানোর অধিকার আমার নেই। আর আমি খালেকও নই।

মুজাহিদরা আসলেই বড় চাপাবাজ।

না জনাব, চাপাবাজ নয়, সাহসী।

এসব তর্ক বিতর্কের পর আমাকে ভিতরে রেখে বাইরে তালা লাগিয়ে চলে গেল। দীর্ঘ ৮১ ঘন্টা পর অর্থাৎ ৩ দিন ৩ রাত পেরিয়ে ৪র্থ রাত ৮ টার সময় দরজা খুলে শাইখসহ আরো দুজন লোক অস্ত্রসহ ঘরে প্রবেশ করল। এর মধ্যে আমাকে ১ টুকরা রুটি ও এক গ্লাস পানিও দেয়নি। তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেছি। আল্লাহর জিকিরকে আত্মার গাজা হিসাবে বেছে নিয়েছি।

তার প্রায় ১ঘন্টা পর কয়েক জন বলসেবিক পান্ডারা আমার ৩ মুজহিদ সাথীকে চাবুকাঘাত করতে করতে আমার কামরায় ঢুকাল। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের মুজাহিদ ভাই সারায়েভ ছিলেন না। এভাবে আমাদেরকে না খায়ে থাকতে হচ্ছে দিনের পর দিন। ৩/৪ দিন পর কিছু আহার দিয়ে যায়। তাদের প্রহারে আমরা বেহুশ হয়ে যেতাম। ওরা ভৎসনা করে বলত, কই তোমাদের খোদা ? ছাড়িয়ে নিতে আসেন না ? দেখ রুহানীগিরীতে কি মজা। তাদের ভৎসনাগুলো আমাদের কলিজায় বিষ বাণের মত বিদ্ধ হত, কিন্তু জবাব দেয়ার মত কোন মওকা ছিলনা। এভাবে আমাদেরকে প্রায় এক সপ্তাহ আটকিয়ে রাখে। এক দিন রাত্রে আমরা ৪ জনে পরামর্শ করলাম, যে এভাবে আমরা তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার কোন অর্থ নেই, আমরা যদি আমাদের মুক্তির কোন ফায়সালা না করি তা হলে আল্লাহর নুসরাত ও পাব না। আমরা চেষ্ঠা করলে আল্লাহর সাহায্য পাব। চল আমরা কমান্ডো কায়দায় হামলা করে পালানোর ব্যবস্থা করি। আমার কথায় সবাই এক মত হয়ে গেলেন। এর পর থেকে আমরা সুযোগের সন্ধানে থাকি।

পর দিন রাত ১১ টায় শাইখসহ আরো দু'জন হারামী বলসেবিক আমাদের রুমে প্রবেশ করল। তাদের সাথে ছিল ৫ জন অপূর্ব সুন্দরী যুবতী, ও মদের কন্টিনার। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখি এক জন আমার ছোট বোন কানিযা। আমি তার দিকে চাওয়ার সাথে সাথে তারও চোখ পরল আমার দিকে। ভাই বোনের এ চাওয়া চাওয়ি যে কত বেদনাদায়ক তা বুঝাবার ভাষা আমার নেই। সে অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে

অঝুর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করতেছিল। পাষন্ডরা মদ পান করে যখন আমাদের সম্মুখে তাদের উলঙ্গ করতে ছিল তখন আমাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সে সময় আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পরি। অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বক্ষদেশ ঝাঁঝরা করে দেই। তার পর যুবতীদের নিয়ে গেইটে এসে দারুয়ানকে হত্যা করে বেরিয়ে আসি। সারা রাত হেটে হেঁটে এক বনে আশ্রয় নেই, এভাবে কয়েক দিন হেঁটে আমরা তাদের নাগালের বাইরে চলে আসি। সীমান্তের কাছাকাছি এসে এই ভাইকে পেলাম আমাদের খোজতে যাচ্ছেন।

এখন সে সব যুবতীরা কোথায় ?

তারা সবাই ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পরে, পথ চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তার পর নিরূপায় হয় এক দিনের রাস্তা দুরে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে রেখে আসি। এক সপ্তাহ পর তাদেরকে নিয়ে আসব। তার পর রাস্তায় এসে সারায়েভ ভাইকে পেলাম। এভাবে আমরা এসেছি।

তাদের মুখ থেকে এ করুণ কাহিনী শোনে, আমি সারায়েভের গলায় ফাঁসি লাগিয়ে দিলাম। অন্যেরাও তার উপর ঝাঁপিয়ে পরল। মূহুর্তের মধ্যে পাষান্ড জিব্বা বের করে দিল। কয়েক মিনিটেই তার প্রানবায়ু দেহ ত্যাগ করল। আমি তার হাতের আংটিখানা খুলে রেখে গভীর অরণ্যে এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসি।

সাত

আমরা গোয়েন্দা সারায়েভকে খতম করে এক নিবৃত স্থানে বসলাম। তার পর উপস্থিত ৫ জন সাথীকে লক্ষ্য করে বললাম হে দ্বীনের ঝান্ডা বাহী,ও জীবন উৎসর্গকারী জানে-জিগর ভায়েরা দ্বীনের এ ক্লান্তি লগ্নে আলেম বেশে আমাদের ভিতর অনেক গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করেছে। যার তালাশে তোমরা এত কষ্ট করেছ এরা সবাই আমাদের দুশমন ও লেলিনের গোয়েন্দা। এরা স্বপরিবারে আমাদের সর্বনাশ করতে আন্ডা-বাচ্চাসহ অভিনব পদ্ধতিতে অর্থাৎ শরনার্থী সেজে আমাদের মধ্যে অনু প্রবেশ করেছে। আমার মনে হয় যাদেরকে আমরা জিহাদের ট্রেনিং দিয়েছি এদের

মধ্যেও গুপ্তচর রয়েছে এ যেমন সারায়েভ। এ ধরনের আরো দু-এক জন থাকতে পারে। আমি ৮ জনকে ত্রান সামগ্রী বিতরণের জন্য পাঠায়েছি। আর একজন রয়েছেন ট্রেনিং সেন্টারে। উক্ত-৮ জন হয়ত আগামীকাল এর মধ্যে ফিরে আসবে। আর সেন্টারের ব্যক্তিকে যখন খবর দেয়া হবে তখনই ফিরে আসবে। আমরা ওদেরকে নিয়ে বসব। তার পর যাদেরকেই পাব চর হিসাবে তাদেরকেই ধরে মেরে ফেলব। এটা যেন অন্য কোন শরনার্থীরা টের না পায়। প্রয়োজনে আমরা এদেরকে গভীর অরণ্যে নিয়ে যাব সেখানেই তাদেরকে খতম করে দেব যেন জিন্দেগীতে মাছি ছাড়া অন্য কোন প্রাণীও নাজানে।

আমার কথা শোনে মুজাহিদ খোকান্দী বললেন মুহতারাম আমীর সাহেব, শুধু সন্দেহের উপর ভিত্তিকরে সুনিদৃষ্ট ভাবে না জেনে কিভাবে এক জন মানুষকে হত্যা করতে পারি বলুন ?

ভাইয়া তোমার কথা যতার্থ। প্রমাণ ছাড়া কাউকে বধকরা যায় না। আমি তাদের প্রমাণ পেয়েছি। তার পর আংটি খানা বের করে বললাম, দেখ এটাই তাদের বড় প্রমাণ। যাদের হাতে এধরনের আংটি পাবে, এরাই হল লেনিনের গুপ্তচার। এই বলে মাওলানা সুজা খান দামলা ও আমেনা হেলেনা ও শরীফের কথা বললাম। তাঁরা তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তার পর তাদের সর্ম্পূণ বর্ণনা দিলাম। এবার এরাই বললেন, আপনার কথা সত্য। আমাদেরকে যারা পাকড়াও করে নির্যাতন করছিল তাদের হাতেও এধরনের আংটি ছিল।

অতঃপর কর্মের কথাও তাদের কাছে পেশ করলাম যে তারা সারা দিন খুটি নাটি তথ্য সংগ্রহ করে আর রাতে তা একে অপরের গোপনীয় স্থানে অংকন করে । দেখ এরা কত চালাক, এদেরকে যদি ধরে সব কিছু চেক কর তা হলে কিছুই পাবে না। তাদের কাছে না পাবে কোন ডাইরী না পাবে কাগজ। উলঙ্গ করে তো কেউ কোন দিন কাউকে চেক করে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আলগা দাঁড়ির ভিতর উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ওয়ারলেছ রয়েছে। এসবই আমাদের উদ্ধার করতে হবে। আমার কথাশোনে ইবনে উমর বললেন তিনজনের হাত্যার ব্যপারে কোন সন্দেহ নেই। আমেনা,হেলেনা ও সুজাখান। আর দুজন শরীফ ও মোমেনাকে নিয়েই সমস্যা। তারা তো ছোট। আমি বললাম শরীফের বয়স ১৫/১৬ বৎসর হয়েছে, সে বালেগ হওয়ার ব্যপারে সন্দেহ নেই। তাই তাকেও খতম

করতে বাধা নেই। মোমেনা কে আমরা রেখে দেব, পালা-পোষি করব। তার পর সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, তোমরা কয়জন উজবেকিস্তানে গিয়ে ছিলে বা কে কে গিয়ে ছিলে তা তারা জানে না। কাজেই তোমরা যে ফিরে এসেছ এটাও তাদেরকে জানানো যাবে না। এতে সকলেই এক মত হলেন। তার পর আমরা শিবিরে ফিরে আসলাম।

গোধুলী লগনে শরনার্থী শিবিরের সমস্ত যুবকরা এসে আমার খিমার আঙ্গিনায় জমায়েত হল। এ সংবাদ পেয়ে মাওলানা সুজা খান দামলা এসে হাজির হলেন। তাঁর গাল ভরা বুক স্পর্শ সোফায়েদ দাঁড়ি মাথায় ঝাঁকরা বাবরী ও পাগড়ী, গায়ে ইয়া বড় অর্থাৎ জাগত বেড় জুব্বা দক্ষিণ হস্তে শতাদানার তসবীহ আর অপর হস্তে কারু কার্য্য খচিত ছড়ি অন্য জাগায় এ লোকের আবির্ভাব ঘটলে মূর্খরা তাকে নবী হিসাবেই মনে করত। তিনি দাবী করেছিলেন তাঁকে নাকি অনেক নির্যাতন করেছিল বলসেবিকরা। কিন্তু তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলালে নির্যাতনের কোন আলামতই নজরে পরে না। হযরতের চেহারা এত নূরানী তা বলে শেষ করা যাবে না। এত বয়স হলেও পেশানিতে কোন সিজদার দাগ নেই। তিনি আমাদের মাঝে এসেই লম্বাচুরা একটি সালাম টুকলেন। আমরা সবাই সালামের জবাব দিলাম। তার পর আস্তে আস্তে আমার নিকট এসে মুসাফাহা করে বললেন হে আমার নির্যাতিত, নিপীড়িত মজলুম দেশ বাসী ভায়েরা, তোমরা কেউ পিতা-মাতা হারিয়ে, কেউ কেউ সন্তান-সন্ততি হারিয়ে, কেউ ভাই-বোন হারিয়ে আর জায়গা জমি খোয়ায়ে দেশ ত্যাগ করেছ। দেশ ত্যাগ করেছ অনেক গুগ্রাহী বন্ধু-বান্ধব রেখে। আমি ও তোমাদের মত এক জন।

প্রিয় ভায়েরা, এগ্লানি আর অপমানজনক পরাজয় আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জিহাদের মাধ্যমে এখুনের বদলা না নিতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিল ঠান্ডা হবে না। আর যদি জিহাদ থেকে আমরা পিছপা হই তাহলে, এটা হবে শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী। আপরারা কি চান না আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে? এতটুক বলার সাথে সাথে সবাই জী-জী বলে সমর্থন জানাল। এর মধ্যে যাদের কণ্ঠ বেশী শোনা যাচ্ছিল, তারা সবাই ছিল আংটিদারী। আমি তাদেরকে গুনে দেখলাম সংখ্যায় এরা তিন জন। এদের সাথে যে দামলার গোপন সংযোগ রয়েছে তা চাহনীর মধ্যেই ফুটে উঠে তিনি কুরআন হাদীসের আলোকে প্রায় দুঘন্টা জ্বালাময়ী ভাষণ দান করলেন। তার পর কে কে জিহাদ করবে তাদের নাম লিষ্টি করলেন।

এক পর্যায়ে বহুরূপী ও চাটুকার আযম মাওলানা সাহেব বলে উঠলেন প্রিয় ভায়েরা, রাশিয়ার প্রায় অলিতে গলিতে, প্রতিটি বলসেবিকদের মুখে মুখে যারা নাম বেশী শোনা যায়, যিনি কমিউনিষ্ট পার্টির আতংক,সত্যের নাঙ্গা তলোয়ার জানবাজ মুজাহিদ, খালিদ বিন অলিদ, তারেক বিন জিয়াদ আর মোহাম্মদ বিন কাসিমের সুযোগ্য উত্তর সুরী, আমাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডার হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ বিন মাসরুর সাহেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত। তাকে এক নজর দেখার জন্য আমিসহ আমার বিবি বাচ্চারা উদগ্রীব ছিলাম। সে মহান সিপাহসালারকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। তিনি আপনাদের সম্মুখে অগ্নি ঝরা ভাষণ দান করবেন। আপনারা নিজ নিজ স্থানে চুপ চাপ বসে আলোচনা শ্রবণ করবেন।

চাটুকার মাওলানা সাহেবের চাটুকারী কথা শোনে আমি মনে মনে হাসলাম ও ভাবলাম যে, আমার এ নামের বয়স মাত্র ৩/৪ দিন। এর মধ্যে এ নামের এত শোহরত সারা রাশিয়ায় কি করে হল ? সে যেভাবে আমাকে বিশাল আকারে উপস্থাপন করেছে, যেভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, সে ভাবে যদি কিছু বলতে চাই তাহলে এটা হবে আমার জন্য বোকামী আজকের ভাষণ নিশ্চয়ই রেকর্ড হবে। যা আমরা আদৌ ধরতে পারব না। কাজেই আলোচনা থেকে বিরত থাকাই আমার জন্য শ্রেয়। তাই আমি দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গায় গলায় (সুর বদলিয়ে) বললাম, ভাই সব। আলোচনা যত টুকু হওয়ার দরকার তা হয়েগেছে। উনার কথার উপর কথা বলা আমার জন্য শক্ত বেয়াদবী। তাঁর কথার উপর আমল করার তাওফিক আল্লাহ সবাইকে দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন॥ অতঃপর তিনি মুনাজাত পরিচালনা করলেন। তার পর সবাই নিজ নিজ খিমায় চলে গেল।

গভীর রাত। কারো চোখে ঘুম নেই। মাহমুদাও আমার অঘুম নয়নের সাথী। চার দিকে নিরব নিস্তব্ধ। বাইরে ঘন কালো আঁধার ! সারা পৃথিবী তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাঁবুর নিকট কার যেন পদধ্বনি শোনতে পেলাম। দ্রুত তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখি এক যমকালো ছায়া মুর্তি দৌড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অতিতে কোন দিন এধরনের দৃশ্য দেখিনি। মাহমুদা দৃঢ়তার সাথে বললো স্বামী গো, আপনার পিছনে গুপ্ত ঘাতকরা লেগে গেছে। যে কোন সময় ওরা আপনাকে হত্যা করবে। এখন থেকে সব সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

আমার খিমা থেকে অনেকটা পূর্ব দিকে একটি খিমায় থাকতেন আমার প্রিয় মুজাহিদ ইবনে উমর ও ছামদানী। উভয়েই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওরা আমার ট্রেনিং প্রাপ্ত মুজাহিদ। আগে সব সময় এলাকায় পাহারা দেয়া হত। আজ বেশ কত দিন যাবত পাহারা দেয়া হচ্ছে না। কারণ মুজহিদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করায় মুজাহিদ শূন্যতা দেখা দিয়েছে। তাই পাহারা বন্ধ ছিল। আজ রাতের অবস্থা দেখে পাহাড়া দাবির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী অনুভব করতে লাগলাম। তাই ইবনে উমর ও ছামদানীর খিমায় গিয়ে এব্যপারটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন মনে করলাম। তাই মাহমুদাসহ ইবনে উমরের খিমায় গিয়ে ডাক দিলাম, কিন্তু কোন আওয়াজ এলনা। অগত্যা খিমার ভিতর ঢুকে টর্চ লাইটে সাহায্যে দেখি দুটি লাশ রক্তে সাঁতার কেটে জান্নাতে চলে গেছে। তাদের শাহাদাতে আমাদের অন্তর ভেঙ্গে চুর্ণ বিচুনণ হয়েগেছে তাদের মত নিষ্টবান সাথী সহজে মিলানো যায় না। তারা তো শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেছে, তারা কামিয়াব। আমি তো, হয়ে গেলাম একেবারে পঙ্গু। মাহমুদা উড়নাঞ্চলে আমার অশ্রু মুছে দিয়ে বললো,আপনি একজন মুজাহিদ আপনাকে আরো কঠিন অবস্থা দেখতে হবে। 'এর চেয়ে হাজারো কঠিন সমস্যার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। শহীদের লাশের স্তুপে দাঁড়িয়ে হাসতে শিখতে হবে। এমনিভাবে ভেঙ্গে গেলে চলবে না। আমাদের মন্‌জিল অনেক দূর। পথে রয়েছে গিরি, কান্তার, মরু, পারাবার। এসব লঙ্গিতে হবে। আমানিশার কাল রাত্রি পারি না দিলে সুবহে সাদিকে সূর্য্য নূর দেখবেন কিভাবে ?

মাহমুদা এসব বলতে বলতে শহীদের রক্ত হাতে নিয়ে শপথ করল যে, হে আল্লাহ শহীদের পবিত্র রক্তে হাত রেখে শপথ করছি, খুনের বদলা নিবই নিব ইনশাল্লাহ। আমিও তার সাথে সাথে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলাম। তার পর বললো, চলুন আমরা এখন চুপি চুপি হযরত জ্বীর খিমায় যাই। হয়ত সেখান থেকে নতুন কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারব। তার পর আমরা উভয়ে খুব সতর্কতার সাথে মাওলানা সাহেবের খিমার দিকে অগ্রসর হলাম। আমার কাঁধে ষ্টেনগান পা চেপে চেপে তাঁবুর প্রায় নিকটে এসে গভিরভাবে লক্ষ্য করে দেখি তাঁবুর দরজায় এক মানুষ্য মুর্তি চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমরা পশ্চাৎ দিক দিয়ে তাবু ঘেষে বসে গেলাম। আমাদের কর্ণগুলো শশক শাবকের ন্যায় জাগ্রত করে

বসলাম। চোখগুলো তাবুর ছিদ্র পথে প্রবিষ্ট করে দিলাম। চেয়ে দেখি আসলে তাঁবু ছাড়াও শরনার্থী শিবিরের আরো দুজন যুবক তাঁবুর অভ্যন্তরে বসে আস্তে আস্তে গল্প করছে। মাওলানা সাহেব এক জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখে আসছ তো ? উত্তরে বলল, হা সবগুলো খিমা ঘুরে ঘুরে দেখেছি, কোথাও কেও জেগে নেই। কমান্ডার সাহেবও নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। তার পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে সমাধা করেছ ? উত্তরে বলল, ঘুমের মধ্যে, ছুড়ি দিয়ে, দুজনকে

তার পর তারা আনুসাঙ্গিক কিছু কথা বলা বলি করার পর মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাস করলেন, আর কে কত টুকু কাজ করেছ ? এক জন বলল, আমি ট্রেনিং সেন্টারের নক্যা তৈরী করে আপার (আমেনা) নিকট দিয়েছি। অপর জন বলল, আমি শরনার্থী শিবিরের ম্যাপ তৈরী করে আপার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। শরীফ বলল, আমি কমান্ডারের দুটি ছবি অংকন করেছি।

অতঃপর মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি একাগজগুলো কি করেছ ? মহিলা উত্তর দিলেন তা আমি স্বঠিকভাবে সংরক্ষণ করে অর্থাৎ অংকন করে সবগুলো কাগজ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি। তা আপনাকে পূর্বেই দেখানো হয়েছে।

যুবকরা বলল, সংরক্ষিত অংকন আমরা দেখতে চাই। মাওলানা সাহেব হেলেনাকে দেখাতে বললেন। হেলেনা তার উরু বের করে যুবকদের বললো, দেখেন তো নক্সার মিল আছে কি না। যুবকরা ভালভাবে দেখে বলল, হাঁ ঠিকআছে ছেলেটি দুটি কাগজ বের করে বললো, দেখেন তো কমান্ডারের ছবি তার সাথে মিল আছে কিনা ? সবাই কাগজ দুটি হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে বলল, ধন্যবাদ খুব সুন্দর হয়েছে। মাওলানা সাহেব জিজ্ঞাস করলেন, বাবা কিভাবে তুমি তা অংকন করেছ ? উত্তরে শরীফ বলল, তাকে আমি দু অবস্থায় দেখেছি। দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়। তার পর গভীরভাবে নিরীক্ষন করে আস্তে আস্তে তৈরি করে ফেলেছি টাকা বখশিস দিলেন। এতটুকু জেনে আমরা তাঁবুতে ফিরে আসি। পর দিন ত্রান কর্মিরা ত্রান বিতরণ করে সবাই ফিরে এল। আমি বিকাল ২টায় আমাদের মিলনাঙ্গিনায় জমায়েত হওয়ার জন্য বস্তির সমস্ত পুরুষদেরকে নির্দেশ দিলাম। দুটা বাজার আগেই মাওলানা সুজা খান দামলা ও তার গুপ্তচর সহচরেরা এসে মাঠে হাজির হলেন। তার পর আস্তে আস্তে অন্যান্ন যুবক ও পৌঢ়রা আসলেন।

আমি ত্রান কর্মিদেরকে তাদের ত্রান বিতরণ কারগুজারী বর্নণা করার নির্দেশ দিলাম। ত্রাণ কর্মিরা এক জন এক জন করে কারগুজারী শোনাতে লাগলেন। আমি খুব তীক্ষ নজরে লক্ষ করতেছিলাম এখানে কারা কারা গোয়েন্দা এবং কাদের হাতে সে আংটি রয়েছে। দেখলাম প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মুজাহিদদের মধ্যে ৩ জন আংটি পরিহিত আর সাধারনদের মধ্যে দুজন মাওলানা ছাড়া। তার পর ঘোষণা দিয়ে দিলাম যে, আজ রাতে খুব গুরুত্ব পূর্ণ পরামর্শ আছে। আমি যাদেরকে যে খানে ডাকব, আপনারা যথা সময়ে উক্ত স্থানে জামায়েত হবেন। এতে কেউ গাফলতী করবেন না। সবাই রাজি হলেন। তার পর বললাম, হে আমার প্রাণের মুজাহিদ সাথী ও রিপুজী বন্ধুরা আজ আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এক দুঃখ জনক সংবাদ শোনাব। যদিও এটা দুঃখজনক বলে মনে হবে, আসলে এটা দুঃখ জনক নয়। আপনাদের দু সহকর্মি সাথী ইবনে উমর ও ছামদানী গত রাতে জান্নাতে চলে গেছেন। তাদেরকে কে বা কারা ঘুমন্ত অবস্থায় মাথা দেহ থেকে আলাদা করে গা ঢাকা দিয়েছে। এতে চিন্তার কারণ নেই তোমাকে আমাকেও এধরনের অবস্থার সম্মখিন হওয়া লাগতে পারে। চলো আমরা তাদেরকে প্রথম শহীদী গোরস্থানে দাফন করে, শহিদী বীজ বপন করি। এবলে সবাই তাদের কাফনের ব্যবস্থা করি। সন্ধ্যার আগেই তাদের দাফন সমাপ্ত করা হল। তাদের শাহাদতে খিমায় খিমায় শোকের ছায়া নেমে এল। সকলের মুখেই হা-হুতাশ ও কান্নার রোল। তাদের শাহাদতে ব্যথিত হয়নি এমন কোন মানুষ নেই। মনে মনে সবাই ঘাতকদের থেকে বদলা নেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থণা করতে লাগল।

আট

সন্ধ্যার পূর্বে ৫ জন মুজাহিদকে ডেকে রাতের সব ঘটনা শোনিয়ে বললাম, আজ আমাদের ভাগ্যের চুড়ান্ত ফায়সালা হবে। তোমরা হুশীয়ারীর সাথে আমাকে সাহায্য করবে। আঃ সাত্তার বলখী প্রশ্ন করলেন যে কয়জনকে আপনি গোয়েন্দা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তা আমরা চিনব কিভাবে? আমি আংটি বের করে বললাম, এআংটি যাদের হাতে দেখবে তারা সবাই গোয়েন্দা।

এরা কত জন হবে?

মাওলানা সহ এরা মোট ৬ জন।

আর কে কে?

তোমাদের ত্রান কর্মিদের মধ্যে ৩ জন, তারা হল ছাদেক, জসিম ও দৌলত। শরনার্থী পাড়ার দুই জন যে দুই জন ইবনে উমর ও ছামদানীকে শহীদ করেছে খোমায়েভ ও আলায়েভ। আর হল হযরতজ্বী।

এছাড়া কি আরো আছে ?

হ্যাঁ এদের ছাড়া আরো ৩ জন আছে তাদেরকে পরে হত্যা করা হবে।

সে ৩ জন কে ?

এক জন হলেন নবাগত শরনার্থী আমাদের সম্মানিতা মা- আমেনা বেগম। দ্বীতিয় জন হলেন হযরতজীর অতি আদরের রূপসী কন্যা। তোমার আমার বোন হেলেনা খাতুন। আর তৃতীয় জন হল হযরতজীর অতি আদরের দোলাল, পবিত্র কুরআনের হাফেজ সুন্দর-সুশ্রী ভাই শরীফ। এদেরকে আমরা পরে ছাইজ করব।

তাদেরকে কি ভাবে হত্যা করবেন ?

আজ রাতে যে মিটিং এর কথা বলেছি, সেখানে ডেকে নিয়ে হত্যা করব। তার ছুরত হল, তোমরা দুজনকে বলবা রাত ৯ টায় পাহাড়ের উমুক স্থানে হাজির হতে। এরা সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে চার দিক থেকে ফাঁস লাগিয়ে খঞ্জর আগাতে শেষ করবা। আর দু জনকে বলবা পাহাড়ের অপর এক স্থানে রাত ১০টায় হাজির হতে। এরা সেখানে গেলে তাদের সাথে পূর্বের ব্যবহারই করবা এ ভাবে বাকি দুজনকে অন্য স্থানে নিয়ে খতম করবা।

সবাই কি মিটিং এ যেতে রাজি হবে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ কি বল রাজি হবে না। এরা তো এটাই চায়, আমরা কখন কোথায় কি বলি কোথায় মিটিং করি তাজানার জন্য পাগল। সংবাদ পেলে অবশ্যই যথা সময়ে গিয়ে হাজির হবে। প্রত্যেককেই বলে দিতে হবে অন্যকে যেন না বলে। এতে গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

অতঃপর এরা দাওয়াতের কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি মুনাফিক ছাড়া বাকি ৫ জন মুজাহিদকে ডেকে রাতের পাহারাদারি ব্যবস্থা করে দিলাম এবং বললাম তোমরা সবাই আজ সারারাত পাহারা দিবা তোমাদের সাহায্য কারী আজকের জন্য কেউ থাকবে না। আমার নির্দেশে এরা অস্ত্র-সস্ত্রসহ পাহারা দারির জন্য তৈরী হয়ে গেল।

আমি আমার খিমায় গেলে প্রিয়তমা মাহমুদা জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি প্রোগ্রাম তৈরী করেছি। উত্তরে সবই খুলে বললে সে খুব খুশী হল এবং বলল, আমাকে ছাড়া হেলেনাদেরকে কিছুই করবেন না। আমি তাকে ওয়াদা দিয়ে আশ্বস্ত করলাম। তার পর নামাজ আদায় করে খানা খেয়ে বিশ্রাম করতে ছিলাম। মাহমুদা আমার পার্শ্বে বসল। তার পর তার দু হাতের ১০ টি আঙ্গুলে আমার দাঁড়ি ও ঝাঁকড়া বাবরীগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগল। নরম হাতের পরশ পেয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পরছিলাম তা বলতেই পারি না।

রাত ১১ টা বাজার একটু আগে সে আমাকে জাগিয়ে বলল, প্রিয়তম আপনার কাজে আপনি চলে যান। সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি তাড়া তাড়ি গাত্রোত্থান করে অস্ত্র নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আঃ সাত্তার বলখীকে তার বাহিনী নিয়ে দন্ডায়মান পেলাম। তাদের কাছে জানতে পারলাম যথা সময়ে পর পর ৪ জনকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছে। তিনি আমাকে ৪টি আংটি দিয়ে বললেন, আমীর সাহেব এই নিন আপনার গণিমতের আংটি। অতঃপর আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। এর একটু পর হযরতজী তার এক জন সহচর নিয়ে এসে হাজির হলেন। আমরা এক গিরি কন্দরে এদেরকে নিয়ে গেলাম। তার পর চলল আমাদের কথোপকথন। আমি প্রথমই বললাম হুজুর আপনাদের নিকট কোন অস্ত্র থাকলে সম্মুখে রেখে দিন। আমার কথা শোনে উভয়েই চমকে উঠল এবং একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ী করতে লাগল। কিকরবে কি করবে না। বলবে কি বলবে না তা ভেবে পাচ্ছিল না। অতঃপর হুজুর সাহেব তার জুব্বার অন্তপুর থেকে লুট করা একটি রিভলাভার বের করে আমাকে লক্ষ করে ফায়ার করতে চাইল। আমি পট করে তার হাত ধরে অস্ত্রটি নিয়ে নিলাম। হুজুর অমনি মুখে শুখনো হাসির রেখা টেনে বলে উঠলেন, সাববাস অনেক সতর্ক। মুজাহিদ এমনই হওয়া চাই। আমি বললাম হুজুর আপনাকেও ধন্যবাদ। জুব্বার নিচে অস্ত্র রাখা এক প্রকারের মুনাফেকি। অস্ত্র থাকবে প্রকাশ্যে। তার পর অপর সহচরও তার কোমর থেকে আরো একটি রিভলভার বের করে সামনে রেখে দিল। আঃ সাত্তার বলখী দুটি অস্ত্র তার জিম্মায় নিয়ে নিলেন। অপর সাথীরা দুজনের বডি চেক করে দেখল আরো কিছু আছে কি না। এসময় তাদের চেহারা একদম শুখিয়ে গেল।

অতঃপর আমি খুব বিনয়ের সাথে বললাম, হুজুর কতদিন যাবত আপনি এব্যবসায় জড়িত হয়েছেন তা বলবেন কি ?

(আম্‌তা আম্‌তা করে) আমি তো কোন ব্যবসা করিনি। আমি একজন মাদ্রাসার শিক্ষক।

কত বৎসর যাবত শিক্ষকতা করেছেন?

১১ বৎসর যাবত।

একই মাদ্রাসায়, না বিভিন্ন মাদ্রাসায়?

এপর্যন্ত ২ মাদ্রাসায় ছিলাম। প্রথম তিন বৎসর ছিলাম বাখারার জামিউল উলুমে। তার পর ১১ বৎসর যাবৎ উজবেকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে।

কোন পোষ্টে যানি ছিলেন?

সেকেন্ড মুহাদ্দীস।

প্রথম থেকেই কি আপনি দ্বীন ধ্বংসের ঠিকাদার হিসাবে কাজ করছেন না পরবর্তিতে টাকা লোভে?

আপনার কথা বুঝতে পরলাম না।

গোয়েন্দাগিরী কবে থেকে নিয়েছেন,তা জিজ্ঞেস করছি। এখন বুঝলেন তো?

আমি কোন গোয়েন্দা নই।

আমি জানি মুহাদ্দীস সাহেবরা মিথ্যা বলেন না। আপনার কথা থেকে মিথ্যার পঁচা গন্ধ পাই।

আমি সত্য কথাই বলছি। আমি গোয়েন্দা নই।

এতটুকু বলার সাথে সাথে আমি তার দাঁড়িতে ধরে ফেলি। আল্লাহর কি কুদরত দাঁড়ি মোবারক আমার হাতে চলে আসল আর একটি মাজারি ধরণের তালার মত বড় কি একটা যন্ত্র দূরে ছিটাক পরল। অমনি অন্য মুজাহিদরা মাথার চুল মুবারকে টান দিল। চুলগুলোও আস্তে করে চলে আসল হাতের মুঠোয়। হযরতের চেহারা চোখের পলকে পাল্টে গেল। চেয়ে দেখি গোটা মাথার মধ্যে লাল কালির ছোট ছোট অসংখ্য লেখা ও একটি ম্যাপ। এবার চার দিক থেকে আসতে লাগল কিল, ঘুষি, লাথী, থাপ্পর আর চর। নাসিকা থেকে টপ টপ করে ঝরতে লাগল শোনীত ধারা। তার সহচর বন্ধন রত অবস্থায় উস্তাদজীর দিকে ডাগর দুটি আঁখি মেলে দেখছিল।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরতজী খবর কি ? এসব কি দেখছি? হযরত নিরুত্তর। আবার তাকে সহী শুদ্ধভাবে বানাইতে লাগলাম। এবার হযরতের পবিত্র যবান খুলে গেল। তিনি বলতে লাগলেন আমার উপর রহম করুন আমি সবই খুলে বলছি। আমরা সাইজ করা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, এবার বলুন।

হযরত বলতে লাগলেন, ভাই আমি আসলে মুসলমান নই, আমি খৃষ্ঠান। আমি ছিলাম জার নিকুলাই এর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। আমি মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেছি। তার পর লেনিনের গোয়েন্দা বিভাগে যোগদান করি। আমাকে মোটা অংকের টাকা দেয়। আমি ১৪ বৎসর যাবৎ মাদ্রাসায় হাদীস পড়ায়ে আসছি। এর মধ্যে মেধাবী ছেলে দেরকে অনেক টাকার বিনিময়ে খরিদ করে করে ইসলামের বিরুদ্ধে লাগিয়েছি। আমি বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাজী ও কিতাবুল জিহাদ পড়ায়েছি। এর মধ্যে খুব সুক্ষ্মভাবে এমন এমন কিছু যুক্তি ও মত প্রকাশ করেছি যার কারনে তারা জিহাদ বিমুখ হয়েছে এবং জিহাদকে পছন্দ করে না। এমন কি বিরুধিতাও করে থাকে।

এমন ছাত্রের সংখ্যা কত হবে ?

তা আমার জানা নেই বোখারার মাদ্রাসায় শুধু দাওরা জমাতেই ছাত্র ছিল ১৮ হাজার। উজবেকিস্থান আসার পর আমার জামাতে অর্থাৎ দাওরাতে ছাত্র ছিল নিচে ১৫ শ, আর উপরে ৩ হাজার। এর মধ্যেই উঠা নামা করত।

এপর্যন্ত আপনাকে কেউ সন্দেহ করেননি ?

সন্দেহ করবে, আমি এমন কোন কাজ ১৪ বৎসরে করিনি। তাহাজ্জুদ, এশরাক, আওয়াবিন, চাশস্তের নামষ ছাড়াও অনেক নফল নামায পড়তাম। সব সময় সুন্নতের উপর চলতাম। আমার হুজুরায় সকাল সন্ধ্যায় জিকিরে মূখরিত থাকত। ছাত্রদের বিদায়ী বৎসরে ছাত্রদেরকে মুরীদ করতাম। প্রায় ১২ আনি ছাত্রই আমার নিকট বাউয়াৎ হয়ে যেত। আমি ছাত্রদেরকে তালিম, তাবলীগ ও তাযকিয়ার উপর আমল করার উপদেশ দিতাম, জিহাদ সন্ত্রাস বলে কিছু ধারণাও দিতাম। বড় বড় মাহফিলে আমার দ্বারাই দোয়া করানো হত। তাবিজ তুমারের জন্য সব সময় পাবলিকের ভীর লেগেই থাকত। হাদীয়া তুহফা আসত অড়েল।

বাহির মুলকের ছাত্রও কি আপনার আছে?

কি বলেন! পৃথিবীতে যতগুলো মুসলিম দেশ আছে প্রায় সব দেশেই আমার ছাত্র কিছু না কিছু আছে। তবে ইরান, ইরাক, আফগানিস্থান, সহ ভারতবর্ষের বেশ কয়টি প্রদেশের ছাত্র ছিল। তাছাড়া চীন, মালয়শিয়া ও ইন্দুনেশিয়ার ছাত্রই বেশী।

আপনার স্ত্রী কি মুসলমান?

না, আমার স্ত্রী ইহুদী। তার দেশ তেলাবিবে।

হেলেনা কি হয় ?

সে আমার দ্বীতিয় স্ত্রী। জাতিতে খৃষ্টান।

শরীফ ও মোমেনা আপনার কি হয় ?

ওরা আমার সন্তান।

তার পর মাথার আঁকা ঝুকি নিয়ে প্রশ্ন করলে বললেন, এগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে নানান পোগ্রাম। ছিটকে পরা যন্ত্রটির কথা জিজ্ঞাসা করলে বলল এটা উচ্চ ক্ষমতা সর্ম্পূন ওয়ারলেছ। সারা বিশ্বের খবর নেয়া যায়। তারপর তার চালানো পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। অতঃপর দু'বেঈমান গাদ্দারকে খঞ্জরের সাহায্যে হত্যা করে আংটি দুটি খুলে লাশ গর্তের ভিতর মাটি চাপা দিয়ে আসি।

নয়

সোবহে সাদিকের সূর্য্য নুরে পূর্ব আসমান ক্রমশ রাঙ্গা হয়ে উঠছে। স্নিগ্ধ সমিরণ ভোরের আগমনী বার্তা নিয়ে দিক দিগন্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। পাখিরা শাখে শাখে কল-কাকলী জুড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। আকাশ বাতাস তাদের গানে মুখরীত। নদীও আজ মনের আনন্দে কলকল তানে বয়ে চলছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে বারি লেগে এক মনমাতানো আওয়াজে মন-প্রাণ ভরে দিচ্ছে। শিশির ভেজা দুর্বাগুলোতে কে যেন চোখের অলক্ষে মুক্তার দানা ছড়িয়ে দিয়েছে। পুষ্প ডালে গোলাপ, নার্গিস, হাসনা হেনারা ঘোমটা খুলে স্নিগ্ধ হাসি হাসছে। তাদের সৌরবে মাঠ-ঘাট উদভাসিত। বন ফুলেরাও মুখ থুবরে নেই। ওরাও আজ হাসি ছড়াচ্ছে।

আজকের প্রভাত এত মধুময় হয়ে দেখাদিল কেন? আনন্দের দোয়ার খুলে যেন বেরিয়ে এসেছে সব আনন্দ। প্রতিটি নারী পুরুষ, আর যুবক

যুবতীর মনে আনন্দের উর্মিলা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। এর সঠিক কারণ কারো জানা নেই। তাঁবুতে তাঁবুতে আজ খুশীর তুফান বয়ে যাচ্ছে। শরনার্থী পল্লী আজ আনন্দমুখর। মুনাফিক কতলের কথা তো কেউ জানে না। তাহলে ওদের মধ্যে এত আনন্দ উছলে উঠছে কেন ? আমি মনে মনে ভাবলাম, এটা মুনাফিক হত্যার গায়েবী আনন্দ। মানুষের অজান্তেই আল্লাহ সকলের মনে এ হত্যা কান্ডে আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছেন। কাফির হত্যা করলে মুমেনের দিল ঠান্ডা হয়। এটা আল্লাহর বাণী। তার বাস্তব উদাহরই হল আজকের ভোর। আজ প্রতুষ্যেই মাহমুদা পায়েস পাক করেছে। অন্য দিনের তুলনায় আজ অনেক আগেই নাস্তা এনে হাজির করল। আমরা উভয়েই মনের আনন্দে তৃপ্তি সহকারে রুটি দিয়ে পায়েস খেলাম। খুব খেলাম। উদর পূর্ণ করে খেলাম।

তার পর মাহমুদা এক পাত্র বুঝাই করে রুটি আর পায়েস নিয়ে আমাকেসহ আমেনা বিবির তাঁবুতে গেল। তখনও ঘুম থেকে জাগেনি। সূর্য রক্তিম আভা ছড়িয়ে উদিত হয়েছে একটু আগেই। মাহমুদার ডাক শোনে ওরা জাগ্রত হল। অজু এস্তেঞ্জা করল মাহমুদা খিমার মধ্যে এক চাঁদর টানিয়ে আমাকে বসতে দিল। আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। সে সবাইকে পরিবেশন করে নাস্তা খাওয়াল।

পর্দার আড়াল থেকে মোমেনা আমার কোল দখল করে বসে গেল। তার কচি হাত দিয়ে সে নিজেই রুটির টুকরা ছিরে ছিরে বক্ষণ করছে। আমি হা করলে আমার মুখেও তুলে দিল রুটির টুকরা। তার এ আচরণ দেখে আদরে বুক ভরে গেল। শরীফও এসে আমার সাথে ঘেঁষে বসল। ইস্! কি সুন্দর তার চেহারা কত সুন্দর স্বাস্থ্য। এমন ছেলেকে কি করে কতল করব তা নিয়ে ভাবছি। পরক্ষণের হৃদয়ে উদয় হল সাপের বাচ্চাকে দুধ-কলা খাওয়ায়ে কেউ পোষে না। সেও তো বিষধর সাপের বাচ্চা। এ বয়সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লেগে গেছে। কি করে তাকে ক্ষমা করা যায় তা নিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু বাঁচানোর কোন রাস্তা পেলাম না। নিষ্ঠুরতার পরিচয় না দিয়ে উপায় নেই।

হেলেনা যে আমেনা বিবির সতিন, তা এখনো জানতাম না, সে ভাবছিল হেলেনা আমেনার মেয়ে। মাহমুদা রসিকতা করে আমেনা বিবিকে বললো, খালা আম্মা ! আমি কিন্তু মেহমান নিয়ে আসছি।

হ্যাঁ তা তো দেখছি ! তোমরা বস পাক শাক করি তার পর খানা খাবে।

খালা আম্মা সাধারণ মেহমান না কিন্তু বিশেষ মেহমান।

তোমাদেরকে তো আমি সাধারণ মেহমান মনে করি না।

নতুন মেহমান মানে ?

হেলেনার জন্য মেহমান নিয়ে আসছি।

হেলেনার জন্য আবার পৃথক হল কিভাবে ?

আপনি কিছুই বুঝননি "দুলা" নিয়ে আসছি।

সে তো স্বামীর অধিনে আছে।

ইয়া আল্লাহ্ হেলেনার বিয়ে হয়েছে ? তার স্বামী কই ?

এক জনকেই ভাগ করে নিয়েছি।

এক জনকে মানে ?

মাওলানা সাহেব। তিনিই আমাদের স্বামী।

তওবা তা হলে আমি কি ভ্রমের মধ্যে ছিলাম ?

তা অবশ্যই।

এত দিন আপনার কাঁছে রেখেছেন, এখন আমার কাছে দিয়ে দিন।

ও কে কি তোমার অনেক পছন্দ হয়েছে ?

পছন্দের মানুষটিই তো সে। পছন্দ হবে না কেন ? হেলেনা মাহমুদার কথা শোনে কুট কুট করে হাসছিল।

আমি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর কোথায় আছেন ? মহিলাটি উত্তরে বলল, তিনি গত রাত ১০ টায় অন্য এক জনের সাথে বেরিয়ে গেছেন। মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে না কি জরম্নরী মিটিং ছিল। তাই মিটিং করতে গিয়েছেন।

মিটিং এ তো আমিও গিয়েছিলাম। শেষ রাত্রে আমরা মিটিং থেকে উঠে একটু দূরে এসে আবার আমরা নিজেরা মিটিং করেছি ভোর পর্যন্ত। মিটিং শেষে হেডকোয়াটার থেকে জরুরী বার্তা আসছে। উনাকে যে কোন ভাবে সেখানে পৌছতে বিকাল ৪ টার আগে। সীমান্তের ওপারে বাহন উনার জন্য অপেক্ষা করছে, তাই তিনি তাড়া তাড়ি চলে গেছেন।

আপনি কে ? আপনাকে চিনতে পারিনি তো

আমি আপাদেরই একজন। আপনারা যে কাজ নিয়ে এতদূর চলে আসছেন, আমিও সে কাজ নিয়ে আপনাদের থেকে কিছু দিন আগে এসেছি। ভয়ের কোন কারণ নেই।

আপনার কোন প্রমাণ আছে ?

হাঁ, প্রমাণ আমার আংটি। এবলে পর্দার ওপারে আমার হাতটি বারিয়ে দিলাম। আমি আগেই একটি আংটি আঙ্গুলে পরে আসছিলাম। হেলেনা এক টানে খিমার মধ্য খানের পর্দাটি সরিয়ে মুখে মিষ্টি মাখা হাসির রেখা টেনে বললো, আমরা যদি একই হয়ে থাকি তাহলে এত লোকচোরী কেন? তাঁবুর অভ্যন্তরে এত পর্দা কিসের ? আমরা তো একই। এবলে আমার এক পার্শ্বে বসে গেল। মাহমুদা দুষ্টামী করে বলে উঠল বাহঃ কত সুন্দর দেখাচ্ছে, চমৎকার মানিয়েছে মিয়া বিবিকে। হেলেনা আরো একটু কাছে ঘেঁষে বসল। বেগায়রত হেলেনা আমাকে হেলান দিয়ে বসার চেষ্টা করলে হঠাৎ সরে পরি অমনি সে হোঁচট খেয়ে পরে যায়। সবাই খিল খিল করে আবার হেসে উঠল।

মহিলাটির চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমি হাসতে হাসতে বললাম, ভাবী ভাইয়ার খুব চিন্তা লাগছে বুঝি ? আমরা তো আছি, আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। অমনি মাহমুদা বল উঠল আপনি চিন্তা করবেন কেন ? মরদ খুব পাক্কা মরদ। অনায়াসে আমাদের মত ৩/৪ জন রাখতে পারবেন। মহিলাটি বললো, চিন্তা করি কই ? চিন্তা করি না। তবে দু'একটি প্রশ্ন জাগছে তাই।

বলুন কি প্রশ্ন আপনার ?

আমরা যখন প্রথম এখানে আসি, তখন মনে হয় আপনার সাথেই দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছিল, তখন আপনি পরিচয় গোপন রাখলেন কেন ?

আপনাদেরকে বুঝবার জন্য

নিয়ম তো হল কারো সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমেই তার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় আংটি আছে কি না। থাকলে সে হিসাবেই কথা বলতে হয়। সেদিন কি আমাদের কারো হাতে আংটি ছিলনা ?

তা হলে আইন ভঙ্গ করেছেন।

তা অবশ্যই । তবে আপনারা কি আমার আংটি দেখেননি ?

অনেক খোজছিলাম কিন্তু দেখিনি।

আপনি যে ব্যক্তি কে উজবেকিস্থান পাঠিয়েছেন, তার খবর কি ?

এখনো কোন খবর পাইনি।

আপনি যদি আমাদের কেউ হয়ে থাকতেন তা হলে লোক পাঠিয়ে মাওলানা সাহেবকে খোঁজ করাতেন না। আর আপনি যদি আমাদের হয়ে থাকতেন তা হলে আপনার লোক ফিরে আসত এখনো যখন ফিরে আসে নি, তাহলে আর হয়ত আসবে না। আমার একিন হচ্ছে আপনারা আমাদের কেউ নন। এই বলে মহিলাটি ওয়ারলেছ করলেন মাওলানা সাহেবের নিকট। কিন্তু কোন উত্তর আসেনি। নিরূপায় হয়ে হেডকোয়াটারে ওয়ারলেছ করলেন, হে পে, হে পে, ওয়ান্ডারলে হে পে, হে পে, ওয়ান্ডারলে ছাকিপেলে ডা ডা। তেওমে পিসা ছান্ডে। মাও মাও ছনে।

এসব বলার পর মহিলাটি এক চিৎকার দিয়ে জমিনে লুটিয়ে পরলেন। আমরা উঠায়ে বসায়ে শান্তনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি আপা, কি হচ্ছে আপনার ?

আমি হেডকোয়াটারে সংবাদ নিয়ে দেখলাম, ওরা মাওলানাকে যেতে বলেননি। তিনি হয়ত আর ইহ জগতে বেঁচে নেই। মনে হয় আপনারাই আমার স্বামীর ঘাতক।

আপনি এসব কি শব্দ উচ্চারণ করেছেন ?

নিশ্চয় আপনি আমাদের নন। আমাদের হলে এশব্দ গুলো অবশ্যই বুঝতেন। এগুলো আমাদের সাংকেতিক শব্দ। আমরা ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ বুঝবেনা।

হ্যাঁ আপনার ধারণা ঠিক। তবে ওয়ারলেছ কোথায় ? অতঃপর মাথার খোপা থেকে ছোট্র একটি ওয়ালেছ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখন বুঝতে পারছি আমাদের জীবন আপনাদের হাতে।

তা অবশ্যই শরীফ ও মোমেনা কোথায় ?

ওরা নদীর কূলে খেলা করতে গেছে।

হেলেনা আপনারা আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন ?

আপনারা যতটুকু ব্যবহারের উপযুক্ত।

আমরা কি আপনাদের নিকট ক্ষমার আশা করতে পারি না ?

আশা করলে পয়সা খরচ হয় না ,সময়ও নষ্ট হয় না।

আমরা ইতিহাসে পড়েছি , মুসলমানরা নম্র ভদ্র দয়ালো।

তা মুসলমানদের প্রতি। কাফেরদের প্রতি কঠোর।

তা হলে আমি এখনই কলমা পড়ে নিচ্ছি, লাইলাহাইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আল-লা-ইলাহাইল্লাললাহু ওয়া আসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

আপনার এ কালেমা পড়া, মৃত্যুর ভয়ে, ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে নয়।

আপনি আমার দিলের খবর জানেন না। এখানে নিরব থাকাটাই আপনার জন্য শ্রেয়। আমি জানি মুসলমান কোনদিন মিথ্যা বলে না। আপনি বলেছেন মুসলমানদের প্রতি আপনারা রহম করেন। আর কাফেরদের প্রতি কঠোর। আমি তা বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তা হলে করবেন বিশ্বাস ঘাতকতা। আশ্রয়হীন ও নিরস্ত্র অবলা বোনকে হত্যা করা শরীয়তে কিছুতেই বৈধ নয়। আপনি আমাকে হত্যা করলে আমি হব মজলুম আর আপনি হবেন জালেম। আল্লাহ জালেমকে পছন্দ করেন না। লড়াই এর ময়দানেও যদি কেউ ঈমান আনে সেখানেও তার উপর অস্ত্র ধরা জায়েয নয়। তাকেও আল্লাহ তাআলা পিছনের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেন। এখন যদি আমাকে কতল করে দেন তা হলে আমার কোন আপত্তি নেই কারণ আমি নিস্পাপ হয়ে আল্লাহর দরবারে চলে যাব আর আমি হব শহীদ।

হেলেনার প্রতি কথা থেকে কুরআনের গন্ধ পাই। আমি হয়রান পেরেশান হয়ে বললাম, সত্যি যদি আপনি মনে প্রাণে ইসলাম কবুল করে থাকেন তা হলে এখন থেকে আপনি আযাদ। আপনার ঠিকানায় পৌছে দেয়ার জন্য আমি সব ধরনের ব্যবস্থা নেব। আপনি আমার বোন। আপনার জান-মাল ও ইজ্জতের হেফাজত করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। তা আমি অবশ্যই পালন করে যাব। আপনি মুক্ত। আপনি আযাদ।

ভাই হয়ে বোনকে দূরে ঠেলে দেবে এমন টি আশাকরিনি।

দূরে ঠেলে দিচ্ছি না, আপনার অভিভাবকদের কাছে সসম্মানে পৌছে দেয়া ভাই এর কর্তব্য। আমি তাই করতে চাচ্ছি।

আমাকে পাঠিয়ে দিলে আপনাদের মহা বিপদ আছে আর এবিপদ শুধু আপনাদের নয় গোটা ইসলামের।

তা কিভাবে ?

আমি এখানে গোয়েন্দা হিসাবে এসেছি। দেশে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা আমাকে নিয়ে যাবে তার পর আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের সকল ষড় যন্ত্রের খবর পেয়ে যাবে। আপনাদের উপর নেমে আসবে কিয়ামত।

আপনি না বললে ওরা সে খবর পাবে কোথেকে ?

মুজাহিদ ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে খুবই লজ্জা লাগছে। তার পরও বলতে হয়। আপনার এলাকার সম্পূর্ণ নক্সা, আপনাদের নামের তালিকা, ভবিষৎ পরিকল্পনাসহ অনেক গোপন তথ্য আমার উরুতে অংকন রয়েছে। এক প্রকার ক্যামিকেল দ্বারা এগুলো লেখা হয়েছে। পানিতে বা সাবানে নষ্ট হবে না। আমি দেশে ফিরার সাথে সাথে আমাকে জোর করে হলেও ওরা নিয়ে যাবে। তার পর এগুলো নকল করে নিবে। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমি যার আশ্রয়ে ছিলাম তিনি হয়ত বা দুনিয়াতে নেই। এখন কার আশ্রয়ে থাকব ?

পিত্রালয়ে চলে যাবেন

আমি রাশিয়ার বাসিন্দা নই। আমার পৈত্রিক নিবাস ইউরুপে। আমি ছিলাম গির্জার রাহেবা। জোসিফেল্ড (মাওলানা সুজা খান দামলা) আমাকে আমার পিতার কাছ থেকে (নিয়ে আসেন, তিনি আমার পিতাকে বুঝিয়েছেন যে, মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতি ও ধর্মানোরাগী। তাকে আমার সাথে দিয়েদেন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যদি তাদের ক্ষতি করতে পারি তবে খুব ছোয়াব হবে। কেন না মুসলমানরা আমাদের জাত শত্রু। তার পর পিতা আমাকে তার সাথে দিয়ে দেয়। আমি এখন মুসলমান। কেউ আমাকে কবুল করবে না। আমি অতিতে যাবতীয় গোনাহ থেকে তওবা করতেছি। আল্লাহ যেন তারঁ বান্দীকে নিজগুনে ক্ষমা করে দেন। ভাই জান আমাকে তাড়িয়ে দিবেন না।

আপনি কি ইসলামের প্রতি আগে থেকেই অনুরাগী ছিলেন ?

হাঁ আমি ইসলাম নিয়ে অগেই গভেষণা করেছি। এর মধ্যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সম্ভব হলে আগেই ইসলাম কবুল করতাম।

হেলেনার কথা শোনে উক্ত মহিলা তেলে, বেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলতে লাগল, যারা প্রাণের ভয়ে নিজ ধর্মকে বিসর্জন দেয় তাদের স্থান হবে নরকে। তারাই হবে নরকের ইন্দন। ধর্মত্যাগী কুলাঙ্গার স্থান এখানে নেই। দুরহ হারামজাদী। নিজের স্বামীর মৃত্যুশোকে যার চোখ থেকে এক ফুটা অশ্রুও বের হয়নি, সে কত বড় পাষানী।

মহিলার গালা গালি আমার বরদাস্ত হচ্ছিল না। তাই ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মেয়েকে গালি দেয়ার এত বড় অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? এখন সে মুসলমান, সে এখন আমার বোন। ভাই এর সামনে

বোনের বেইজ্জতী কিছুতেই সয়ে নেয়া যায় না। বলুন এ্রপর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে কি কি করেছেন আর কত জন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছেন ?

আমার যেহেতু জীবনের নিরাপত্তা নেই, আর প্রাণ ভিক্ষা চাওয়াও আমার ধর্মে নেই তা হলে বলতে দোষ কি? হাজার হাজার জানের বিনিময়ে ২ টি জান গেলে এতে দুঃখ পাওয়ার কিছুই নেই। আমি তৈয়ার, আমার সন্তান দুটিকে কাছে আনুন শেষ বারের মত দেখে নেই। আমরা যখন তর্ক বিতর্ক করতে ছিলাম তখন পুত্র শরীফ নদীর তীর থেকে এসে তাঁবুর আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার পর তাঁবুর আড়াল থেকেই আমাকে লক্ষ্য করে ফায়ার করল। গুলিটি আমার বাম বাহু ঘেঁষে সামান্য ক্ষত করে চলে গেল। মাহমুদা চোখের পলকে আমার লুট করা ষ্টেনগানটি উচিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে দিল। সাথে সাথে মহিলাটি জমিনে লুটিয়ে পরল। তাবুর বাইরে এসে দেখি শরীফ ও মোমেনার লাশ দুটি পড়ে আছে। রক্তে জামা কাপড় লালে লাল। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, মাহমুদা তুমি কি সর্বনাশ করলা? গোলাপের মত দুটি নির্মল প্রাণকে হত্যা করেছ। মাহমুদা দৌড়িয়ে এসে মোমেনাকে কোলে তুলে নিল। মোমেনা এখন আর জিন্দা নেই। সে উক্ত ভুলের কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। তার পর লাশগুলি নদীর ডালে ফেলে দিয়ে হেলেনাকে নিয়ে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। এখন গোটা এলাকা শত্রু মুক্ত, গোয়েন্দা শূন্য।

দশ

তাবুতে এসে মাহমুদাকে নিয়ে পরামর্শে বসে তাকে বললাম, দেখ মাহমুদা এখনো আমরা বিপদ মুক্ত নই। কারণ হযরতজী একয় দিনে অনেক ভক্ত বৃন্দ তৈরী করে ফেলেছে। সরল মানুষ না জেনে না বুঝে তাকে অনেক বড় একটি কি ভেবেছেন। এদের হত্যার খবর কিছুতেই গোপন থাকবে না। যখন এ খবরটা প্রকাশ হয়ে যাবে তখন সিংহ ভাগ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যেতে পারে। এটা সামলানো খুব কঠিন হয়ে দাড়াবে। মাহমুদা উত্তর দেয়ার আগেই হেলেনা বলে উঠল, কি বলেন ভাই জান এ ব্যপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন, দেখেন কি ভাবে পানি করে ফেলি।

আপনার পক্ষে তা কি করে সম্ভব ?

আমরা তাসকন্দ, সমরকন্দ, বোখারা, উজবেকিস্থান ও তাজিকিস্তানে মুসলমানদের উপর কি তান্ডবলীলা চালিয়েছি আর এখানে এসে কি করেছি। তা যদি মানুষকে শোনিয়ে দেই তাহলে বিদ্রোহী হওয়া তো দূরের কথা আফছুছ করে শেষ করতে পারবেনা।

ঠিক আছে বিকালের জন সভায় আপনিই বক্তব্য রাখবেন।

আমি মাওলানা আঃসাত্তার বলখীকে ডেকে বললাম, তুমি শরনার্থী পল্লীর তাঁবুতে এলান করে দাও, আজ বিকাল ৩ টায় যেন সমস্ত পুরুষরা সঠিক সময়ে মাঠে উপস্থিত হয়। আর সকল মা-বোনরা যেন সুলাং পাহাড়ের পাদদেশে জমায়েত হন। তাদরে সাথেও গুরুত্বপূর্ন পরামর্শ আছে। মাওলানা ঘোড়া দাবড়িয়ে পল্লীর এক প্রান্থ থেকে অপর প্রান্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছে দিলেন।

তিনটার দিকে মাহমুদা ও হেলেনাকে পাঠিয়ে দিলাম মেয়েদের

এস্তেমায় আর আমি অন্যান্ন মুজাহিদ সাথীদেরকে নিয়ে চলেগেলাম পুরুষদের মাহফিলে। এবার চলল তেজস্যি বয়ান। মুজাহিদরা একজনের পর একজন বয়ান দিয়ে চলছেন। তাদের বয়ানের বিষয়বস্তু ছিল মুসলমানদের অতিত ইতিহাস, বর্তমান অধপতনের কারণ ও ভবিষৎ চিন্তা। তার পর আমি দাঁড়িয়ে বলসেবিকদের গোপন ষড়যন্ত্রের সমস্ত ফিরিস্তা একটি একটি করে বয়ান করলাম। তারপর মুনাফেকদের হত্যার কথা প্রকাশ করে দিলাম। আমাদের আলোচনার কারো দিলে কোন খটকা রইলনা। অনেকেই বলাবলি করছিল যে, আহাঃ আমিও যদি হত্যা কান্ডে জড়িত থাকতে পারতাম। কেউ কেউ বলছিল যে, এখন থেকে কাপড়ে-চোপড়ে যত বড় দরবেশই আসুকনা কেন? তার প্রকৃত অবস্থা না জেনে পাত্তাই দেব না।

অতঃপর লিষ্টিভুক্ত যুবকদেরকে একত্রে জমা করে বললাম, তোমরা যথা শিঘ্র প্রস্তুত হয়ে থাক। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠিয়ে দেব। আর অন্যদেরকে সব সময় গোয়েন্দা ও গুপ্তচর থেকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিলাম। তার পর মাওলানা আঃ সাত্তার বলখীকে রাতের পাহারাদারির জিম্মাদারী দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। অতঃপর সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেলেন। আমরাও চলে গেলাম আমাদের খিমায়। মাহমুদারাও তাদের এস্তেমা সমাপ্ত করে খিমায় চলে এল।

মাগরীবের নামাজ আদায় করে মাহমুদাকে তাদের কারগুজারী শোনাতে বললাম। মাহমুদা অদ্য-পান্তে সব কিছুই খুলে বলল। তার পর হেলেনার কথা বলল যে, হেলেনাকে আমি আগে যা মনে করেছিলাম সে তার চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। তার তারিফ করে শেষ করা যাবে না। আপনি ভাল একটি সঙ্গিনীই জোগাড় করেছেন। আমি তার মুখে ছোট্ট একটি চর লাগিয়ে দিয়ে বললাম ছিঃ একি বলছ ? তার মনে যদি কষ্ট পেয়ে থাকে ?

আমি নতুন মানুষটিকে কষ্ট দেব কেন? সে এতে আনন্দ পায়। বিশ্বাস না হলে ---------------।

মাহমুদা বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজের কথা বল।

আচ্ছা তার পর হেলেনা বিবি মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে এক অগ্নিঝরা বক্তব্য পেশ করলেন এতে তিনি মুসলমান দের বিশেষে করে মা-বোনদের নির্যাতনের হৃদয় বিদারক কাহিনী শোনালেন। তার পর মুসলমানদের মুক্তি কোন পথে সে আলোচনা করতে গিয়ে জিহাদের ওপর এবং মহিলাদের করনীয় কি সে ব্যপারে বক্তব্য পেশ করলেন। মাহফিলে এমন কোন মহিলা ছিলনা যে তার চোখের পানিতে অঞ্চলী সিক্ত হয়নি। সমস্ত মহিলারা স্বীকার করেছেন যে তারা তাদের স্বামী, সন্তান ও ভাইদেরকে অন্তর থেকে বিদায় দিয়ে জিহাদে প্রেরণ করবেন এবং যথা সাধ্য সাহায্য ও দিবেন। আজকে নগদ প্রায় ৫ জাহার টাকার গয়না পত্র দিয়ে দিয়েছে। কেউ হাতের কাঁকন, কেউ কানের দুল, কেউ নাকের ফুল কেউ হাতের আংটি হাত রুমালের পুটুলী আমার হাতে দিল। অতঃপর তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করলাম এবং বললাম, আজ হতে তোমাদরকে মহিলা অঙ্গনে জিহাদের কাজ করার এজাজত দিয়ে দিলাম। তোমাদের দ্বারা আল্লাহ এ অভাবকে পুরণ করবেন। অতঃপর নামায সেরে খানাপিনা করে নিলাম।

অতঃপর হেলেনাকে বললাম, এখন থেকে তুমি আমার বোন,ভাই হিসাবে যতটুকু সম্ভব তা আমি দেখা শোনা করব। তুমি এখন মুসলমান। ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলা তোমার উপর ফরয। এখন থেকে নামাযের নিয়ম ও সুরা-কেরাত ও দোয়া গুলো মাহমুদার নিকট থেকে মশক করবা। পাক-নাপাকের মাসআলাগুলো জেনে নিবা। মুসলমান নর নারীর উপর পর্দা ফরয। এখন থেকেই তার উপর আমল করবা। সাবধান

শরীয়তের বরখেলাফ যেন একটি কাজও না হয়। এখন থেকেই তুমি আমার থেকে পর্দা করবা আর আমিও তোমার থেকে পর্দা করব। ভাই বোনের মধ্যে আবার পর্দা কিসের? জিজ্ঞাসা করল হেলেনা। আমি বললাম শরীয়তে ১৪ জন নারীকে বিয়ে করা যায় না। তাই এ ১৪ জনের সম্মুখে যাওয়া দুরস্ত আছে। আর যত আওরত আছে তাদেরকে বিয়ে করা জায়েজ, তাই তাদের সামনে যাওয়া কথা-বার্তা বলা (নিরবে) জায়েজ নয়।

সে ১৪ জন মহিলা কে কে ?

মা, দুধমা, বোন, দুধবোন, দাদী, নানী, খালা, ফুফু, নাতিনী, পুতিনী, নিজের মেয়ে, ভাগ্নী, ভাতিজী ও শ্বাশুরী এ ১৪ জনকে বিবাহ করা হারাম।

তা হলে আমি তো বোন, আমার পর্দা করা লাগবে না।

হুঁ, তোমার মত বোনকে সারা দিনই বিবাহ করা জায়েয আছে। মায়ের উদরের বোন, আর দুধ মাতার উদরের বোন, এদু' বোন ছাড়া যত বোন আছে তাদেরকে শরীয়তের ভাষায় বোন বলে না। কাজেই সে হিসাবে তোমাকে বিবাহ করা জায়েয, অতএব পর্দা করা ফরয।

জায়েয হলে বাধা কিসের? মাহমুদা খিল খিল করে হেসে বলল, সাববাস ঠিক কথাই বলেছে ধন্যবাদ।

হেলেনা পর্দার ব্যাপারে আরো একটু সময় দিতে হবে। তার পর পর্দা করব।

শরীয়তের ব্যাপারে ছাড় দেয়া যায় না। আর তুমি একজন অপূর্ব সুন্দরী, ভাষাও খুব মিষ্ট। সত্য কথা বলতে কি, তোমার সাথে বসে কথা বার্তা বললে আমারই দিলের পবিত্রতা নষ্ট হয়। তাই তুমি পর্দা না করলেও আমাকে করতে হবে।

আমার কোন খাহেশিয়াতের কারনে পর্দার খেলাফ চলতে চাই না। এক মাত্র দ্বীনের খাতিরে। আপনি একজন মুজাহিদ, অনেক কিছু আপনাকে জানতে হবে, তা না হয় যুদ্ধ করবেন কি করে ? আমার নিকট কিছু গোপনীয় এলেম আছে। তা যদি শিখতে হয় তবে অবশ্যই ৬ মাস সময় দিতে হবে। আমাদের সাংকেতিক লেখা ও কথাবার্তা বলা আপনাকে শিখতে হবে। তাহলে ওয়ারলেছে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং তাদের চরম ক্ষতি করতে পারবেন তা ভাষায় বুঝানো কঠিন। তার

কথাগুলো আমার নিকট অনেক মূল্যবান মনে হল। তার পর বললাম, আচ্ছা দেখা যাক এর কোন সুরাহা হয় কি না। তোমার পরামর্শ জিহাদের জন্য অনেকই গুরুত্ব রাখে। এখন একটি কাজ কর ওয়ারলেছ করে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে বল আরো ৩ জন লোক পাঠিয়ে দেয়ার জন্য।

এখন সম্ভব হবে না, কারণ কেন্দ্রের সাথে যোগাযুগের জন্য আমাকে সময় বেধেঁ দেয়া হয়েছে রাত ১১ টায়। আর কমান্ডার সাহেব অর্থাৎ হুজুর এর জন্য কোন সময় ছিল না। তিনি যে কোন সময় ওয়ারলেছ করতে পারতেন। মাহমুদা আচ্ছা আংটি পরায়ে কিছু মুজাহিদকে ভিতরে প্রবেশ করানো যায় না ? ওরা গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে।

হেলেনা না তা এখন হবে না। কারণ অন্য গোয়েন্দারা তাকে দেখলে মনে করবে সেও একজন গোয়েন্দা, তখন তাকে নানা ধরনের প্রশ্ন অনেক কিছু জানতে চাইবে, তখন তো সে কোন উত্তর দিতে পারবে না। তাই তাকে সন্দেহ করবে। মাহমুদা উত্তর দিতে পারবে না কেন ?

হেলেনা ওরা সাংকেতিক কিছু শব্দ ব্যবহার করে, যেমন প্রথম সাক্ষাতেই হয়ত বলবে (সিগারেট হাতে নিয়ে) ভাই আপনার কাছে ম্যাচ আছে। এর অর্থ হল আপনিকি অস্ত্রধারী যদি ম্যাচ বের করে বলে হাঁ। তাহলে বুঝাযাবে তার নিকট অস্ত্র আছে। না বললে অস্ত্র নেই। ভাই আপনার দেশ কোথায় এর অর্থ আপনি কোন সার্কেলে কাজ করেন। ইত্যাদি। অথবা প্রথম সাক্ষাতেই কপাল চুলকাবে এর অর্থ হল-আপনি কোনগ্রুপের ? সে গাল চুলকায়ে জবাব দিবে ৫নং গ্রুপের। কান চুলকালে বুঝবে কোন এলাকায় কাজ করেন তা জানতে চাচ্ছে। তখন দক্ষিণ এলাকা হলে নাকের ডান পার্শ্বে, উত্তরে হলে বাম পার্শ্বে পশ্চিমে হলে নাকের উপরে পুর্বে হলে নাকের নিচে চুলকায়ে জবাব দিতে হবে। এটা হল বাক্য ব্যতিত আলাপ। এধরনের অনেক পদ্ধতি আছে এগুলোর প্রশিক্ষণ দিতে পাক্কা ৩ বৎসর লাগে আর ৬ মাসের একটি কোর্স আছে। সেটা করলেও কিছু চলা যাবে।

রাত ১১ টায় হেলেনা হেড কোয়াটারকে জানাল আমি আফগান সীমান্তবর্তী এলাকার শরনার্থী পল্লী থেকে হেলেনা বলছি। এ এলাকায় যে

কয়জন মুজাহিদ তৎপরতা চালাচ্ছিল সে কয়জনকে কিছু দিন আগে হত্যা করা হয়েছে। এখন আর এখানে জিহাদের কোন কাজ নেই। আমি সহ আরো দুজনকে রেখে কমান্ডার সাহেব ৩ দিন আগে অন্য সব সাথী নিয়ে হেডকোয়াটারের দিকে চলে গেছেন। আমরা আরো কিছু দিন এখানের অবস্থা দেখে কেন্দ্রে ফিরে আসব। আর যদি অবস্থার অবনতি দেখি তাহলে আবার সাথী তলব করা হবে। হেলেনা এধরনের একটি ধাঁ ধাঁ লাগানো সংবাদ হেডকোয়াটারকে জানিয়ে দিল।

এগার

পর দিন সমস্ত মুজাহিদদের ডেকে বললাম প্রিয় জানবাজ মুজাহিদ সাথীরা আমি কিছু দিন প্রশিক্ষণ শিবিরে ও কাবুলে কাটাব। আমি ফিরে আসার আগপর্যন্ত আমার সহকারী সালার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন মাওলানা আঃসাত্তার বলখী। এখন থেকে তোমরা তার কমান্ডে চলবে। গোটা শরনার্থী শিবিরের দেখা-শোনা তোমাদেরই করতে হবে। আর দুজন গিয়ে শহীদ ইবনে উমরের বোন কানিযাসহ যে কয়জন মেয়েকে তার বন্ধুর বাড়ী রেখে এসেছিল তাদেরকে তাদের পিত্রালয়ে পৌছে দাও আর যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে এখানে নিয়ে আস। তাছাড়া আরো বললাম, এখানের জন্য আমি পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলা বারুদ পাঠিয়ে দেব। যান্ত্রিক কোন বাহন এ এলাকায় চলবে না। তাই সাওয়ারী হিসাবে ঘোড়া আর মাল টানার জন্য গাধার ব্যবস্থা করব। তোমরা কোন ধরনের চিন্তা করনা। একজন রাহাবর দিয়ে ৩ দিন পর নতুন সাথীদেরকে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে দিও। এবাদত বন্দেগীর উপর খুব যত্নবান থাকবে। এই বলে আমি তিন টি ঘোড়া নিয়ে মাহমুদা ও হেলেনাসহ কাবুলের পথে যাত্রা করলাম। প্রথম আমরা মনে করে ছিলাম হেলেনা অশ্ব চালনায় অনভিজ্ঞ। কিন্তু তার অশ্বারোহনের কায়দা চমক লাগিয়ে দিল এবং আমাদের ধারণা একদম পাল্টিয়ে দিল। সে যে এক জন দক্ষ ঘোরসোয়ার তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা প্রথমে প্রশিক্ষণ শিবিরে গেলাম। সেখানে ৩ দিন অবস্থান করে সব কিছু পর্য্যবেক্ষণ করে চলে গেলাম কাবুলের বাসায় । বাসা দেখে হেলেনা মাহমুদাকে প্রশ্ন করল আপা এত সুন্দর বাসা অথচ কোন লোক জন নেই, এটার মালিক কে ? মাহমুদা উত্তর দেয়ার আগেই আমি বলে দিলাম, এবাসার মালিক এক মুজাহিদ মহিলা।

মুজাহিদ মহিলা তিনি থাকেন কোথায় ?

কখনো তাঁবুতে, কখনো গিরি কন্দরে আবার কখনো গভীর অরণ্যের ঝুপ-ঝাড়ে।

সে মহিলার কি স্বামী নেই ?

না থাকলে কি করবে ?

আপনার জন্য ------------ ।

এবলে হেসে কুট পাট।

মাহমুদা অশ্ব থেকে অবতরন করে ঘোড়াটা সম্মুখের চত্বরে বেঁধে তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। হেলেনা এসব কিছুই দেখছিল। সে মনে মনে ভাবছিল যে আহা এমন একটি বাসা যদি আমার হত। বাসাটা ছোট হলেও খুব সুন্দর ও পরিপাটি। মাহমুদা আমাদের ডেকে বললো মেম-সাহেবরা বহির্বাটিতে ঘুরে ঘুরে কি দেখছেন। ভিতরে আসুন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে একটি কেদারা টেনে বসলাম। হেলেনা বসল অপর এক কেদারায়। মাহমুদা অতি তাড়া তাড়ি চা তৈরী করে

বলল কিছু বাজার নিয়েএসো। বাজার বলতে কিছুই নেই।

আমি চা পান করে বাজরে চলে গেলাম। হেলেনা খাটে শোয়ে ঘুমিয়ে পরল।

আমি বাজার এনে মাহমুদাকে দিয়ে ঘোড়ার খাবারের ব্যবস্থা করে কাপড় কেচে গোসল সেরে নিলাম। মাহমুদাও পাক-শাক শেষ করে গোসল করল। হেলেনাকে জাগিয়ে বলল, গোসল নেই কদিন যাবৎ,শরীরও বেশ ক্লান্ত, যাও গোসল সেরে খানাদানা খেয়ে ঘুমিও। খানা পিনা সেরে, যোহরের নামায পরে বিশ্রাম নিলাম।

বিকালে আমি চলে গেলাম নাদির শাহের দরবারে। আমাকে দেখেই, তিনি বলেলেন আপনার খবর কি, অনেক দিন যাবত কোন খোজ খবর পাচ্ছি না।

আমি এসেছি কিছু গুরুত্বপূনর্ণ পরামর্শ করার জন্য।

আলবৎ ! আলবৎ ! বলুন কি বলতে চান ?

একটু নিরবতার প্রয়োজন।

এখন তো এখানে আর কেউ নেই, তিনি আমার উজিরে খারেজা (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) তাঁর কাছে সব বলা যাবে।

তা ঠিক তবে আপাদত শুধু হযরতের কাছে কিছু বলব। তার পর উনাকে নিয়ে বসলে ভাল হয়। উজিরে খারেজা চলে গেলেন। দরবার একেবারে খালি।

আমি এক দেড়মাসের যাবতীয় ঘটনাবলী উনাকে জানালাম। গোয়েন্দদের এত সুক্ষ্মতৎপরতার কথা শোনে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। তার চেয়েও বেশী আশ্চার্য্য হলেন আমাদের অপারেশনের কথা শোনে। তিনি তাঁর সিংহাসনে বসে অনেকক্ষণ মাথা নত করে বসে রইলেন কোন বাক্যই তাঁর যবান থেকে বের হয়নি। একটু পর মস্তক উঠিয়ে বললেন, বাবা আল্লাহ্ তোমাদরেকে হেফাজত করেছেন, এখন হয়ত তোমাদের আরো বেশী সতর্ক হতে হবে। তোমাদের এ কর্মকান্ড খুব তাড়া তাড়িই প্রকাশ পেয়ে যাবে, আবার অভিনব সুরতে তোমাদের ভিতর প্রবেশ করবে। দৈনিকই সীমান্ত থেকে শরনার্থী আসার খবর আসছে। যদি সীমান্ত বন্ধ করে দেই তাহলে এ লোকগুলো কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। গোয়েন্দারা তো এদের সুরতেই প্রবেশ করে। এখন থেকে আমি সীমান্তের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।

হে দয়ালো শাহান শাহ্ আপনার উত্তর এলাকা জনশূন্য। নেই বাড়ী-ঘর, নেই লোক চলাচল। মানুষের বসবাস না থাকলে দেশ বিরান মুলুকে পরিণত হয়। শত শত মাইল জুড়ে রয়েছে পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের ফাকে রয়েছে অনাবাদী ভূমি। আপনি যদি দয়া করে এসব অসহায় মানুষদেরকে সে সব জায়গা জমি আবাদ করার হুকুম দিয়ে দেন তাহলে রাষ্ট্রের উপকার হবে। তারপর এদেরকে আপনার প্রজা হিসাবে সুমার করে নিবেন।

তোমার পরামর্শ খুবই সুন্দর কিন্তু ভয় হয়। তোমরা ছিলে পরাজিত জাতি। পরাজিত জাতিরা সাধারণত একটু উশৃঙ্খল হয়। তোমাদের মধ্যে মুনাফিকের সংখ্যা অনেক বেশী। কমিউনিজমের উত্থানের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি হযরত উলামায়ে কেরামের ভূমিকা। সে দেশে এত মসজিদ আর বিশাল বিশাল মাদ্রাসা এবং অগণিত খানকা থাকতে, এত বড় আলেম থাকতে নগণ্য সংখ্যক আলেম ছাড়া সিংহ ভাগ আলেমই জিহাদের বিরোধিতা করেছে। জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে, মুজাহিদদেরকে ধরিয়ে দিয়ে, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বানোয়াট ও কাল্পনিক গুজব

ছড়িয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে মুজাহিদদের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এজাতির অধপতন হবেই হবে। সমরকন্দ-বুখারায় যে হারে আলেম গন বেচা-বিক্রি হয়েছে তা কল্পনার বাইরে। কাজেই তোমাদেরকে বিশ্বাস করা আমার জন্য খুব কষ্ট হয়ে যায়। তবু যখন তুমি আবদার করেছ, মানবতার খাতিরে তা কবুল করে নিলাম। আমি দুচার দিনের মাঝে শিমালী উজিরকে বলে দেব, তিনি যেন উত্তর অঞ্চলের ভূমি মন্ত্রির সাথে পরামর্শ করে সেখানকার জায়গাজমি শরনার্থীদের নামে বরাদ্ধ দিয়ে বাড়ী-ঘর তৈরী করে চাষাবাদ করে খাওয়ার সুব্যবস্থা করে দেন। আর বাড়ীঘর উঠানোর জন্য আমি একটি অনুদান দেয়ার চেষ্টা করব।

অতঃপর আমি হযরত নাদির শাহকে অসংখ্য মোবারকবাদ দিয়ে হাউস ত্যাগ করলাম।

বাসায় ফেরারে পথে জামে মসজিদের খতিব সাহেবের নিকট সাক্ষাত করে আমাদের কার্যক্রম শোনালাম। তিনি খুব খুশী হলেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিলেন। তার পর বাইতুল মালের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, প্রতি নামাযেই কোন না কোন দাতা বা দানশীলরা এসে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। এপর্যন্ত কত কাটা জমা হয়েছে তা আমার জানা নেই। দেখলে বলা যাবে। মসজিদ আঙ্গিনায় জিহাদের দান বাক্স স্থাপন করেছি। কেউ আমার কাছে দিতে চাইলে তাদেরকে বাক্স রাখার কথা বলেদেই। তার পর তিনি আমাকে নিয়ে বাক্স খুললেন। দুজনে গুনে দেখি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কিছু টাকা অস্ত্র ও গোলাবাবুদের জন্য নিয়ে নিলাম। আর ৭৫ হাজার টাকা ইমাম সাহেবের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, আপনি এ টাকার বিবরণ নাদির শাহকে জানিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে বলবেন, তিনি যেন এটাকা শরনার্থীর মাঝে খরচ করেন। এবলে সেখান থেকে চলে আসি।

বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হল ১১ টা। এসে দেখি এখনো দুটি প্রাণ অঘুম নয়নে আমার পথ পানে চেয়ে আছে। আমাকে পেয়ে সবাই আনন্দে নেচে উঠল। তার পর আমরা খানা পিনা সেরে নিলাম। মাহমুদা আজ সারা দিনের কারগুজারী শোনতে চাইল। সে জানতে না চাইলেও আমি তাকে জানাতাম কারণ অনেক সময় তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়ে থাকি। আমি আমার কারগুজারী বনর্ণা করলাম। এমন সময় হেলেনা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি আফগান অধিপতি নাদির শাহের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ তার কথাই বলছি।

তাঁর কাছে যে কেউ সাক্ষাত করতে পারে ? সবাইকে কি তিনি সাক্ষাত দান করেন ?

সাক্ষাত দিবেন না কেন ? তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি প্রজাবৃন্দ যদি উনার সাথে সাক্ষাত করতে চান তবে, সাক্ষত না দিলে তো গোনাহ হবে।

কোন দ্বার রক্ষী নেই কি ?

অবশ্যই আছে।

এরা বাধা দেয় না ?

প্রথমে যাচাই বাছাই করে দেখেন, তার পর অনুমতি হলে তাকেই সাক্ষাত করতে পাঠান।

হ্যাঁ মুসলমানরা কত ভাল কত অমায়ীক তাদের ব্যবস্থা। আমাদের ইউরোপের কোন রাজা বাদশার নিকট সাধার জনগণ যেতে পারেন না। দেয়ালের সাথে মাথা কুটলেও তার ভাগ্যে এমনটি জুটে না।

নাদির শাহের কথা শোনে এমন চমকে গিয়েছিলে কেন ? এ ব্যপারে কিছু বলবে কি ?

হ্যাঁ কিছু বলব, এখন না, আপনাদের আলাপ শেষ হলে।

অতঃপর মাহমুদা বলল, আজ আপনার এজাজত ছাড়াই একটি কাজ করে ফেলছি। আশাকরি ক্ষমার নজরে দেখবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি অপরাধ করেছ বল, ক্ষমার যোগ্য হলে অবশ্যই ক্ষমা পাবে। তা নাহয় শাস্তি ভোগ করতে হবে। তার পর সে বলতে লাগল–

আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার সানী বেগম শহরটি দেখতে চাইলে আমি তাকেসহ হিজাবে আবৃত হয়ে শহরটি ঘুরে দেখেছি। আমি ধমক দিয়ে বললাম মাহমুদা সব সময় হাসি মজা করা ঠিক নয় এতে শক্ত গোনাহ হবে। তাকে আমি বিয়ে করিনি, তুমি বলছ সানা বেগম। এটা কিন্তু ঠিক করনি।

ভুল হয়েছে ক্ষমা চাই, আর এমন হবে না।

তার পর বল–

আমরা প্রায় দুঘন্টা শহর ঘুরে বাসায় এসে লেখা পড়া করেছি।

কি লেখা পড়া করেছ ?

আমি হেলেনাকে সুরা কেরাত মশক করায়েছি। আর সে আমাকে কয়েকটি সাংকেতিক শব্দ শিখিয়েছে।

যাক তোমাদেরকে ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন। তোমরা যাও ঐ রুমে গিয়ে দুজনে থাক। আমি এখানেই থাকব। তার পর ওরা দুজন চলে গেল পাশের রুমে। আমি এরুমে শোয়ে পরলাম। হঠাৎ মনে হল হেলেনার কাথা,সে বলেছিল নাদির শাহকে নিয়ে কি আলাপ করবে। রাতও অনেক গভীর হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে পরলে ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক হবে না তাই ঘুমিয়ে পরলাম।

ভোরে গাত্রোত্থান করে নামাযা পড়ে তিলাওয়াতে বসলাম। তিলাওয়াত শেষে হেলেনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি গত রাত্রে নাদির শাহের কথা কি বলতে চেয়ে ছিলে তা তো আর বলাহল না। এখন বল শোনি । হেলেনা বলল–

নাদির শাহের দরবারে আমাদের ৩ জন লোক আছে। এতটুকু শোনে আমার গা শিউরে উঠল, শরীরে কম্পণ আরম্ভ হল। জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা, কি করে ?

এক জন সেনা বাহিনীর সালার। আর একজন প্রধান দ্বার রক্ষী। আর একজন হলেন উজিরে খারেজা।

একি সর্বনাশের কথা বললে হেলেনা ? এরা সবাই গুরুত্বপূর্ন পদ নিয়ে, ভাল ভাল স্থান দখল করে বসে আছে। তোমার কথা সত্যি ? না কোন ফেতনা সৃষ্টি করার মানসে এমন টি বলছ। আমি তো এখনো তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি ইসলাম গ্রহণের পর সমস্ত মিথ্যা, অসত্য ধোকাবাজি থেকে তওবা করেছি। বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। আল্লাহ আমার ব্যপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তা হলে ধরিয়ে দিতে পারব।

আগামী কালই দেখব তাদের আংটি আছে কি না।

না, এরা আংটিধারী নন। যারা ভ্রাম্য মান আংটি শুধু তাদেরই প্রতিক। তবে আংটি ধারী কাউকে দেখলে ওরা চিনবে এবং আলাপও করবে।

তা হলে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু আমাকে শিখিয়ে দাও যেন সন্দেহ মুক্ত থেকে একটু আলাপ করতে পারি।

হ্যাঁ, এখনই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি আংটি পরে তার কাছে যাবেন। সে হয়ত আপনাকে চিনবেনা। তখন আংটি পরা হাত দিয়ে তার সম্মুখে কপাল- চুলকাবেন সে যেন তা দেখতে পায়। তখন সে দাঁড়ি বা

চিবুক হাতিয়ে প্রশ্ন করবে আপনি কোন গ্রুপের তার পর আপনি ডান কান চুলকায়ে উত্তর দিবেন, আমি দক্ষিণ জুনের। অর্থাৎ আফগানিস্তান ভিত্তিক যে সংস্থা রয়েছে তারই একজন। তার পর সে যত প্রশ্নই করবে আপনি মাথা হাতিয়ে উত্তর দিবেন এখন না কথা পরে হবে।

হেলেনার নিকট থেকে এ কয়টি কৌশল শিখে আমি চলে গেলাম দারবক্ষীর নিকট তার পর দেখলাম হেলেনার কথা সত্যি। সেখান থেকে চলে গেলাম নাদির শাহের খাস দরবারে। সালাম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখি উজিরে খারেজা একটি চেয়ার দখল করে বাদশার এক পার্শ্বে বসে আছেন। নাদির শাহ আমাকে বসতে ইশারা দিলে আমি একটি চেয়ারে বসে গেলাম। তার পর উজিরে খারেজাকে লক্ষ্য করে কপাল চুলকালাম। প্রথম তিনি লক্ষ্য করেননি। দ্বীতিয়বার ভালভাবে লক্ষ্য করে তিনি দাড়িতে হাত দিলেন সাথে সাথে ডান কান চুলকিয়ে জবাব দিলাম। তার পর তিনি গালে হাত দিলেন, আমি মাথা হাতিয়ে উত্তর দিলাম। উজিরে খারেজা আমাকে দেখে তার চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। তার পর সেখান থেকে বাসায় ফিরে আসলে মাহমুদা ও হেলেনা এসে একযুগে প্রশ্ন করল কি মুজাহিদ সাহেব খবর কি ? সত্য তার প্রমাণ মিলেছে কি ? আমি উত্তর বললাম হাঁ, ঘটনা সত্য। তবে বাদশাকে এখনো জানাইনি। তোমাদের সাথে পরমর্শ করে পরে জানাব।

বার

হেলেনা ও মাহমুদাকে নিয়ে পরামর্শ করলাম নাদির শাহের নিকট কি করে সেসব মুনাফিক ও গাদ্দারদের কথা জাননো যায়। হেলেনা বলল,বিশ্বস্ত লোক ছাড়া কেউ কোন দিন ভাল পদ দেয় না। কাজেই উক্ত তিন জন গোয়েন্দা অবশ্যই নাদির শাহের বিশ্বস্ত ভাজন। এদের ব্যপাবে একটা কিছু শোনলেই যে বিশ্বাস করে নিবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। এমন কি হিতে বিপরীতও হতে পারে। আমি মনে করি এ প্রস্তাব দোস্তের মাধ্যমে দেন। এর আগে তাঁর দোস্তকে এমন ভাবে বুঝাতে হবে যেন তিনি তা শত ভাগ বিশ্বাস করেন। এভাবে প্রস্তাব দিয়ে দেখেন কি ফল দাঁড়ায়। যদি কাজ নাই হয় তবে পরে দেখা যাবে কি করা যায়। মাহমুদা হেলেনার কথা ঠিক আছে। আপনি ঐভাবে চেষ্টা করুন, আর আমি রাণী মা কে হাত

করে দেখি কিছু করা যায় নাকি। তবে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ হক আর বাতিলের ফায়সালা করবেন।

আমি অনেক ভেবে চিন্তে, জামে মসজিদের খতিব আল্লামা সামসুল হক নজদী সাহেবকে সাব্যস্ত করলাম। কারণ এক দিকে তিনি এযুগের সামসুল উলামা। সর্ব জন শ্রদ্ধেয়। আবার নাদির শাহ যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তাকে ডেকে আনেন। অনেক কাজ তাঁর পরামর্শ নিয়েই করেন। তাই এক দিন গভীর রাতে খতিব সাহেবের হোজরায় গিয়ে সাক্ষাত করে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি তা কিভাবে জানলাম? আমি হেলেনার পূর্ব ইতিহাস শোনায়ে বললাম সেই আমাকে এতথ্য দিয়েছে। আমি ও তা যাচাই বাচাই করে সত্যতার প্রমান পেয়েছি। হযরত যদি ইচ্ছা করেন তা হলে যে কারো মাধ্যমে তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আপনি এতক্ষণ যে সব কথা বার্তা বলেছেন এগুলো পাগলের প্রলাপ ছাড়া বৈ কিছুই নয়। এপ্রস্তাব যদি শাহের কানে পৌছে তা হলে তাকে নিষ্টুর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এক জন খৃষ্টান মহিলার কথা বিশ্বাস করে আপনি আগুন লাগাতে চাচ্ছেন। এধরনের ফেৎনার সৃষ্টি করা কোন মুজাহিদের কাজ নয়। আপনারা নিজদেশ থেকে পিটুনি খেয়ে এদেশে এসেছেন এখানে ভাল ভাল থাকুন এটা কামনা করি। জিহাদ করতে চান ভাল কথা। নিজদেশে গিয়ে জিহাদ করুন। অন্য দেশে ফেৎনার সৃষ্টি করা ঠিক নয়। আপনি যে উজিরে খারেজার কথা বলছেন তাকে কি আপনি জানেন, সে কি ধরনের লোক ? তিনি হলেন আমার মুরীদদের মধ্যে শ্রেষ্ট মুরীদ। তিনি প্রতি জুমার রাতে আমার খানকায় আসেন। সারারাত জিকির-আজকার ও এবাদত বন্দীগি করে সকালে চলে যান। এখানকার যাবতীয় খরচ তিনি একাই বহন করেন। তাছাড়া আমার জন্য হাদীয়া তুহফাও পাঠান প্রচুর। আমার অনপুস্থিতে তিনিই খানকা পরিচালনা করেন। তার ব্যপারে সতর্ক হয়ে কথা বলেন। আপনি যদি আমার দেশের মেহমান না হতেন তাহলে রং দেখায়ে দিতাম। যান, যান, এসব কথা নিয়ে আর কোন দিন এখানে আসবেন না।

হুজুর বেয়দবী মাফ করবেন। আপনি যার কথা বলছেন সে কিন্তু মুসলমানই নয়, সে খৃষ্টান। আপনার নিকট হার তবকার লোকজন আসে,

কথা বার্তা বলে। এসব চেক দেয়ার জন্য এবং আপনার গতি বিধি লক্ষ্য রাখার জন্য আপনার নিকট মুরিদ হয়ে যাতায়াত করতেছে। এটা তার দায়িত্ব এটা তার কাজ। তা ছাড়া অন্য আর কিছু নয়। স্বয়ং হুজুর (সাঃ) এর সাথেও মুনাফিকরা থাকত আল্লাহ না জানালে তিনি চিনতেন না। ঠিক তেমনিভাবে সে আপনার অন্তরঙ্গ হয়ে আছে। আর একটি কথা মনে রাখবেন, হাদীয়া তুহফা দেয়া নেয়া সুন্নত, কিন্তু মাত্রার বাইরে নয়। যারা বেশী বেশী হাদীয়া গ্রহণ করে সে দাতার প্রতি সব সময় দুর্বল থাকে। তাকে এসলাহ করতে ধমক পর্যন্ত দিতে সাহস পায়না। এজন্য উচিত যে পরিমান হাদীয়া সে গ্রহণ করবে, এর চেয়ে বেশী সে হাদীয়া দিবে। তাহলে দিলের মধ্যে কোন গর্ব অহংকার আসবে না। আর সে কারো প্রতি মুহতাজ থাকবেনা। থাকবেনা কারো প্রতি দুর্বল। হক কথা বলবে সে বুক ফুলিয়ে। কে মুরীদ আর কে গয়রে মুরীদ তার কোন তফাত রবে না। এখন হয়ত আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু এক দিন না এক দিন তা প্রকাশ পাবে। তখন আর আপছুছ করলে কোন ফল হবে না। আমি আপনার থেকে এমনটি আশা করিনি। নবী যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত খৃষ্টানরা মুসলমানদের কতই না সর্বনাশ করেছে তা আপনার জানা। এমন কি কাজ আছে যা তারা করতে পারে না। আফগানিস্তানে এই ৩/৪ মাস আগে যে সব গুপ্ত হত্যা হয়েছে তার পিছনে রয়েছে তাদেরই হাত। তাদের ধুর্তমী সরলামনা মুসলমানরা মুটেই ধরতে পারে না। বিশাল বিশাল ইসলামী সম্রাজ্যগুলো চোখের পলকে তাদের হাতে নিয়ে নিল। আপনার চেয়ে নবীর (সাঃ) কাশফ এলহাম কম হতনা। ওহীর দরজাও তাঁর জন্য উম্মুক্ত ছিল। তার পরও এই কাফিরের বাচ্চারা ধোকা দিয়েছে। চোখের সামনে ৭০ জন হাফেজ সাহাবাকে নিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। নবীর কলিজায় সেল দিয়েছে। নবী পর্যন্ত তাদের চালাকী বুঝতে পারেননি। আমার দায়ীত্ব ছিল মুসলীম জাতির রাহাবর হিসাবে আপনা কে জানানো তা আমি পালন করতে পেরেছি বলে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। এধরনের মাসআলা যদি আরো সামনে আসে, তবে অবশ্যই আপনাকে অবগত করাব। আমার দায়িত্ব আমি নিরলসভাবে পালন করে যাব। আপনার দায়িত্ব হিসাবে আপনিই ভাল বুঝেন।

তুমি এক জন মুজহিদ হিসাবে তোমার দেশে জিহাদের কাজ চালিয়ে যাও, এদেশের ব্যপারে নাক গলাতে যেওনা। আমি প্রতি জুমার বয়ানে জিহাদের কথা বলতেছি, সামনেও বলব এতে মানুষ আর্থিক সাহায্য নিয়ে

এগিয়ে আসছে। আমার আলোচনা আমি চালিয়ে যাব। আর একটা কথা বলছি তা তুমি ভালভাবে ইয়াদ রাখবে । তাহল, এদেশের এক জন যুবককেও তুমি তোমার দলে নিতে পারবে না। তোমার দেশের যুবকদের নিয়ে জিহাদ করবে। বুঝলে তো ?

হুজুর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেছেন কোন এলাকা যদি কাফির কতৃক আক্রান্ত হয় তবে সে এলাকার লোকের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। অর্থাৎ নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী এমন কি নাবালেগ বাচ্চাদের উপরও। তারা জিহাদ করে কাফিরদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারতেছে না, বা অস্ত্র-সস্ত্রের অভাবে জিহাদ করতে ছেনো, বা অলসতা করে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, এমতবস্থায় তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানের জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আক্রমণ কারী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। পার্শ্ববতী এলাকার মুসলমানরা যদি জিহাদ করে না পারে, বা ভয়ে জিহাদ না করে বা জিহাদে অলসতা করে তা হলে তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। এ ভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় সে হিসাবে আপনারা আমাদের পর্শি। আপনাদের উপরওতো বর্তমানে আমাদের পক্ষ হয়ে জিহাদ করা ফরয। তা তো আপনারা আদায় করছেন না। এতে কি ফরয তরকের গোনাহ হবে না? তার পরও যদি বলেন যে, আপনার দেশের একটি ছেলেও যেন আমার দলে না নেই।

আচ্ছা হুজুর কোন যুবক যদি সেচ্ছায় আমার দেশের মসজিদ মাদ্রাসার হেফাজতের জন্যে। মা বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে, ইলায়ে কালিমাতুল্লার জন্যে শাহাদাতের প্রবল তামান্না নিয়ে আমার দেশে যুদ্ধ করতে যেতে চায় তাহলে তাদেরকে আমি কি বলব ? ফরয এবাদতে কি করে বাধা দেব ? এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা চাই। কারণ অনেক যুবকরা নাম দিয়েছে এরা বার বার তাগাদা করতেছে। আমি তাদেরকে বারণ করে রাখতেছি।

যে সকল যুবকরা নাম দিয়েছে এরা কি পিতা মাতার এজাজত নিয়েছে ? এরা কি এদেশের সরকারের অনুমতি নিয়েছে ? তা ভালভাবে যেনে দেখ। আমার মনে হয় তোমার অগ্নি ঝড়া বক্তৃতায় তারা উদবুদ্ধ হয়ে নাম দিয়েছে।

হুজুর আমার বেয়াদবী মাফ করবেন। আল্লাহ তাআলা সূরা তওবায় পরিস্কার বলে দিয়েছেন আপনি বলে দিন যে, যদি তোমদের পিতা, তোমাদের সন্মান-ও তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের স্বগোত্র এবং সে সম্পদ যা তোমারা অর্জন করেছ আর সে ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার তোমাদের আশঙ্খা থাকে, আর সে গৃহ যা তোমাদের নিকট অতি প্রিয়, তোমাদের নিকট আল্লাহকে এবং তার রাসুল হতেও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে তোমরা প্রতিক্ষায় থাক সে সময় পর্যন্ত যে আল্লাহ তাআলা নিজের বিধান পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ তাআলা আদেশ অমান্যকারীদের তাদের গন্তব্যে পৌঁছাননি। (সুরা তওবা-২৪) হযরত উক্ত আয়াত দ্বারা তো স্পষ্ট বুঝা যায় জিহাদের পথে বাধা দিতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই। আর কেউ যদি বাধা প্রদান করে তবে তার বিরোধিতা করা ফরয। এখন আমি ঐ যুবক দেরকে কি বলতে পারি বলুন ?

শোন এখানে ফতোয়া বাজী চলবে না। আমার মুরীদ (উজিরে খারেজা) জিহাদ কে অত্যন্ত ভাল বাসে। সে দিন ও তিনি জিহাদের ফাণ্ডে ২৫ হাজার টাকা আমার হতে দান করেছেন। তিনি বলেছেন হুকুম মানা ফরজ। কেউ যদি এদেশ থেকে জিহাদে যেতে চায় তবে তাদের নামের তালিকা উজিরে খারেজার দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে। তারাঁ যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকে হুকুমতের পক্ষ থেকে পাঠাবেন। তিনি আরো একটি কথা বলেছেন, তা খুবই যুক্তি সম্পূর্ণ তা হল, এদশ থেকে যদি কোন সেচ্চাসেবক রাশিয়ায় পাঠানো হয় আর ওরা জানতে পারে তবে এদেশের উপর তারা হামলা করে বসবে। তখন এদেশটিও ধ্বংশ হয়ে যাবে। শান্তি বিনষ্ট হবে। বর্তমানে যারা হিযরত করে এদেশে আশ্রয় নিতেছে তাও তখন বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যই তোমাকে বার বার একথাই বুঝাচ্ছি।

হযরত তার কথা গুলো কুরআন সুন্নার খেলাফ। এধরনের গাজা খুরী যুক্তিতে আপনাকে কাবু করে ফেলছে তা খুবই আশ্চার্য। তবে মনে রাখবেন, তাদের মিশন কামিয়াব। তারা যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল তাতে তারা জয়ী হয়েছে। আপনার মত জগতবিখ্যাত আলেমকেও তারা হাতে নিয়ে নিল। এদেশে আসার প্রধান লক্ষ হল আলেম আর প্রশাসনকে হাতে নেয়া। দ্বিতীয় কাজ হল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে

দেয়া। এ তিনটি কাজে তারা সফল হয়েছে। এবলে ২৫ হাজার টাকা বের করে হুজুরের হাতে দিয়ে বললাম কাফিরের টাকা দিয়ে জিহাদ হবে না। তাই তার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিন। তার পর চলে আসলাম।

তের

আল্লামা সামসুল হক নজদী সাহেবের নিকট থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসায় এসে খাটের উপর শোয়ে পরলাম। মনে হচ্ছিল আমার পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে। আমি শূণ্যে ভাসমান। মনে হচ্ছিল মাথার উপর ছায়াদার বৃক্ষটি কাল বৈশাখীর ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল আমার হস্ত-পদ অবস হয়ে আসছে, যে কোন সময় ব্রেইন আউট হয়ে যাবে অথবা প্রাণ পাখি দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করবে।

আমাকে ক্লান্ত মনে করে, একটু আরাম দেয়ার জন্য আমার প্রাণ প্রিয় মাহমুদা অন্য সময়ের ন্যায় শিয়রে বসে আমার চুল দাঁড়ি নিয়ে খেলতে লাগল। আমি একটু ঘুমানোর জন্য চেষ্টা করলাম। ভাবছিলাম ঘুমাতে পারলে হয়ত মাথাটা একটু হাল্কা হবে। তন্দ্রা তন্দ্রাভাবে কেটে গেল অনেক সময় কিন্ত ঘুম আসল না। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, বাহ ডাবল হাতে খেদমত চলছে। তখনই ধমক দিয়ে বললাম একি করছ হেলেনা ? আমাকে জাহান্নামে পাঠাতে চাও ? মাহমুদা যা করছে তা, তার জন্য জায়েজ। আর তুমি যা করছ তা উভয়ের জন্যই হারাম।

আমি শোনেছি স্বামীর খেদমত করা নাকি ফরজ ও সোয়াবের কাজ। তাই আমি আপার নিকট দেখে দেখে পেকটিস করছি।

তোমার স্বামী হলে তার মাথায় অমন করে খেলা করিও।

খেলা না জানলে কি খেলা যাবে? তাই আপার নিকট থেকে প্যেকটিক্যেল করছি।

বাজে কথা বকিওনা, সাবধান হয়ে যাও।

না, তা হলে এমনটি আর করব না। আমি তো সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। অনেক কিছুই জানিনা। আস্তে আস্তে সব জানব এবং সব আমল করব। আপনার খেদমত করা যে এত অপরাধ তা জানতাম না। যদি জানতাম তা হলে কি--------------।

আমাদের ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে এধরনের কোন বিধি-নিষেধ নেই। যুবক যুবতী একই সাথে চলা ফেরা করতেছে কেউ কোন মাইন্ড করে না। চেনা হোক আর অচেনা হোক একে অপরের হাত ধরে বেড়িয়ে

যাচ্ছে। বাসের মধ্যে যদি শীট না থাকে তা হলে যারা দাড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে যার কাছে যে ভাল লাগে তাকে ডেকে এনে নিজের কোলে বসায়। এত টুকু সহানুভুতির কারনে বিনিময় ছাড়া তাকে চুমু দিতে থাকে। পার্কে গেলে বন্ধু-বান্ধবীর কোন অভাব নেই। একে অপরের স্বাথে স্বামী স্ত্রীর মত ব্যবহার করে। ইসলামের ছত্র ছায়ায় এসে বুঝতে পারছি, ইসলাম যে কত সুন্দর। নেই নোংড়ামী, নেই বেহায়াপনা আর বেলজ্জাপনার স্থান। ইস কত পবিত্র এ ধর্ম। ইউরোপিয়ান সব যুবক যুবতীদের মধ্যে রয়েছে কুকুর-কুকুরিদের স্বভাব সে দেশে বৈধ সন্তান আছে কি না তা জানা নেই কারণ স্বামীর বন্ধুরা বেড়াতে আসলে তাদের সাথে-------।

কাজেই কার পিতা কে, সত্যিকার অর্থে তা বলতে পারবে না। তবে ইদানিং ইউরোপিয়ানদের অসভ্যপনা, ও কৃষ্ট কালচার মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশ করতেছে। বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ ধনি দেশগুলোর শাসক গোষ্টি থেকে নিয়ে মধ্যবৃত্ত লোকগুলো বৎসরে কম পক্ষে একবার আমাদের দেশগুলোতে ভ্রমন করেন। তারা দু তিন মাস সেখানে থাকেন। সঙ্গে থাকেন পরিবারের সব গুলো সদস্য। তা ছাড়া অনেকে চাকর, চাকরানীও সাথে করে নিয়ে যান। ৩/৪ মাস আগেই তারা বাসা বুকিং করে রাখেন। বাসা অলারা এদের থেকে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেন।

সেসব দেশে হোটেল রেস্তরায় থাকে হুর-গেলমান সাদৃশ্য খাদেমু খাদেমা। তারা সবাই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুদর্শন। ঐসব দেশ থেকে যাওয়া পরিবারের সব সদস্যরাই তাদের থেকে শারিরীক খেদমত নেন। নিজ দেশে মদ-বিয়ার পান করতে পারে না, সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারেন। আমাদের এখানে মদ-বিয়ার নিয়ে এত মাথাব্যথা নেই। তারা আমাদের দেশে গলা পর্যন্ত ভরে মদ পান করে পানির মত। দামও অনেক কম। সে সব মুসলিম পর্যাটকরা যখন তাদের দেশের বিমানে উঠেন তখন পুরুষদের গায়ে থাকে সাদা ধবধবা মাটি স্পর্শ জুব্বা, আর মাথায় সাদা বালাল রুমাল কানা কানি দু'ভাগ করে এক কোনা পিছনে আর দু'কোনা বক্ষদেশে ঝুলিয়ে রাখেন এবং মাথায় কালো জরীদার কি যেন একটা বস্তু চেপে দেন। দেখতে অনেকটা পাতিল রাখার বিরার মত। তবে একটু বেশ কম শুধু এতটুক এর মধ্যে খুব সুন্দর দুটি লেকও থাকে। এটা পরায় খুব সুন্দর মানায়।

আর মেয়েদের গায়ে থাকে মাটি স্পর্শ কালো বোরকা। চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বোরকার নিচে থাকে খুবদামী মসৃন কামিজ সেলোয়ার। বোরকা পরা নাকি মেয়েদের জন্য সরকার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। তারা বিমানে উঠে টয়লেটে গিয়েই এসব পোষাক খুলে মেয়েরা লেংগট বা জাইংগা পরে আর গায়ে হাতা কাটা গেঞ্জি। আর পুরুষরা তাদের পোষাক খুলে পরেন হাফ পেন্ট আর গায়ে মোটাগেঞ্জি বা শার্ট। যত দিন প্রবাসে থাকেন ততদিন এসব পোষাক ব্যবহার করেন। আবার দেশে ফিরার পথে বিমানে উঠে দেশিয় পোপাষাক পরেন। আমার মনে হয় তারা অবৈধভাবে পয়সা রোজগার করেন তাই অবৈধভাবে খরচও হয়। তারা ইউরোপে কিছু দিন থাকার পর মেয়েরা কুকুরকে পছন্দ করে বসে। দেশে ফিরার পথে মেয়েরা কুকুর ছাড়া ফিরতে চান না। ইদানিং কোটি কোটি ডলারের কুকুর তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোতে রপ্তানি হচ্ছে।

মাহমুদা কুকুর কি বাড়ী পাহারার জন্য আনা হয় ?

হেলেনা না এগুলো তুমি বুঝবেনা অন্য কাজের জন্য। আমি হেলেনাকে ধমক দিয়ে বললাম দুরু খাচ্চর পবিত্র দেশের গিল্লা শেকায়েত আরম্ভ করেছ। এতে নিজের দেশ বাদ রইল কই। বাদ দেও ওসব কথা,কাজের আলাপে আস।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন ভাইজান কি করে এসেছেন। কাজ কত টুকু এগিয়েছে ?

কিছুই করতে পারিনি, বরং মাথার উপর বিশাল চিন্তা নিয়ে ফিরে এসোছি। এখানে মনে হয় আর থাকা হবে না।

মাহমুদা কারণ কি প্রিয়মত ?

কারণ একটিই, কমিউনিজম সুচতুড় গোয়েন্দারা সরকারের কলিজা পর্যন্ত গিয়ে পৌছছে। এখন তাদেরকে বের করার জন্য টান দিলে সে টান লাগে সরকারের কলিজায় আমি এদেশের সবচেয়ে বড় আলেম, পীরও মুর্শিদ নাদির শাহের মুশির জামে মসজিদের খতিব আল্লামা সামসুল হক নজদী সাহেবের নিকট কথাগুলো পেশ করেছি। আমার জানামতে তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি প্রতি জুমায় জিহাদের উপর জুড়ালো বক্তব্য রাখেন। তাঁর কথায় মানুষ শতস্ফুর্তভাবে আর্থিক সাহায্য দিতেছেন। এমন এক সরল সোজা মানুষটিকে তারা কব্জা করে নিয়েছে।

আমি অনেক বুঝিয়েছি। কুরআন, হাদীসের দলিল দিয়েছি। তবু তিনি বুঝতে রাজি হননি। তাঁর সাথে কথা বলাও আমার বেয়াদবী মনে করি। তবু যথেষ্ট তর্ক করেছি। মন্ত্রি-তাঁর মুরিদ হয়ে হাদীয়া তুহফা দিয়ে একদম ভূঁতা করে দিয়েছে। উক্ত মন্ত্রি এখন খানকার প্রধান বনে আছে। হুজুরের বিশ্বাস উক্ত মন্ত্রি বহুত বড় আল্লাহ অলা। বর্তমানে হুজুর জিহাদের ওয়াজ করতেছেন তা ঠিক। কিন্তু এর ভিতর জিহাদের সুক্ষ বিরোধিতাও করতে ছেন, এটা তিনি বুঝতেছেন না। এ কাজটা মন্ত্রি নিজেই হুজুরের মাধ্যমে করাচ্ছেন।

মাহমুদা এতে আপনি মোটেই বিচলিত হবেন না। আল্লাহর হুকুম জিহাদ করা। আপনি সে হুকুম পালন করে যান। কারো ফতোয়ার তুয়াক্কা করবেন না। ফতোয়া পক্ষে হোক আর বি পক্ষে। তার ধার ধারবেননা জিহাদ এর ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই মুফতি হয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। এখন কারো কাছে ফতোয়া চাওয়াটা শক্ত গোনাহ মনে করি। কেউ যদি আল্লাহর ফতোয়ার পক্ষে ফতোয়া দেন তা হলে এটা হবে তার নাজাতের কারণ। আর যদি বিপক্ষে দেয় তা হলে এটা হবে স্পষ্ট কুফুরি। কাজেই সংকীর্নমনা পরিহার করে কাজ চালিয়ে যান।

মন্ত্রি সাহেব জিহাদের কাজের জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়েছিল। আমি জানতে পেরে সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

ধন্যবাদ আপনাকে। আর কোন দিন তার নিকট টাকার জন্য যাবেন না। তাঁর কাছে হালাল, হারাম সব টাকা জমা হবে। তাই সে টাকা সন্দেহ যুক্ত টাকা। সন্দেহ যুক্ত জিনিস বর্জন করা হল তাকওয়া।

হেলেনা ভাইজান এব্যপারে আপনি মোটেই আর কিছু বলবেন না। এদেশের সরকার জায়গা দিয়ে আমাদের কে অনেক এহসান করেছেন। আমরা নেমক হারামি করব না। শেষ পর্যন্ত উনাদের ও রাষ্ট্রের উপকার করে যাব। সরকার ভুল বুঝে আমাদের উপর জুলুমও করতে পারেন তবু আমরা সরকারের পক্ষেই কাজ করে যাব। এব্যাপারটা এত তাঁড়া তাড়ি বাদশা ও অন্যান্ন উজির-মন্ত্রিকে বুঝানো যাবে না, তাতে একটু সময় লাগবে। আল্লাহর রহমতে প্রমাণ করেই ছাড়ব ইনশা আপনি এখন দাওয়াতী কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যান। আগামি এক বৎসরের মধ্যেই আমরা কামিয়াব হব।

মাহমুদা ওরে আল্লাহ এক বৎসর ?

হেলেনা আপা গরম গরম কাজ হয়না। মুসলমানরা চায় নগদ একটা কিছু করে নিতে। তার পর একটিও হয় না। আমি বললাম মাহমুদাকে, তোমার কারগুজারী তো কিছুই শোনাওনি? উত্তরে সে বলল, আমি রানী মায়ের সাথে আকার ইংগিতে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু রানীমা তা বুঝবার চেষ্টাও করলেন না, বরং আমাকে বললেন মা তোমরা অসহায় হয়ে আমাদের মুলুকে আসছ। পরম সুখে তোমরা দিন যাপন কর আমি এটাই কামনা করি। আমাদের মুলুক নিয়ে তোমাদের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। তুমি যাদের কথা বলছ, আলম পানাহ্ তাদেরকে ভাল ভাবেই চিনেন। তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে হজম করবেন না। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাবে থাক কোন ফেৎনা করতে যেওনা। তার পর আমি আর কোন কথা সামনে না বেরে চলে আসি।

আমি হেলেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বোন তুমি কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে চাও? উত্তরে সে বলল, উক্ত ইমাম সাহেব গোয়েন্দাদের টার্গেটে এসে গেছে। তিনি যদি জিহাদের কথা বলে থাকেন তাহলে তাকে অবশ্যই গুপনে হত্যা করবে।

ইয়া আল্লাহ তিনি খুব ভাল মানুষ বুজুর্গ মানুষ তাকে যে ভাবেই হোক বাচাতে হবে।

মাহমুদা তিনি গোয়েন্দাদের খপ্পরে পরে জিহাদের সুক্ষতা বিরোধি করে যাচ্ছেন, তাহলে ভাল হল কি ভাবে ?

এটি বিরোধিতা হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। বুঝলে ও বুঝতে চান না। মন্ত্রির বাহ্যিক আচরনে তিনি আকৃষ্ট হয়ে গেছেন। তাকেই যদি হত্যা করে ফেলে তা হলে এর চেয়ে ভাল মানুষ আমরা আর পাব কোথায়? তাঁর কথার একটা গুরুত্ব আছে। কাজেই তাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

হেলেনা অবশ্যই তাকে আমাদের বাচাতে হবে। তা না হয় কাজ উদ্ধার করা যাবে না। আমি আপনাকে খুব দ্রুত আরো কিছু জিনিস শিখিয়ে দেব। আপনি দ্বাররক্ষী ও উজিরে খারেজার সাথে কিছু কিছু সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের পরিকল্পনা জেনে নিন। তাদের কোট নম্বর জেনে নিন। আমি ও তাদের সাথে গোপনে আলাপ আলোচনবা করি। তার পর এর একটা সহজ সমাধান বেরিয়ে আসবে। আপনি প্রধান সিপাহ সালারকে এতটুকু বলে রাখুন, যে, আপনি আপনার অধিনস্ত উমুক সালারের প্রতি একটু দৃষ্টি

রাখুন। তাঁর উপর এধরনের অভিযোগ রয়েছে। তার পিছনে সেনা গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখুন। এত টুকু বললে তিনিও এব্যপারে নজর দারী রাখবেন। এভাবে আমাদের কার্যোদ্ধার করতে হবে। এব্যাপারে আপনি ঘাবড়াবেন না।

হেলেনার পরামর্শে আমি অনেকটা চিন্তামুক্ত হলাম। তার পর হেলেনা আমাকে তাদের অনেক কলা কৌশল শিক্ষা দিল। আমি ১৫ দিন পর্যন্ত এসব কলা কৌশল শিখে আবার নাদির শাহের দরবারে হাজির হলাম তার পর দারোয়ান ও উজিরে খারেজার সাথে বেশ কিছু আলাপ আলোচনা করে তাদের গোপনীয় ষড়যন্ত্র ও উজিরের কোড নম্বর জেনে নিলাম। উজির খুব দৃঢ়তার সাথে খতিব সাহেবের সমালোচনা করে বললেন, এদিকে এক মাত্র খতিব সাহেবই জিহাদের উপর বক্তব্য রেখে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতেছেন। তার বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপ খুব তাড়া তাড়িই নিতে হবে। আমিও এতে সমর্থন করলাম। অতঃপর বাসায় ফিরে এসে হেলেনাকে এসব তথ্য দিয়ে দিলাম। হেলেনা উজিরের সাথে ওয়ারলেছে নিয়মিত যোগা যোগ রক্ষা করে যাচ্ছিল।

চৌদ্দ

খতীব সাহেবের নিকট সামান্য কথা কাটাকাটি ও ২৫ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেয়ার কারনে তিনি খুব ক্ষুদ্ধ হয়ে নাদির শাহের কানে কানে বললেন যে, আপনার আশ্রিত মুজাহিদ কমান্ডার আবদুল্লা বিন মাছরুর আপনার বিরুদ্ধেও ষড় যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। তার ব্যাপারে আপনাকে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। তা না হয় এখানেও জিহাদের আগুন জ্বলে উঠবে।

খতিব সাহেব এক জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব তিনি কোন দিন ফালতু কথা বলেন না। তাঁর মুখ থেকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শোনে খুবই চিন্তিত হলেন ও প্রশ্ন করলেন যে, আপনি তার ব্যপারে কতটুকু কি জানেন তার প্রমাণ পেশ করুন। খতিব সাহেব উত্তরে বললেন, আপনার একান্ত ফরমাবরদার ও আমার প্রধান খলিফা উজিরে খারেজা, প্রাণ দ্বার রক্ষি ও এক জন সালারের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ এনেছেন। তাঁরা ৩ জনই রাশিয়ান চর। আপনি তাদেরকে তাদের যোগ্যতা বলে নিয়োগ দিয়েছেন। আজ ৫/৭ বৎসর যাবত এরা বিশ্বস্ততার সাথে আপনার

প্রত্যেকটি হুকুম তামিল করে আসছে। এখন যদি তাদের উপর এধরনের জঘন্য সন্দেহ করা হয় আর তা তারা জানতে পারেন তা হলে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এব্যপারে আপনাকে আশু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নাদির শাহ বললেন, এমন একটি কথা রানীর মুখেও শোনেছি। এসব ব্যপারে আমি অচিরেই তদন্ত করে দেখব। যদি তার সত্যতা প্রমাণ হয় তা হলে অবশ্যই তাকে কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে।

মুহতারাম আলম পানাহ সেদিন সে আমার হুজরায় গিয়ে প্রায় দুঘন্টা আমার সাথে আলাপ করে ছিল। এর মধ্যে আমি তাকে বলেছিলাম তুমি যে যাদুময়ী বক্তব্য দিতে জান এতে এদেশের হাজার হাজার যুবক তোমার দলে চলে যাবে। বিশেষ করে পাঠান যুবকরা তো এক বাক্যেই জিহাদের জন্য পাগল হয়ে যাবে। তুমি তোমার দেশে জিহাদ কর। এদেশের যুবকদেরকে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দিওনা। তোমার দেশের পালিয়ে আসা যে সব যুবক রয়েছে তাদের নিয়ে যুদ্ধ কর। আর যদি আমার দেশের যুবককে নিতেই হয় তখন প্রথমে তাদের মাতা-পিতার এজাজত আছে কিনা,তা যেনে নাও। যদি মাতা পিতার এজাজত থাকে তা হলে এদর ব্যপারে উজিরে খারেজা এবং আপনার সাথে যোগাযোগ করে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। এও বলেছি যে, দেখ তুমি যদি আমার দেশের যুবকদের ব্যবহার কর আর বলসেবিকরা জানতে পারে তা হলে এশান্তি প্রিয় দেশটির উপর আক্রমণ করে বসবে। তখন তা সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। ছেলেটি আমার একথা শোনে দীর্ঘ ওয়াজ আরম্ভ করে দিল। তার ওয়াজে এটাই প্রমান করতেছিল যে উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তাসকন, সমরকন্দ, ও বুখারার এ ধ্বংশলিলায় ইরান, আফগানিস্তান সহ সমস্ত মুসলিম দেশগুলো দায়ী। কারণ বলসেবিকদের ঠেকাতে আমরা এগিয়ে যাইনি। সে এব্যপারে কুরআন, হাদিসের অনেকগুলো যুক্তি পেশ করেছে। আমার প্রতিটি উত্তর সে আয়াতের দ্বারা দেয়ার চেষ্ঠা করেছে। আমার সামনে সে কুরআন হাদীস পেশ করতে একটুও লজ্জা করলনা।

তা হলে ছেলেটি কি আলেম ?

তার কথা বার্তায় তো সে বড় আলেম হিসাবেই পরিচয় করাতে চাচ্ছে। এমন কি ফকিহ-------------।

সে যেসব আয়াত, হাদীস আর মাসআলা পেশ করেছে তা কি স্বঠিক না তার মনগড়া ?

আমি সেটা বলতে চাচ্ছি না। তার যে বেয়াদবী আনা আচরণ, তার কথা বলছি। কারণ আমার সামনে সে আয়াত পেশ করে করে কথা বলে। আমি কি এসব আয়াত আর হাদীস পাঠ করিনি ?

জনাব আমি জানতে চাচ্ছি সে যে আপনার প্রতিটি কথার উত্তর কুরআন হাদীস দ্বারা দিয়েছে, সে সব আয়াত আর হাদীস স্বঠিক কিনা আর তার তরজমা ও ব্যখ্যা ঠিক কিনা।

কুরআন আর হাদীস তো ঠিকই, ব্যখ্যাও ঠিক।

সব যদি ঠিক থাকে তা হলে আপনার আপত্তি কিসের ?

আপত্তি হল উজিরে খারেজা আপনার অনুগত্য একজন সুনামধন্য ব্যক্তি। আবার তিনি আমারই প্রধান খলিফা। আমার অনুপস্থিতিতে খানকা পরিচালনা কওে, খানকার আমদস্তরখানা তারই অবদান। এবাদত বন্দেগীতে অনেক এগিয়ে আছে। সে জিহাদে ২৫ হাজার টাকাও দিয়েছিল। আমাকেও তিনি প্রচুর হাদিয়া তুহফা দিয়ে থাকেন। লোকটি সে দিন ২৫ হাজার টাকা বের করে আমার সামনে রেখে বলেছিল যে, কোন কাফিরের অপবিত্র টাকা দিয়ে পবিত্র জিহাদ চলতে পারে না। এক জন আল্লাহ ওয়ালাবুজুর্গকে সে কাফির বলতেও একটু দ্বিধা করল না।

তিনি যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এর পিছনে যুক্তি কি ? তার কাছে এমন কিছু প্রমাণ কি আছে ?

তার প্রমাণ খুবই দুর্বল ও ভিত্তিহীন। সে বলেছে কিছুদিন আগে নাকি ৫/৭ জন গোয়েন্দা আপনার রাজ্যে প্রবেশ করে শরনার্থীদের বিরুদ্ধে এমন কি আপনার বিশাল সমাজের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করছিল। তার পর নাকি সবাইকে কতল করে ফেলেছে। এক জন ইউরোপীয়ান খৃষ্টান মেয়েও তাদের সাথে ছিল। সে চতুর মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে তার নিকটই রয়েছে। সে মেয়ে নাকি বলেছে নাদির শাহের দরবারে এতিনজন লোক আমাদের। সে এই মেয়ের কথা নিয়ে এধরনের তৎপরতা চালিয়েছে। চারজন সাক্ষির কম কোন কিছুর ফায়সালা দেয়া হয়না। একজন পুরুষের সমান হল দুজন মহিলা। আর একজন মহিলার কথা নিয়ে সে এধরনের বারা বারি করতেছে। সে যে এত পন্ডিতি জাহের করে, আমি যদি জিজ্ঞাসা

করি ভিন দেশী এক জন খৃষ্টান মেয়ে তোমার নিকট কি করে রাখতেছ ? তা হলে তার জবাব সে কোন আয়াত দিয়ে দিবে ? এহল উক্ত মুজাহিদের কান্ড। আমার সবিনয় দরখাস্ত হল কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করার আগেই তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক, না হয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক।

জনাব সুনিদৃষ্ট প্রমান ছাড়া কোন এক জন লোককে দোষি বলা যায় না। আজকেই আমি তার প্রতি কড়া নজরদারীর ব্যবস্থা করছি। দেখি সে কি প্রমাণ পেশ করে।

আলামপানাহ তার নিকট যুক্তি, তর্ক আর প্রমাণের অভাব নেই সেদিন ও সে চেলেঞ্চ ছুড়ে দিয়েছে যে, আপনি আমার পরামর্শ নিয়ে তাকে চেনার অনুসন্ধান করেন, সে দেশের ও দ্বীনের শত্রু। সে মুসলমান দের দুশমন। সে মুসলমান নয় খৃষ্টান। যে ব্যক্তি মাসে এত হাদিয়া তুহফা দেয় এত এবাদত বন্দেগী করে তার ব্যপারে এমন জঘন্য মন্তব্য শোনতে আমি রজি নই।

হযরত সে যখন বলেছিল অনুসন্ধান করে দেখার জন্য তখন আপনার রাজি হওয়ার দরকার ছিল।

আমি রাজি হতাম আলম পানহা তার বিয়াদপনা কথায় রাজি হইনি। সে বলছিল, আপনি আমার পরামর্শ নিয়ে তাকে চেনার অনুসন্ধান করেন। এখানে আমার কথা হল অনুসন্ধান করার মত এলেম কি আমার নিকট নেই ? তার নিকট থেকে পরামর্শ ধার করে আমাকে অনুসন্ধান করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ গোজার, কোন মুস্তাহাবও তার থেকে ছুটে না এমন ব্যক্তির উপর সন্দেহ করা গোনায়ে কবিরা। এমন দুর্বল ঈমান নিয়ে চলিনা। একটা মানুষ দেখলেই তার ব্যপারে একটি আইডিয়া হয়ে যায়। এ বুজুর্গের ব্যপারে সন্দেহ করে অনুসন্ধান সেই চালাতে পারে যার ঈমান দুর্বল অর্থাৎ দুদুল্যমনা। যে ব্যক্তি মসজিদ মাদ্রাসায়; খানকায় এত দান খয়রাত করে এত এবাদত বন্দেগী করে তার ভাষায় সে মুসলমানই নয়। আমার মাথায় যে পাগড়ী যে জুব্বা হাতের তছবিহ ও লাঠি তারই দেয়া। এটা পড়েই জুমার দিন খুতবা দেই। তাহলে তো কারো নামাযই হবে না।

হযরত আপনি এখন যান আপনার প্রত্যেকটি কথার যাথাযথ মর্যাদা সহকারে বিবেচনা করা হবে। অতঃপর আল্লামা সামসুল হক নকদী

(খতিবে আযম, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কাবুল) সাহেব নাদিরশাহ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান।

গভীর রাত। হেলেনা ঘুমিয়ে আছে পার্শ্বের রুমে। আমি আর মাহমুদা জেগে জেগে আগামী দিনের কর্মসূচী তৈরী করছি। ৪০ জন পাঠান যুবককে ট্রেনিং সেন্টারে অতি গোপনে পাঠানোর ব্যপারে দুজনের মধ্যে মত বিনিময় করে সাব্যস্ত করেছি। তার পর মাহমুদাকে বললাম, প্রিয়তমা তুমি আমার সুখ দুঃখ,আরাম আয়েশের অংশীদার। অংশিদার ভাল-মন্দের। সাথী দুনিয়াও আখেরাতের। আমাদের ভাগ্যকাশে দেখা দিয়েছে কালো মেঘ। ক্রমেই তা ঘন থেকে ঘন হয়ে কালবৈশাখীর রূপ নিচ্ছে। জানিনা আমাদের মধ্যে আবার বিচ্ছেদ ঘটে যায় কিনা। হেলেনার থেকে বেশ কিছু কৌশল না শিখাই রয়ে গেল। সে আইটেমগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। যেমন মুসাফাহার সময় হাতে হাত মিলিয়ে নাকি অনেক আলাপ করা যায়। আবার মুয়ানাকার সময়ও অনেক কিছু বলাযায়। এগুলো শিক্ষার খুবই দরকার ছিল। আমার দ্বারা তো আর শিক্ষা করা সম্ভব নয় তার অর্থ সে একজন বেগানা সুন্দরী যুবতী তার সাথে কোলাকুলি করা সম্পূর্ণ হারাম। আর তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, একার নেই যে তুমি কিভাবে অন্য পুরুষের সাথে কোলাকুলি করবে। আর সে তোমাকে এটা শিক্ষা দিবে না। তোমাকে শিখালে সময় বেশী লাগলেও তোমার থেকে শিখতে পারতাম। এখন আমার ইচ্ছা হল অতি তাড়াতাড়ি আমার স্থলাভিসিক্ত কমান্ডার মাওলানা আঃ সাত্তার বলখীকে ডেকে এনে হেলেনার সাথে বিবাহ দিয়ে দেই। তাহলে সে তার কাছ থেকে এ আইটেমগুলো শিখে নেবে। তার পর উরুতে কি লিখা আছে তাও দেখতে পারবে। তাছাড়া আমার সবচেয়ে বড় উপকার হল আমি গোনাহ থেকে বাঁচতে পারলাম। দ্বীনের খাতিরে তার নিকট থেকে তাদের সংকেতগুলো জানতে হচ্ছে। যতই উপকারী হোক না কেন গোনাহ থেকে তো খালি নয়। তাকে বিয়ে দিতে পারলে আমার মনও পবিত্র হবে আর জিহাদের কাজেও বরকত হবে।

প্রিয়তম আপনার চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত পবিত্র। এজামানায় এধরণের পুরুষের সংখ্যা অতি নগন্য। আপনাকে কোন দিন দেখিনি তাকে নিয়ে একাকি আলাপ করেছেন। একাকি আলাপের জন্য আমি অনেক সুযোগও করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তখন আপনি আমাকে ডেকে কাছে নিয়ে এসেছেন। আমি আসতে না চাইলেও আসার জন্য বাধ্য করেছেন। এ সব আপনার পবিত্র আত্বার পবিত্রতারই বহি প্রকাশ। স্বামী গো আজ আমি আপনার নিকট কয়েকটি দরখাস্ত পেশ করব আশাকরি অত্যন্ত বিনয়ের

সাথে কথাগুলোর বিবেচনা করবেন। আমি আপনাকে আমার হৃদয় মন উজার করে এজন্যই দিয়েছি, আপনি একজন মুজাহিদ। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তিই যদি আমার উদ্দেশ্য থাকত তবে অনেক ধনি পরিবারের কোন ছেলেকে বিয়ে করতাম। এধরনের অনেক ছেলেরাই প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গিয়েছে। শাহাদাতের প্রবল তামান্না নিয়েই আপনাকে খোঁজে বের করেছি। ঠিক আমার মতই একজন সত্যের সন্ধানী, ও দ্বীনের অনুরাগী নও মুসলিমা হেলেনা। ইদানিং সে আপনার প্রেমে আটকে গিয়েছে। আপনার সঙ্গিনী হয়ে আপনার সাথে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার তামান্না ব্যক্ত করেছে। আপনি যদি তাকে আশ্রয় না দেন, স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ না করেন তা হলে সে আর কারো কাছে তার এ অর্পুব সুন্দর দেহটাকে দিবে না। এটা তার অঙ্গিকার। সে আজ কদিন যাবতই আমার নিকট তার হৃদয়ের লুকিয়ে রাখা কথাগুলো প্রকাশ করতেছে। আমারও অন্তরে এই আশা তার বিয়ে আপনার সাথে হোক,আর কন্যাকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে দেই, নিজহাতে দুজনের বাসর ঘর সাজিয়ে বাসর রজনীর আনন্দের ব্যবস্থা করে দেই। আমার প্রস্তাবটা রাখবেন কি প্রিয়তম ?

মুজাহিদ অর্থ্যই হল যাযাবর। নেই বাড়ী, নেই ঘর। কেউ দেয়না আশ্রয়। সবাই করে অবজ্ঞা। আমার দ্বারা কোন মেয়ে দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি থেকে বঞ্চিত হোক, তা আমি চাই না। তুমি হলে আস্তা বলদ,তানা হলে আমার মত অপদার্থকে বিয়ে করতে পাগল হতে না।

বলদ না-----------বিপরীত। আপনার ওয়াজ রেখে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমার কাছে তোমায় দেবার মতও কোন টাকা নেই। আর জেওয়র পাতিও কিনব কি দিয়ে। সব টাকা তো শরনার্থী দের ও গোলাবারুদ কিনতে খরচ করে ফেলেছি।

টাকা আর গয়না পত্রের চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। এসব চিন্তা আমার। আপনি শুধু বিয়ে করবেন।

আচ্ছা তোমার কথাই কবুল। ব্যবস্থা কর।

পর দিন বিয়ের হাট বাজারের টাকা দিল। নিজ হাতে গোসল করায়ে আমাদের সাজাল। আমি মহল্লার ইমাম, শহরের কাজী ও আশপাশের কিছু মুসল্লীকে দাওয়াত করে বাসায় নিয়ে এলাম। তার পর সকলের সামনেই আমার বিবাহ কাজ সমাধা হল। হাসপাতালের বড় ডাক্তার তিনিও উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের পর ডাক্তার সাহেব ৫০ হাজার টাকা হাদীয়া দিয়ে গেলেন। মাহমুদার সমস্ত গয়নাপত্র খুলে হেলেনাকে দিয়ে দিল। তাকে এ

ব্যপারে প্রশ্ন করলে সে উত্তরে বলল, আমি শহীদ হয়ে যাব আমার জেওরের দরকার কি ? বেহেস্তের আমার জেওর তৈরী হচ্ছে। তার শহীদের আকাঙ্খা দেখে আমার চোখে নতুন করে বান ডাকল।

পনের

পর দিন ৪০ জন পাঠান যুবক নিয়ে চলে গেলাম ট্রেনিং সেন্টারে। যাওয়ার পথে মাহমুদা ও হেলেনাকে বলে গেলাম যে, যদি কেউ আমাকে খোজতে আসে তাহলে বলবে তিনি এক সপ্তাহের জন্য বাইরে চলেগেছেন। আর তোমরা সর্ব দিক দিয়েই সতর্ক থাকবে এবং একে অপরের কাছ থেকে এলেম হাছেল করবে অর্থাৎ মাহমুদার কাছ থেকে হেলেনা শিখবে সুরা কেরাত ও শরীয়তের মাসআলা, মাসায়েল আর হেলেনার কাছথেকে মাহমুদা গোয়েন্দা কলা কৌশল।

৪০ জন পাঠানী সাথী পেয়ে আমাদের উস্তাদে মোহতারাম কমান্ডার সাহেব খুবই খুশী হলেন। তারপর কাবুলের হাল অবস্থা, সেন্টারের বিষয় ও শরনার্থী শিবিরের হাল হাকিকত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। এর মধ্যে আমি কাবুলের বিষয়টা খুঁব জোরে সুরে আলাপ করলাম। কমান্ডার সাহেব বিস্তারিত শোনে একশ ভাগ একিন করে নিলেন এবং বললেন ,আপনার কথার সত্যতা মিলে। সেনাবাহিনীর সালার তামিম বুলদানী তাকে আমি অনেক বারই অন্যরকম দেখেছি। তাছাড়া উজিরে খারেজা ও দ্বার রক্ষী সম্পর্কে আমি অত কিছু জানি না। কমান্ডার এসব বিষয়ে গভীর চিন্তা করে বললেন, হেলেনা যদি এসব বিষয়ে মনোযোগী হন এবং কাজ চালিয়ে যান, তাহলে সত্য উদঘাটন হওয়া কোন ব্যপারই নয়। তবে সেখানে আপনার আশ-পার্শ্বে মজবুত কিছু কমান্ডোজের দরকার আছে। আমি প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাজ থেকে ১০ জন যুবক বাছাই করে তাদেরকে বিশেষ কোর্স করিয়ে দিচ্ছি। এতে এক মাস সময় লাগতে পারে। এরা কোর্স শেষ না করা পর্যন্ত আপনি বড় ধরনের কোন ঝুকির কাজে যাবেন না। আমি কমান্ডার সাহেবকে আশ্বাস দিয়ে বললাম তা অবশ্যই। আপনি যথা শিঘ্র তাদেরকে তৈরী করুন।

এক সপ্তাহ প্রশিক্ষণ সেন্টারে কাটিয়ে চলে গেলাম শরনার্থী শিবিরে। সেখানে গিয়ে সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখলাম মোটা মোটি শান্ত পরিবেশেই আছে এবং একতা বদ্ধ আছে। তারপর মাওলানা আঃ সাত্তার নজদী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম অসহায় বোনদের কি খবর? তাদেরকে

উদ্ধার করে আনা হয়েছে কি না? -উত্তরে তিনি বললেন, শহীদ ইবনে উমরের বোন কানিযা এবং তার সঙ্গিনীদেরকে উদ্ধার করে আনার জন্য কমান্ডার খোযায়েভ ও আলায়েব কে রায়ডনেভোতে পাঠিয়ে ছিলাম। তারা যখন তাদেরকে নিয়ে আসতেছিলেন, তখন কমিউনিষ্টরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পিছু ধাওয়া করে। এক দিনের পথ এগিয়ে আসার পর এক পাহাড় উপত্যকায় উভয় পক্ষ সামনা সামনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এদিকে ছিল অস্ত্রধারী দুজন মুজাহিদ আর ৫/৬ জন অবলা নারী। আর অপর পক্ষে ছিল ১২ জন অস্ত্রধারী। যুদ্ধের প্রথম দিকেই মহিলারা সবাই শাহাদাত বরণ করে। আর দুশমনরা নিহত হয় ৭ জন এক পর্যায়ে যুদ্ধ একটু স্থিমিত হয়ে আসে। দুজন মুজাহিদ বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পর দুশমনের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতির সন্ধির প্রস্তাব আসে। মুজাহিদ খোযায়েভ তা মেনে নেন। পরামর্শ হল দু পক্ষের দু'কমান্ডার একত্রে বসে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করবেন। স্থান ও নির্বাচন করা হল। উভয় দল থেকে একটু দুরে পাহাড়ের টিলায় বসে তারা আলাপ আলোচনা করবেন। আর কারো সাথে কোন অস্ত্র থাকবে না। কথা মত খোযায়েভ অস্ত্র রেখে টিলায় আরোহন করলেন। অপর দিকে দুশমনদের সালার গোপনে অস্ত্র নিয়ে টিলায় আরোহন করেই গুলীকরে তাঁকে শহীদ করে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দুহাতে দুটি অস্ত্র নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করতে করতে সামনে এগিয়ে গেলেন। মূহুর্তের মধ্যে ৪ জন দুশমন ভুমি তলে লুটিয়ে পরল। এদিকে দুশমন কমান্ডার প্রাণ ভয়েপাহাড়ের গা বেয়ে টিলাথেকে অন্য পথে গা ঢাকা দিল। তার পর আলায়েভ ঘোড়া নিয়ে মার্কাজে ফিরে আসলেন।

নজদী সাহেবের কারগুজারী শোনে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা ছাড়া আর কোন পথ পেলাম না। তার পর নতুন কোন শরনার্থী আসছে কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলেন উভয় সীমান্তে এখন নিরাপত্তা জোড়দার করেছে। তাই কোন শরনার্থীরা এদিকে আসতে পারছেন না। বাঁকি ৫ জায়গার কোন সংবাদ নিতে পারছিনা।

অতঃপর শুধু জিম্মাদার সাথীদেরকে নিয়ে বসলাম এবং প্রথমেই হেলেনার বিবাহের কথা শোনালাম। সবাই এক বাক্যে আলহামদুল্লিাহ বলে শোকর আদায় করলেন এবং অলিমা খাওয়ার আবদার জানালেন। আমি ২ হাজার টাকা দিয়ে বললাম, এ টাকা দিয়ে খেজুর খরিদ করে প্রতিটি খিমায় খিমায় পাঠিয়ে দিয়ে বলবেন এটা হেলেনার বিয়ের অলিমা। তার পর

কাবুলের হালাত বর্ণনা করে বললাম, আমার যতটুকু মনে হয় এখানে আমরা বেশি দিন টিকতে পারব না। হয়ত অচিরেই আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। কাজেই আমাদের দেশের ভিতর কোন একটা স্থান খুব জরুরী ভিত্তিতে তালাশ করে নির্বাচন করা দরকার। আমরা প্রয়োজনে যেন সেখানে গিয়ে উঠতে পারি। স্থায়ী কোন ক্যাম্প আপাদত দরকার নেই। কারণ আমরা গেরিলা হামলা করব। তার পর যদি আমাদের শক্তি সামর্থে কুলায় তা হলে স্থায়ী ক্যাম্পের চিন্তা করব। আপনি দু সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা দু এক দিনের মধ্যেই জায়গার সন্ধানে প্রেরণ করুন।

এমন কি সমস্যা হল যে, আমাদেরকে নাদিরশাহ এখান থেকে তাড়িয়ে দিবেন ? আমরাতো তাঁর সাম্রাজ্যে কোন কিছু করতেছি না। যতটুকু করেছি এর মধ্যে আমাদের সার্থের চেয়ে তাঁর দেশের সার্থই ছিল বেশী। কেন ? তিনি কি আপনাকে এমন কোন ইংগীত দিয়েছেন ।

তিনি সরাসরি কিছুই বলেননি বরং আমাকে সব ধরনের সহ যোগীতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। এমনকি অসহায় শরনার্থীদের ব্যপারে আমি পরামর্শ দিয়েছি, উত্তরাঞ্চলের অনাবাদী ভূমি গুলো শরানার্থীদের নামে বন্দবোস্ত দিয়ে তাদেরকে বাড়ী ঘর উঠায়ে স্থায়ীভাবে থাকার ও চাষাবাদ করার সুব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে। অর্থাৎ আফগানিস্তানের নাগরীক করে নেয়ার জন্যে। তিনি আমার এপ্রস্তাব মেনে নিয়েছেন এবং বাড়ী ঘর তৈরীর জন্যে আর্থিক সাহায্য করারও ওয়াদা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এবিষয়ে তিনি বাধা প্রাপ্ত হবেন। কারণ তিনি মন্ত্রী বর্গের পরামর্শকে অনেক গুরুত্ব দেন আবার এর চেয়ে বেশী গুরুত্বদেন খতিব সাহেবের পরা মর্শকে। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলে তারা সে পরামর্শ দিবেন না।

পরামর্শ না দেয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে তা উদঘাটন করতে পেরেছেন কি ?

কারণ তো সুস্পষ্ট। উজিরে খারেজা, হল তাঁর দক্ষিণ হস্ত। আল্লামা সামসুল হক নজদীর প্রধান খলিফা হলেন উজিরে খারেজা। এদুজনই আমাদের বিপক্ষে মত দিবেন।

কেন, খতিব সাহেব না জিহাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন। তাহলে এমন টি করবেন কেন ?

উজিরে খারেজা আসলে মুসলমান নয়, সে রাশিয়ার এক উচ্চ পর্য্যায়ের গোয়েন্দা। সে অনেক কৌশলে খতিব সাহেবকে হাত করে

নিয়েছে। উজির খুব সুক্ষভাবে খতিব সাহেব দ্বারা জিহাদের জড় কাটাচ্ছে। তা তিনি মোটেই বুঝতে পারছেন না।

এব্যপারে তাঁকে অবগত করে দিলেই তো হয়।

ওরে বাপরে যতই বুঝানো হোক তা তিনি বিশ্বাস করতেই রাজি নয়। তাঁর ধারণা হল উজিরে খারেজা তাঁর মুরিদ ও খলিফা। এবাদত বন্দিগীতে খুব পাকা। এলোক কিছুতেই গোয়েন্দা হতে পারেনা। অর্থাৎ হাদীয়া খেয়ে হুজুরের কলব নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কোন কথাই মানতে রাজি নন।

হ্যাঁ, অনেক সময় রাজা বাদশাগণও হাওয়ারীনদের দ্বারায় প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন। আল্লাহর ফায়সালাই উত্তম ফায়সালা। আমরা এর উপরই রাজি থাকব। আমি এদিকের কাজগুলো দু একদিনের মধ্যে সামলিয়ে নিয়ে জায়গা তালাশের জন্য লোক পাঠিয়ে দেব। এ ব্যপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ধন্যবাদ আপনাকে। আমাকে দুজন সাথী দিলে ঐ ৫টি শরনার্থী গুলো ঘুরে দেখে আসব । সে গুলোর প্রতি যদি নজর না রাখা হয় তবে আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তা অবশ্য। আপনি আলায়েভ ও ফাগুদায়েভ ছাড়া যে দুজনকে পছন্দ করেন, সে দুজন নিয়েযান। এদুজনকে জায়গা তালাশে পাঠাব।

তার পর আমি রাশেদ ও ছালেককে আমার সাথে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করলাম। এমন সময় মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী বললেন, জনাব আমির সাহেব আমি আপনার পরামর্শ ছাড়াই বৃহৎ ফায়দার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি কাজ আরম্ভ করেছি। আশা করি শোনে খুশী হবেন। আর যদি আপনার সমর্থন না থাকে তবে এখনই বন্ধ করে দেব। আমি তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, শরনার্থী শিবির থেকে যুবকরা প্রশিক্ষণে যাওয়ার পরও ৫০/৬০ জন যুবক রয়েগেছে। তারা খানিকটা ভয় আর খানিকটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগছিল। তাই তারা প্রশিক্ষণে যেতে পারেনি। সে সব যুবকদের নিয়ে আমি প্রশিক্ষণ চালু করেছি। এরা সবাই শতস্ফুর্তভাবে প্রশিক্ষন চালিয়ে যাচ্ছে। সাহস বল বাড়তেছে। আমার মনে হয় আমরা যদি তাদের পিছনে ঠিক মত শ্রমদিতে পারি তা হলে সিংহ ভাগ ছেলেকে আমরা রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিতে পারব, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বলখীর কথা শোনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম এবং বললম, ভাইয়া তোমাকে ধন্যবাদ আল্লাহ তোমাকে এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে সুভাগ্যশালীদের দলভুক্ত করুন। একাজটা তো ছিল আমার। আমি তা করতে পারিনি আল্লাহ তোমার দ্বারা এ খেদমতটি নিয়েছের। তিনি আরো বলেন, এখন রাতের পাহারায় তাদেরকেই ব্যবহার করছি। তারা খুব আনন্দ চিত্তে তা পালন করছে। এতেও আমি আরো বেশী খুশী হলাম।

৫ দিন এখানে অবস্থান করে রাশেদ ও ছালেককে সহ তিনটি অশ্ব নিয়ে ৫ টি শরনার্থী এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে গেলাম। ছালেক ছিল আমাদের রাহাবর। সে পাহাড়ের বাঁকে আমাদের নিয়ে চলল। চলতে চলতে আমাদের অশ্ব ক্লান্ত হয়ে গেল। ক্ষুদা-পিপাসায় কাঁতর হয়ে কেবলই চলার গতী স্থিমিত হয়ে আসছিল। আমরা একটি ঝর্ণার দারে যাত্রা বিরতি করে অশ্ব গুলোকে জিন মুক্তকরে দিলাম। অশ্ব ঘুরে-ফিরে লতা-পাতা ও কাচা ঘাস খেতে লাগল। আমরাও কিছু আহারাদী খেয়ে নামায আদায় করে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। সে সময়টা ছিল বিকাল বেলা। কিছুক্ষণ পরেই সূর্যটা রক্তিম আভা ছড়িয়ে অস্তপারে হারিয়ে যাবে। তামসায় ভরে যাবে দশ দিক। পথ চলা হবে অসম্ভব। নিকটে কোন বস্তি আছে কি না তাজানতে চাইলে রাহাবর কোন উত্তর দিতে পারলানা। যদিও কোন বন্য প্রাণীর ভয় নেই কিন্তু দুপায়া প্রাণীর ভয়থেকে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আমরা মাগরীবের নামায আদায় করে আরো একটু এগিয়ে রাত্র যাপনের চিন্তা করে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে কখন যে আমরী সীমান্ত পার হয়ে তাজিকিস্তানের সীমান্ত চৌকিতে এসে পরলাম তা কেউ বুঝতেও পারিনি। সীমান্ত রক্ষীরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলল। তারা টর্চের সাহায্যে আমাদেরকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখে মুজাহিদ মনে করে বার বার অস্ত্র ফেলে আত্বসমর্পণ করতে বলল। আমরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা নিরব হয়ে গেল। তারা কি সশস্ত্র না নিরস্ত্র তা অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া এরা সাধারণ মানুষ না সরকারী ফৌজ, না বন্যদস্যু তাও বুঝতে পারিনি। কোন কিছু না জেনে ফায়ার করা তো ঠিক হবে না। এতক্ষনে এরা আমাদের একদম নিকটে এসে গেছে। কোন পক্ষ থেকে এতক্ষণ কোন ফায়ার হয়নি। হঠাৎ তাদের ফায়ারের বাঁশি বেজে উঠল। আমাদের অশ্ব গুলো লুটিয়ে পরল। এরা কে কোথায় পজিশন নিয়েছে তা না জানার কারনে গুলি ছুড়া থেকে বিরত রইলাম। কারণ অযথা একটি গুলি খরচ করা আমাদের জন্য ঠিক নয়।

শোয়ে শোয়ে বাঁচার পথ খোঁজতে ছিলাম এমন সময় হঠাৎ মনে পরল হেলেনার শেখানো কতগুলো সংকেত। কোন অবস্থায় কি ধরনের সংকেত দিতে হয় আমাকে শিখিয়ে ছিল। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে উচ্চ কণ্ঠে সংকেত দিয়ে দিলাম। কিন্তু তার কোন উত্তর পেলাম না। তৃতীয়বার সংকেত উচ্চারন করার সাথে সাথে এক বৃক্ষের আড়াল থেকে এক জন সৈন্য আমার উত্তর শোনিয়ে দিল। আমি আবার অন্য একটি সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করলে আবার তার জবাব দিল। এবার রাশেদ ও ছালেককে বললাম, দোস্ত এখন আর ভয় নেই। চলো আমার সাথে। তার পর গিয়ে উঠলাম তাদের ছাউনীতে। সবাই এগিয়ে এসে করমর্দন করতে লাগল। এক জন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, আহা আপনারা যদি আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা হত। আমরাতো আপনাদের সাওয়ারী হত্যা করে ফেলেছি। উত্তরে আমি বললাম, আপনাদের জন্য এটা অন্যায় হয়নি। কারণ আপনারা তো মনে করেছেন আমরা মুজাহিদ তাই গুলি ছুড়েছেন। আমরা জানতাম হয়ত নিকটেই সীমান্ত চৌকি রয়েছে, এটা জেনে কি করে গুলি চালাই। যেহেতু রাত্রের কারনে কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা তাই ইতস্ত করে একটু বিলম্বে সংকেত দিয়েছি। তার পর ওরাই আমাদের খানা পিনা ও থাকার ব্যবস্থা করে দিল। তাদের নিকট আজগুবি আজগুবি অনেক কথাই বললাম। সকালে এরাই আমাদের সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিল। আমরা তাদের নিকট থেকে আরো কিছু গোলা বারংরুদ ও ভূমি মাইন নিয়ে চলে এলাম। ওরা আমাদেরকে কিছুদুর এগিয়ে দিয়ে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি দুজনকে একটি স্থানে বসিয়ে রেখে একটি মাইন নিয়ে খুব সতর্ক অবস্থায় চলে গেলাম তাদের ক্যাম্পের নিকট। সেখানে গিয়ে চার দিক লক্ষ্য করে দেখলাম কোথায় মাইনটি পুঁতা যায়। অনেক চিন্তা ফিকির করে দেখলাম একটু দুরে এটি বৃক্ষের নিচে মাচা পাতা রয়েছে বুঝলাম এখানে নিশ্চয় এরা যাতায়ত করে। তাই একটি ঝর্ণায় যাওয়ার পথে আর একটি মাচায় যাওয়ার পথে দুটি মাইনপুতে রেখে চলে এলাম।

তার পর ৫টি শরনার্থী শিবির ঘুরে ফিরে ৩জন আংটি ধারী গোয়েন্দার সাথে সাক্ষাত হল। আমি আংটি দেখিয়ে কিছু আলাপ করলাম তার পর ৪/৫ দিন পরে ফিরে আসার পথে তাদেরকে সাথে নিয়ে আসি। এবং এক নির্জন স্থানে এনে ব্রাশ ফায়ারে জাহান্নামে প্রেরণ করলাম। তার পর আংটি

৩টি খুলে পকেটে ভরে নিলাম। দুদিন সফর করে প্রথম শিবিরে চলে এলাম তার পর তাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে সুজা কাবুলে চলে এলাম, এতে সময় পার হয়ে গেল প্রায় ৪৫ দিন।

ষোল

কাবুলে পৌছে জানাতে পারলাম, নাদিরশাহ তাঁর মন্ত্রি পরিষদ নিয়ে মিটিংএ বসে বললেন, সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়, ১৯১৭ ঈসায়ী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কমিউনিষ্টরা তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাসকন্দ, সমরকন্দ, বুখারা সহ বিশাল এলাকা জুড়ে চালাচ্ছে হত্যা যজ্ঞ। হাজার হাজার আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখসহ অগনিত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা কর চলছে। এমন কি অন্য সব ধর্মের লোকেরাও তাদের নগ্ন থাবা থেকে রেহাই পায়নি। হাজার হাজার বাড়ি ঘর পুরিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। দোকান ভাং-চুর আর লুট-তরাজ সেখানকার নিত্য দিনের ঘটনা। হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা আর খানকাকে তারা নাট্যশালায় রূপান্তরিত করেছে। আবার অনেক মসজিদ মাদ্রাসা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মাবোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। ইদানিং শোনেছি ওরা যৌন চাহিদা পুরণ কেন্দ্র খুলে মুসলিম সুন্দরী যুবতী মেয়েদেরকে জোরপুর্বক সেখানে ডুকানো হচ্ছে। কমিউনিষ্টরা এত দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পিছনে কারণ হল, হযরত উলামায়ে কেরামের ফতোয়া, তাদের ভুল সিদ্ধান্ত এবং জিহাদ থেকে নিজে পিছিয়ে থাকা ও অন্যদেরকে পিছিয়ে রাখা এসব জুলুম, অত্যাচার আর নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য নিজের ইজ্জত ও জানের হেফাজতের জন্য শত শত মুসলমান মাসুম বাচ্ছা, যুবতী কন্যা, বৃদ্ধ মাতা-পিতা নিয়ে আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এরা খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছে। এরা যে কোন সময় দেশে ফিরে যেতে পারবে তা কোন নিশ্চয়তা নেই। আর আমিও যদি এদেরকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করি তা হলে অনেকেই আত্নহত্যার পথ বেছে নিবে। আর যদি কিছু সংখ্যক লোক জন্মভুমিতে ফিরে যায় তাহলে বলসেবিকরা মেরে ফেলবে।

এসব দিক বিবেচনা করে আমি চাচ্ছি এসব দেশ ত্যাগী অসাহায় মানুষদেরকে উত্তরাঞ্চলের অনাবাদী ভূমি তাদের নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

করে দিলে, তারা এদেশের নাগরীক হিসাবে এদেশের আইন কানুন মেনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করুক। এতে আমাদের জন শক্তি বৃদ্ধি হবে। রাষ্ট্রীয় আর্থিক চাপ কমে আসবে অর্থাৎ তারা নিজেরা চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করে চলবে। অনাবাদী জমি আবাদে এসে যাবে। এব্যাপারে আপনাদের অভিমত জানতে চাই। আপনারা খোলামনে আমাকে পরামর্শ দিবেন।

নাদির শাহ প্রস্তাব আকারে বিষয়গুলো উপস্থাপন করে চুপচাপ বসে রইলেন। মন্ত্রিরা একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ী করছেন। একটু পর উজিরে দাখেলা অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বললেন, মাননীয় শান্তি প্রিয় বিশাল আফগান সাম্রাজ্যের অধিপতি ও মন্ত্রী মহোদয় ! অসহায়ের সহায়,নিরাশ্রয়ে আশ্রয় স্থল, মুসলমানদের গৌরব ও রাহবর আলম পানাহ, আমাদের সম্মুখে যে প্রস্তাব পেশ করেছেন এটা আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারাকবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে আলম পানাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বলতে চাই, উত্তরাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড় আর পাহাড়। সেসব পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে অসংখ্য ঝর্ণাধারা। সে অঞ্চলের জমি অত্যন্ত উর্বর। চাষাবাদ না করার কারনে সে সব ভুমি বন জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে। অসহায় মানুষদের পার্শ্বে দাড়ানো আমাদের উপর এমনিতেই ফরয। আমরা যদি তাদেরকে সে সব জমি চাষাবাদের ব্যবস্থা করে দেই তা হলে দেশে কোন খাদ্য ঘাটতি থাকবে না। সে অঞ্চলটা ফলে ফুলে শষ্য শ্যামলে ভরে উঠবে। তাই আমি আমার দপ্তর থেকে চাষাবাদের জন্য এক কোটি টাকা আলম পানাহকে অনুদান দেব ইনশাআল্লাহ। ভূমি ও কৃষিমন্ত্রি দাঁড়িয়ে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রাখেন এবং দুজনে আরো দু'কোটি টাকা দেয়ার অঙ্গিকার করেন। এবং অতি তাড়া তাড়ি এ প্রকল্প বাস্ত বায়নের জন্য জোড় তাকিদ করেন। অতঃপর পরাষ্ট্রমন্ত্রি দাঁড়িয়ে বলেন (সে সময় পরাষ্ট্র মন্ত্রীর মাথায় বাবরী ও পাগড়ী, গায়ে লম্বা জুব্বা, পরনে সেলোয়ার, এক হাতে লাঠি আর অপর হাতে তাছবিহ সুভা পাচ্ছিল) বিশাল আফগান সাম্রাজ্যের আদেল-ইনসাফগার শাহান শাহ্ ও মন্ত্রি পরিষদ। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলতে চাই, আজ আপনারা খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন তবে আলোচনাগুলো সবাই একই

সাইটে করেছেন। সফল আলোচক ঐ ব্যক্তি যে উভয় দিক লক্ষ্য করে উভয় দিকের আলোচনা করেন। আপনাদের চিন্তা চেতনার সাথে আমি সব বিষয়ে এক মত নই। আর একমত হওয়া জরুরীও নয়।

আমি আমার একান্ত পুজনীয় ও শ্রদ্ধাভাজন শাহান শাহকে খেতাব করে বলতে চাই, আফগানিস্থানের সাথে ভারত বর্ষের ছোট বড় অনেক রাজা-মহারাজার রয়েছে ভালবাসা। তাছাড়া, রাশিয়ার জারনিকুলাই লেনিন, ষ্টালিনসহ যতবড় বড় জগত বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা আছেন সকলেরই রয়েছে সুসম্পর্ক এদিকে দুমানবে, কিরগিজিয়া,আলমাআতা, তাসকন্দ,আসখাবাদ তেহরান, তুর্কে মেনিস্তান, আজারবাইজান, আঞ্চারা, সিরিয়া সহ মধ্য প্রাচ্যের প্রতিটি দেশের সাথে রয়েছে আফগানের বন্ধু প্রতিম আচরণ। আমি উজিরে খারেজা (পরাষ্ট্রমন্ত্রী) হিসাবে সে সব দেশে বহুবার গিয়েছি এবং সর্ম্পক কায়েম করেছি। শরনার্থী সমস্যা এটা স্থায়ি বা জটিল কোন সমস্যা নায়। আজ তারা আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে হয়ত কাল তারা ফিরে যাবে। যে দেশের সিংহ ভাগ মানুষ এবং সিহংভাগ আলেম কমিউনিজম মেনে নিয়েছে সেখানে সামান্য কজন বিদ্রোহ করে ঠিকতে পরবে না। সেসব দেশে নির্যাতন হচ্ছে তা আমি জানি, দেখতে হবে নির্যাতন কোথায় হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। যেসব এলাকার মুসলমানরা মুজাহিদদের উস্কানিতে বিদ্রোহি হয়েছে। সেসব এলাকায় বিদ্রোহ দমনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে জুলুমটা এতটুকু না করে একটু কম করলেও পারত। মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংসের যে কথা উঠেছে তা হল, মুজাহিদরা মসজিদ মাদ্রাসা থেকে আক্রমণ করে এবং সেখানে আশ্রয় নেয়। সে হিসাবে তাদের দমন করতে গিয়ে কিছু কিছু মসজিদ মাদ্রাসার উপর আক্রমণ করেছে। ইসলামের উপর বিদ্রুপ ভাব নিয়ে এমনটি করেছে তা নয়। যারা কমিউনিজম মেনে নিয়েছে তাদের উপর অত্যাচার করেছে এমনটি কেউ বলতে পারবে না। আমার কথা হল তোমরা সংখ্যালুঘু হিসাবে তো বিদ্রোহ না করে নিরব থাকতে পারতা তা না করে জিহাদ ঘোষণা দিয়ে বৃহৎ শত্রুর সাথে ঝাঁপিয়ে পরা আত্মহত্যারই সামিল।

মাননীয় শাহান শাহ পরাজিত শক্তিকে আশ্রয় দিয়ে কেউ কোন দিন সুনাম অর্জন করতে পারেনি। বদনামই হয়। কাজেই আপনার জন্য এটা সমীচীন মনে করি না যে, এদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ দিন। একদিকে এরা পরাজিত, অপর দিকে এরা উশৃংখল। এরা যখন তাদের দেশে সুযোগ সুবিধা দেখবে তখন তাদের ভিটে-মাটিতে ফিরে যাবে। আর যদি তা না হয় তবে এখানে তারা আস্তে আস্তে শক্তি অর্জন করে এক সময় আফগান শাসন র্কতার সাথে বিদ্রোহ করবে। এমন কি স্বাধীনতাও দাবি করে বসবে। কাবুল থেকে উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ফলে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। তখন বিশাল একটি এলাকা আফগানিস্তানের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তখন সে রাজ্যটি হয়ে আমাদের জন্য গোধের উপর বিষ ফোড়ার মত।

মাননীয় শাহানশাহ আমি পবিত্র হাউসের দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলছি। আপনারা এবিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে শোনবেন। আমি গোপন সুত্রে সংবাদ পেয়েছি বলসেবিকরা ৫/৬টি দেশ দখল করেও তাদের দেশ দখলের তৃষ্ণা মিটতেছেনা। তাই বড় বড় নেতৃবর্গ বিগত ৬ মাস আগে মস্কোতে বসে এক মিটিং করেছে। উক্ত মিটিংএ আলোচকরা আলোচনা করেছেন যে, আফগানিস্তান একটি শক্তিশালী মুসলিম দেশ। সে দেশটি কব্জা করা অত সহজ নয়। দেশটি আমাদের বলয়ে আনতে হলে শত বৎসরের প্রোগ্রাম আমাদের হাতে নিতে হবে। তা হলে দেশটির মেরুদণ্ড একদম কুঁজু হয়ে যাবে। তার পর সামান্য একটু ধাক্কা দিলেই দেশটি আমাদের বলয়ে এসে যাবে। তার পর পুর্বে থাইল্যান্ড আর পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। সে ছুরত তাঁরা এভাবে বর্ননা করেছেন

আফগানিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র। সেখানের শাসনকর্তা অত্যন্ত দয়ালু ও বিনয়ী। আফগানিস্তানের উত্তরঞ্চল,যেমন পানশীর থেকে নিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল জুরে পাহাড় আর পাহাড়। আমরা যদি এখন থেকে চার-পাচঁ হাজার পরিবার সেসব অনাবাদী ভূমিতে পাঠিয়ে দেই, আর তারা সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করে বলে যে, বলসেবিকরা আমাদেরকে ভিটা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন সে দেশের জনগণ

ও সরকার তাদেরকে আশ্রয় দেবে। দু-চার বৎসর সেখানে থাকার পর নাগরীক হওয়ার সুভাগ্য অর্জন করবে। আমরা এদিক থেকে সু-কৌশলে অস্ত্র-গোলাবারুদ দিয়ে তাদের হাত মজবুত করব। তার পর আমাদের দেশের সৈন্যদরেকে পাঠিয়ে তাদেরকে সামরীক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলব। তার পর আমরা পুরা উত্তর এলাকা দখল করে কাবুলে হানা দিব। এভাবে আফগানিস্তান দখল করে নিব। আমার কথাগুলো আমি এমনিতেই বলিনি। আমার কাছে কিছু তথ্য রয়েছে,তা ছাড়া আমার পীর ও মুর্শেদ অলীকুল শিরোমনি, আশেকে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী। কুতুবে যামানী, ফয়জে রুহানী, আলেমে বাতেনী,হালে জামালী ও জালালী, রুহে জিকরুল্লাহ, ছায়েদে আহলুল্লাহ রঈছুল সালেহীন ও সালেকীন, মারেফাত জগতের ভাস্কর হাদীয়ে রাহবর,আখিয়াবে আসগর আল্লামা সামসুল হক নজদী দামাত বারকাতুহুম অফয়োজুহুম এর নিকট দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তিনিও তাঁর বাতেনী এলেম দ্বারা একথাগুলোর সত্যতার প্রমান পেয়েছেন। তাছাড়া এ অধম বান্দাকে কাশফ- এলহামের মাধ্যমে কিছু কিছু বিষয় জানানো হয়েছে। (একথাগুলো বলার সময় মাঝে মধ্যে চোখ বন্ধ করে চুপ করে থাকতেন, আবার হঠাৎ বলে উঠতেন) সবাই চুপ চাপ বসা। নাদির শাহ কাছেদকে ডেকে বললেন, তুমি গিয়ে খতিব সাহেবকে ডেকে পাঠাও। একটু পরে কাছেদও খতিব সাহেব এসে হাজির হলেন। বাদশা তাকে আসন গ্রহণ করতে বলেন। তিনি একটি চেয়ারে বসে বাদশাহের দিকে তাকিয়ে আলম পানার কি হুকুম বান্দা জানতে চায়? আপনি শরনার্থীদের বেলায় কিছু দিক নির্দেশনা দেন।

খতিব কি নির্দেশনা দেব বলুন? এদেরকে বলেছি আমার দেশের কোন ছেলেকে কাজে না লাগানোর। সেখানে আমার কথা মানল না। আপনাকে ও উজিরে খারেজাকে না বলে ৪০ জন ছেলেকে নিয়ে গেছে। এরা আসলে এদেশে এসেছে ফেৎনা করার জন্য সে আমার সম্মুখে আমার মুরীদের ব্যাপারে বলে তিনি নাকি মুসলমানই নন। নাউজু বিল্লাহ। যিনি আমাকে মহাব্বত করে এত হাদীয়া তুহফা দেন এবং যার এবাদত বন্দগী দেখে আমি নিজে খেলাফত দান করেছি। যার বুজুর্গী সুর্যের মত সু-প্রকট। এমন ব্যক্তির উপর যারা অভিযোগ এনছে তারা যে শুধু দেশেরই শত্রু তা নয়,

এরা দ্বীনেরও শত্রু। তাদের ব্যপারে উজিরে খারেজার বক্তব্য যা, আমার বক্তব্যও তা। এখন আলম পানাহ্ যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

নাদির শাহ এসব আলোচনা শোনে কতোয়ালকে ডেকে বললেন আবদুল্লাহ বিন মাসরুরকে তার বাসায় নজর বন্দি করে রেখ। সে যেন কোথাও যেতে না পারে এবং এখন থেকে তাকে বয়ান বক্তৃতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া গেল। আর শরনার্থীরা যে যেখানে আছে তাদের প্রতিও এখন থেকে কড়া নজরদারী রাখা হবে। এদেশে জিহাদি কোন তৎপরতা চলবে না। এখন থেকে এ নির্দেশ পালনে তোমরা যত্নবান হও। নকীব এ সংবাদ পৌছে দিল সর্বত্র। নকীব আমার বাসায় গিয়ে শোনে আমি ১মাস আগে বাড়ী থেকে বরে হয়ে গেছি। ওরা বাসায় সংবাদ জানিয়ে চলে আসে।

সতের

কিছুদিন পর সুচতুর বলসেবিকরা গোয়েন্দার মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে গেল যে, আফগানিস্তানের শরনার্থী শিবিরে যে কজন গোয়েন্দা পাঠানো হয়েছিল সে কয়জনকেই মুজাহিদরা হত্যা করে ফেলেছে এবং হেলেনা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সমস্ত গোপনীয় ষড়যন্ত্র ও সংকেত গুলো প্রকাশ করে দিয়েছে। সীমান্ত ছাউনি থেকে খবর পেল যে, ৩ জন মুজাহিদ গভীর রাত্রে গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে সেনা ছাউনিতে রাত্র যাপন করে, তার পর সেখান, থেকে ভূমি মাইন নিয়ে সেনাদের গুরুত্বপূর্ন রাস্তায় পুঁতে রাখে, ফলে ৬জন সীমান্ত প্রহরীর মৃত্যু ঘটে। এসব সংবাদ বায়ু প্রবাহে মিশ্রিত হয়ে সবগুলো গোয়েন্দা ইউনিটে পৌছে গেল। গোয়েন্দারা দ্রুত মিটিং আহব্বান করে পূর্বের সমস্ত কলা-কৌশল, কায়দা-কানুন ও সংকেত বাতিল ঘোষণা করে।

আমি হেলেনার কাছে শোনেছিলাম তাদের ২৮ প্রকার সংকেত আছে। আবার প্রত্যেক ক্রমিক নম্বরের জন্য পৃথক পৃথক কোর্ড নাম্বার আছে। প্রতি মাসে কম পক্ষে দুবার পরিবর্তন করতে হয়। তাই সমস্ত কোর্ড নাম্বর ক্রমিক নাম্বার পরিবর্তন করে দিয়েছে। সে মিটিংএ আমাকে ও হেলেনাকে খোজে বের করার জন্য টাকা পুরুস্কার দেয়ার ঘোষনা দিয়েছে। এজন্য হেলেনা ওয়ার লেছ করে কোন সংবাদই নিতে পারছে না। এদিকে

মাননীয় খতিব সাহেব একজুমায় জিহাদের আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। ধারাবাহিক তাফসিরে তিনি সুরা তওবা সুরা আনফাল ও সুরা মুহাম্মদের তাফসির করতেন। উজিরে খারেজার (নির্দেশে) কুট কৌশলে তাও বন্ধ করেদিলেন। তার পর প্রভাবশালী মুসল্লীরা জিহাদের আলোচনা বন্ধের প্রতিবাদে মুখুর হয়ে উঠেন। খতিব সাহেব অবস্থা বেগতিক দেখে পরের শুক্রবারে জিহাদের উপর অগ্নি ঝরা বক্তব্য রাখেন। এমন লোমহর্ষক আলোচনা অতীতে কোন দিন করেননি তিনি। শত শত মুসলীমরা মুহু মুহু তাকবীর ধ্বনিতে জামে মসজিদ প্রকম্পিত করে তুলেন। জিহাদের ফাযায়েলগুলো বয়ান করতে গিয়ে যখন জান্নাতের হুর-গেলমানের আলোচনা আসত তখন পাঠান বুড়োরাও নারা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যেত। জিহাদের মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দাঁগিয়ে যেত। জিহাদের মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি জোসের সাথে হক কথাটি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, তাহল "বর্তমান বিশ্বের যে ভয়াবহ অবস্থা,সে হিসাবে তামাম দুনিয়ার মুসলমান নর-নারীর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক মোমেনের উপর জিহাদের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখাও ফরযে আইন জিহাদের প্রশিক্ষণ সব সময়ই ফরযে আইন। এধরনের কড়া বয়ান দিয়ে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। সে সময় যেন আল্লাহ পাকের কালামের তাজাল্লিয়াতে তাঁর মুখমন্ডল সুর্যালোকের মত ঝলমল করছিল। কেউ তাঁর চেহারার দিকে সরা সরি তাকিয়ে দেখারও সাহস পায়নি। মিম্বর থেকে অবতরনের সাথে সাথে মুসল্লীরা ভাবাবেগে হস্ত-পদ চুম্বন করতে লাগলেন।

এঘটনাকে আমি ভিন্ন নজরে দেখেছি। তাহল তিনি কিছু দিন জিহাদের আলোচনা থেকে বিরত থাকায় যে গোনাহ হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাহবুব বান্দার গোনাহের কাফফারা নিতে গিয়ে তাঁর জবান খুলে দিলেন তিনি যে আল্লাহর অলী তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। বুজুর্গ ব্যক্তিরা কপটতা কি জিনিস তা বুঝেন না। তাই সুচতুর মন্ত্রী তাঁর দ্বারা বিভিন্ন সময় স্বীয় কাজ উদ্ধার করে থাকে। সে দিনের আলোচনার পর আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, খতিব সাহেবের আয়ুকাল ফুরিয়ে এসেছে। তাকে আর দুনিয়াতে রাখবে না।

চার দিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতেছিল। মাহমুদা ও হেলেনা আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনি কিছুদিন লুকিয়ে

থাকেন। জিহাদ তো করতেই হবে এখনই যদি বন্দি হয়ে যান তা হলে কাজ তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে হেলেনা আরো বলল, আপনি আপনার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০জন মুজাহিদকে খবর পাঠিয়ে কাবুলে এনে রাখুন। তাদেরকে কাবুলের বাইরে কোন কাজ দিবেন না। আমি কিছু গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। সে সব তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যই এখন তাদের দরকার।

এ পরামর্শের একদিন পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক যুবক এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, গত দুদিন আগে সেনা সালারের পক্ষ থেকে ট্রেনিং সেন্টার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তিনি বলেছেন স্বয়ং বাদশা নাকি এফরমান জারি করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা আমাদের কমান্ডার সাহেবের নিকট করেছেন। তিনিই আমাকে গোপনে আপনার নিকট আসতে বলেছেন। আপনার অনুমতি হলে কমান্ডার সাহেব দু'একদিনের মধ্যে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। আর এখন যদি আমাদের উপর কোন হুকুম থাকে তাহলে বলতে পারেন।

তোমরাকি হুকুম পালন করতে গিয়ে যদি জান দিতে হয় তবে তাতেও কি হুকুম পালনে প্রস্তুত আছ ?

হাঁ, অবশ্যই আছি। এটা যদি আল্লাহর হুকুমের ভিতর হয়।

তা হলে তোমাদের বিশ্বাস আমি শরীয়াতের বাইরেও হুকুম দিতে পারি ?

না, না, আপনার প্রতি আমাদের এমন ধারণা নেই।

তাহলে এ শর্ত লাগালে কেন ?

প্রশিক্ষণের সময় আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের আমীর যদি শরীয়তের ভিত্তিতে কোন হুকুম করেন তাহলে জীবন দিয়ে হলেও এহুকুম কে পালন করতে পারবে ? তখন আমরা হাত উচিয়ে ওয়াদা করেছিলাম। তার পর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন যে, তোমাদের আমীর যদি শরীয়তের বাইরে কোন হুকুম করেন তাহলে কে কে সে হুকুম পালন করতে তৈয়ার আছ ? তখনও আমরা হাত উচিয়ে ছিলাম। আবার তিনি এক জনকে প্রশ্ন করলেন, কেন ? তখন সে উত্তর দিয়েছিল যে, আমীরের হুকুম মানা ফরয, তাই। সে সময় উস্তাদ বলেছিলেন যে, আমীরের হুকুম যদি আল্লাহর হুকুমের বিপুরীতে হয় তাহলে তা বর্জন করা ফরয। এজন্যই আমি শর্ত লাগিয়েছি।

ধন্যবাদ তোমাকে এখন বল বিশেষ প্রশিক্ষণে তোমরা ১ জনে কতটুকু কাজ করার সাহস রাখ ?

আমি মনে করি সাধারন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১০ জন সৈন্যের সাথে আমি একাই লড়াতে পারব, যদিও হাতে কোন অস্ত্র না থাকে।

সকলেরই কি এধরণের হিম্মত আছে ?

দশ জনের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে দুর্বল। বাকি যারা আছেন তাদের সাহস বল ও কৌশল আমার চেয়ে অনেক বেশী

তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ! যাও তোমাদেরকে অচিরেই কাজ দেয়া হবে। তুমি গিয়ে তোমার উস্তাদকে পাঠিয়ে দিও এবং তোমরা নিজ নিজ ঠিকানায় অপেক্ষা করতে থাক। তোমাদেরকে খোঁজতে যেন বেগ পেতে না হয়। বুঝলে তো ?

হ্যাঁ, আমি সবাইকে জানিয়ে দেব।

আচ্ছা, শাহান শাহের ফরমান নিয়ে যে সালার ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে ছিল, সে দেখতে কেমন ?

চেহারা সুন্দর, গালভরা লম্বা দাঁড়ি। সালারের পোষাক পরনে লম্বায় আমার থেকে ৩/৪ ইঞ্চি বেশী হবে।

তাকে যে কোন সময় দেখলে চিনবে ?

তা কি বলেন ? হাজার সৈন্যের ভিতর থেকে তাকে বের করা যাবে

আগামীকাল সকালে তুমি একটু সেনানিবাসের আশ-পাশের রাস্তায় ঘুরাফেরা করে দেখবে পেরেট গ্রাউনে তাকে দেখা যায় কি না।

তা পারা যাবে।

আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে হেলেনা চা নাস্তা নিয়ে এল। আমি তাকে চা-বিস্কুট খাওয়ায়ে বিদায় দিয়ে দিলাম। সে খুব সতর্ক তার সাথে গেইট থেকে বের হয়ে তার গন্তব্যের দিকে চলে গেল। পর দিন গভীর রাতে কমান্ডার সাহেব আমার বাসায় এলেন। আমি তাকেঁ মন্ত্রি পরিষদের আলোচনা ও ঘোষনা, খতিব সাহেবের মুসুল্লীদের তীব্র প্রতিবাদ ও খতিবের বিরুদ্ধে সমালোচনা। তার পর জিহাদের উপর তেজষ্যী বক্তব্য ইত্যাদি আদী-অন্ত সব শোনালাম। তার পর আমার যে চিন্তা ধারা তাও জানালাম। অর্থাৎ আমার ধারনা হল এ বয়ানের পর খতিব সাহেবের আয়ুকাল ফুরিয়ে আসছে। কমান্ডার সাহেব আমার মন্তব্য শোনে বললেন, তা একশ একশ সত্য, এত কোন সন্দেহ নেই।

তার পর হেলেনা ও মাহমুদাকে আমাদের পরামর্শে অংশ নেয়ার নির্দেশ দিলে তারা পর্দার আড়ালে এসে বসে গেল। আনুসাংগিক বিষয়াদীর উপর দীর্ঘ আলোচনা হল। কমান্ডার সাহেবও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু বললেন। এখন আমাদের কাজ কি হবে এ ব্যপারে আলোচনায় আসলে কমান্ডার সাহেব বললেন, আপনাকে বেঁশ কিছু দিন অন্তপুরেই থাকতে হবে। আপনার সন্ধান পেলে হয়ত কয়েদ খানায় না হয় নিজ গৃহে নজর বন্দী করে রাখবে কেননা আপনাকে ধরার জন্য যেহেতু পুরস্কার ঘোষণা হয়ে গেছে এখন আর এটাকে হালকা করে দেখলে চলবে না। উজবেকিস্তানে যে কাফেলা জায়গা খুঁজতে গিয়েছে তারা এখনো ফিরে আসেনি। তারা যদি ভাল সংবাদ নিয়ে আসেন, তাহলে আপনাকে ৪০/৫০ জন মুজাহিদ দিয়ে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। এখন আপনি বাসাতেই গোপনে থাকতে থাকেন। প্রশাসন ভাবতেছে আপনি এখনো কাবুলে ফিরেননি, যানতে পারলে আপনাকে এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

তার পর তিনি আরো বলেন যে, এখন আমি খতিব সাহেবের হেফাজতের চিন্তা করব। ওনাকে হেফাজত করার দায়িত্ব আমাদের। কারন আমরা যেহতু ব্যপারটা জেনে গেছি। ওনাকে সরাসরি সাবধান হওয়ার কথা এই মুহূর্তে বলা যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। আমরা তাঁর অজান্তেই তাঁকে রক্ষার ব্যবস্থা নেব। আর আগামী কাল থেকেই উজির,দারুয়ান, আর সালারের গতি বিধির নজর রাখতে থাকব। সময়ই সে দিন বলেদিবে কে সত্য আর কে মিথ্যা। কে শত্রু আর কে বন্ধু। কে আসল আর কে মেকী। সে দিন হবে হক বাতিলের যাচাই। সেদিন শাহান শাহেরও অন্তর চক্ষু খুলে যাবে ইনশা আল্লাহ। সে দিন বেশি দূরে নয়। কমান্ডার সাহেবের কথা শোনে আমি বললাম, আমার মনে হয় আপনি আমার অন্তরের গহীনে লুকিয়ে রাখা চিন্তা চেতনা গুলো চুরি করে নিয়ে এখন তা প্রকাশ করছেন। যাক আপনাকে ধন্যবাদ। এখন থেকে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকব। আপনি তাদেরকে যে খানে যে খানে ফিট্ করা সঙ্গত মনে করেন সেখানেই তাদেরকে ফিট করুন।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পর্দার আড়াল থেকে শোনা গেল হেলেনার কণ্ঠ স্বর। সে বলর মুহতারাম আমীর সাহেব ও কমান্ডার সাহেব। আমি পূর্বে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি যদি এজাজত হয় তবে প্রকাশ করলে কমান্ডার সাহেবের জন্য কাজ করা অনেকটা সহায়ক হবে

আর তা যদি মিথ্যা প্রমানিত হয় তবে অন্য কোন পন্থা আবিস্কার করতে হবে। আমি ওয়ারলেছে সাংকেতিক ভাষায় উক্ত উজিরকে তাদের গোপন আস্তানার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বললেন সেনানিবাসের এক প্রান্তে যে খানে সৈন্যদের আস্তাবল রয়েছে তারই পার্শ্বে আস্তাবল প্রহরীর বাস ভবন। উক্ত বাস ভবনই হল তাদের আস্তানা। এখানেই বসে তারা সব ধরনের কুপরামর্শ করে থাকে। উক্ত বাস ভবনে ঢুকতে হলে সেনানিবাসের ভিতর দিয়ে যেতে হয় না। এরই অদুরে অর্থাৎ কাঁটা তারের বেড়া সংলগ্ন একটি টয়লেট রয়েছে। এটা আসলে টয়লেট নয়, এটা হল সুড়ঙ্গ পথ। পাহাড় জঙ্গল থাকার কারনে সে দিকে দিনে বা রাত্রে কোন লোক চলা চল করে না, তাই এখানে কোন প্রহরী রাখা হয়না এবং এর কোন গেইট বা দর্জা ও নেই। উক্ত ভবনটিতেই থাকে প্রধান দ্বার রক্ষী। এমন কোন ভবন বা টয়লেট আছে কি না তা খুঁজ করে দেখা যেতে পারে।

হেলেনার কথা শেষ হতে নাহতেই কমান্ডার সাহেব বলে উঠলেন, সেটা খুঁজ করতে হবে না। সেনা বাহীনিতে কাজ করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গেছি। সেনানিবাসের প্রতিটি বৃক্ষ-লতা ও বালু কনার সাথে পরিচয় দীর্ঘ দিনের। তুমি যা বলছ তা আমার হৃদয় মুকুরে ভেসে উঠেছে। এ সুড়ঙ্গ পথের ইতিহাস হল তাতারীদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এটি খনন করা হয়েছিল। এ সুড়ঙ্গ পথে কতবার যে আমি যাতায়াত করেছি তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। ঠিক আছে আগামী কাল থেকেই ২৪ ঘন্টার জন্য সেখানে নজর দারির ব্যবস্থা করব।

হেলেনা সে এলাকায় কোন মানুষ পেলে তাকে অবশ্যই গ্রেপ্তার করবেন। কোন লোকপাওয়ার সাথে নজর দারী করবে কি করে তা জানতে চাই।

হ্যাঁ, আপনার কথা শত ভাগ সত্য। আমি অমন করে পাহাড়ার ব্যবস্থা করব না। সংলগ্ন পাহাড়ের শীর্ষ দেশে ছোট একটি গুহা রয়েছে। সেখানে বসে বসে সব দেখা যাবে কিন্তু সেনানিবাস থেকে তা দেখবে না। রাত্রের জন্য দূর পাল্লার নাইট দূর্বিন দিয়ে দেব।

সেটা পাবেন কোথায় ?

আমার কাছেই আছে। তা ধার করতে হবে না।

কমান্ডারের কথা বার্তা শোনে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। এবং বললাম, আল্লাহ তাআলা আপনার দ্বারাই এ খেদমতটি নিবেন বলে বুঝা যায়। কাজেই বেশী বিলম্ব না করে খুব জট ফট কাজ করে ফেলুন।

হেলেনা একাজটা তাড়া তাড়ি করবেন। বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, এটা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজেই হাত দিবেন না। যখন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে, তখনই হঠাৎ করে একটি কাজ করে ফেলব। হ্যাঁ নজর দারী অবশ্যই রাখতে হবে।

এগুলো ছাড়াও কমান্ডারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করে একই সাথে খানা খেলাম। কমান্ডার সাহেব বিদায় হয়ে চলে এলেন। মাহমুদা ও হেলেনা খানা খেয়ে আমার দু পার্শ্বে দুজন বসে চা পান করছে। মাঝে মধ্যে চার কাপ আমার উষ্ঠ যুগলে স্থাপন করে। আমি দুএক চুমুক পান করি। একেক সময় একেকজন দিচ্ছে। কিন্তু মাহমুদার মনটি অন্য দিনের তুলনায় অনেকটা নিরানন্দ ও গম্ভির দেখা যাচ্ছিল। পরামর্শের সময়ও সে কোন পরামর্শ দিলনা। তার সামন্য তম মন খারাপে আমি ষোল আনাই ব্যথা পাই। হাজার পেরেশানীর মধ্যেও তাকে মুখ ভার করে থাকতে দেখি নি। তার সুন্দর চেহারার দিকে তাকালে আমার দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানী দূর হয়ে অনাবিল শান্তিতে হৃদ-মন ভরে উঠে। আজ তাকে মুখ ভার করে থাকার কারন জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর না দিয়ে পার্শ্বের রুমে চলে গেল। হেলেনা শুধু হাসছে আর হাসছে। আমি তাকে হাসার কারন জিজ্ঞাসা করলে সেও দৌড়িয়ে গিয়ে মাহমুদার পার্শ্বে শোয়ে মাহমুদার উড়নায় মিছা মিছি মুখ ঢাকার চেষ্ঠা করছে।

আমি চেয়ার থেকে উঠে ওরুমে গিয়ে দেখি দুজনেই হাসছে। আবার কোন কোন সময় মাহমুদা হেলেনার মুখ চেপে ধরার ব্যর্থ চেষ্ঠা করছে। হেলেনা মাহমুদাকে ধরলে সে হাত ছাড়ানোর চেষ্ঠা করছে। এরা যেন আনন্দদায়ক ঝগড়া করছে। আমি হাসতে হাসতে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি হচ্ছে মাহমুদা ?

দেখেন না সাহেব তুমুল ঝগড়া হচ্ছে ?

কি সের ঝগড়া এটা ? উভয়ে হেসে লুট-পাট ?

আরে মিয়া সতিনে সতিনে ঝগড়া করতে হয় তাই করছি।

ঝগড়া করলে অমন করে হাসে না কি, বেকুফ ?

সতিনের ঝগড়া এমনই হয়। সতিনের ঝগড়া তো আর কোন দিন দেখেননি, তাই বুঝাতে পারছেন না। তা শোনে আমি দুজনের মধ্যে শোয়ে

বললাম যাও ঝগড়া ভেঙ্গে দিলাম। মাহমুদা চলে গেল অপর রুমে। হেলেনা তখন আমার কানের কাছে তার ঠোঁট এনে ফিস ফিস করে বলতে লাগল, আপা অসুস্থ। তিনি তিন মাসের অসুস্থ। তিন মাসের অসুস্থ মানে? আরে মিয়া গাছে ফল ধরেছে। কি গাছে কি ফল ধরেছে ? ইসসেরে----- কেমন যেন এক বারে ছোট্ট খোকা কিছুই বুঝে না। আপার পেটে আপনার সন্তান এসেছে। আলাহামদু লিল্লাহ আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন। ছেলে হলে তাকে বানাব আলেম ও মুজাহিদ। আর মেয়ে হলে বানাব হাফেজা। আমার নিয়ত টি কেমন হেলেনা। খুব সুন্দর নিয়ত। আমার ও এটাই ছিল নিয়ত।

আঠার

গভীর অরণ্যে বিচরণকারী সিংহ শাবককে চিড়িয়া খানার লোহার খাচায় আটকিয়ে রাখলে তার যে অবস্থা। শাখে শাখে আর ফুল ডালে বিচরন কারী বুলবুলকে কৃষকের পিঞ্জিরে বন্দি করে রাখলে তার যে অবস্থা, নদীর স্নিগ্ধ সলিলে ঘুরে বেড়ানো মৎসকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে আনলে তার যে হালাত আমার অবস্থাও কোন অংশে কম নয়। যে ব্যক্তির কানে গোলা-গুলির আওয়াজকে লাগত মনমাতানো বাধ্যের আওয়াজের মত, যে ব্যক্তির নাক বারম্নদের গন্ধকে মেশকে আম্বরের মত সুঘ্রান মনে করত। যে ব্যক্তি কাফিরের খন্ডিত শীরকে ফুট বল বানিয়ে খেলা করত, এতিম বিধবাদের পার্শ্বে দাড়ানোতে নিজেকে নিয়ে গর্ব বোধ করত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। মজলুম মানুষের চোখের অশ্রম্ন মুছে দিয়ে যে ব্যক্তি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলত, যে ব্যক্তি গোলা বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করত। সে ব্যক্তি আজ তিনটি মাস ধরে নিজগৃহে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে। আহা এবন্দি জীবন যে কত বেদনাদায়ক কত মর্মান্তিক তা অন্যেরা কি করে বুঝবে ? আজ কতযে নারী কাফিরদের অত্যাচারে হাত তুলে ফরিয়াদ করছে। তার ডাকে সাড়া দেয়া যাচ্ছে না। এটা যে কত অসহনীয় তা বুঝাবার ভাষা নেই। যদিও নিজ গৃহে বন্দি, আমার উপর করা হচ্ছে টর্চারিং তবু এবন্দি জীবন আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। কেবলই যেন রনাঙ্গন থেকে ছায়েমা ডেকে বলছে খোবায়েব খোবায়েব আমি এদিকে, আমি এদিকে। সে যেন বার বার ডেকে বলছে খোবায়েব আমি এদিকে। সে যেন বার বার ডেকে

বলছে" খোবায়েব ! আমি রক্তে গোসল করে জান্নাতে চলে যাচ্ছি, তুমি এসো ! তুমি এসো তোমাকে ছাড়া জান্নাত আমার কাছে কাটাদায়ক মনে হবে। এধরনের আওয়াজ যেন আমি প্রতিনিয়ত শোনতাম।

জীবনের তিনটি মাস বিবিদের নিয়ে আনন্দ উল্লাসে বাসায় কাটাচ্ছি এটা অন্য কেউ মনে করবে খুবই আনন্দে আছি। আসলে এটাই ছিল আমার জীবনের বেদনাদায়ক অধ্যায় গুলোর মধ্যে একটি অধ্যায়। এবার আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, এখানে আর থাকব না । কাফেররা আমার অনুপস্থিতিতে খুব আনন্দ ও ছাইন পাচ্ছে। তাদেরকে অশান্ত রাখা, অঘুম নয়নেরাখা তো ছিল আমার কাজ, তা আর পারছি না। তাদেরকে ঘুমানোর সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। রনাঙ্গণে স্থানের ব্যবস্থা হোক চাই না হোক আমরা গিয়ে সে স্থান বের করে নিব। মনে মনে স্থির করলাম দু'এক দিনের মধ্যেই চলে যাব। আর যাবার আগে খতিব সাহেবের নিকট সাক্ষাত করে যাব।

আমি চিন্তামগ্ন অবস্থায় খোলা বাতায়নে সোনালী রোদের বাহারী ঝলকানী মনের আনন্দে একাই লুট করছি। একদিকে চিন্তা, আর এক দিকে আলোর ঝলকানী, এদুয়ে মিলে হৃদয়ে এক ধরণের পোলক শিহরন। দল ছাড়া কয়েকটি বুল বুলি পুষ্প ডালে নাচা-নাচি করে শিষ দিচ্ছে। সদ্য শিশিরে নাওয়ানা প্রস্ফুটিত কুসুম রাজি কতযে সুন্দর দেখাচ্ছিল তাবলার ভাষা নেই। শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসের ফাকেঁ ফাঁকে ফিরুজা রং এর নাম নাজানা ছোট ছোট ফুল গুলো ফুটে রয়েছে। মনে ছোটমনিদের স্নিগ্ধ হাসি। এরা হয়ত সারারাত জেগে চাঁদের সাথে হেসে ছিল। শিশির নাওয়া গোলাপের পাপড়ি গুলো থেকে টপ টপ করে ফুটায় ফুটায় পানি ঝরছিল। বাতায়নের ফাক দিয়ে ফুলের গন্ধ মিশ্রিত সমিরন মাঝে মাঝে আমাকে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল ওরাও যেন আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলছে ওহে মুজাহিদ তাসকন্দ-সমরকন্দের মায়ের কান্না তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেনি ? প্রবেশ করেনি-মজলুমের কান্না আর অসহায় বোনের ফরিয়াদ ? ওহে মুজাহিদ ! স্বামী হারা মায়ের আর্তনাদ আর এতিমের আহাজারীতে তোমার পাষান হৃদয়ে সাড়া জাগায় নি ? দুজন স্ত্রীর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারনি তুমি ? তোমার পথ পানে চেয়ে আছে হাজারো মা-বোন, আর অসহায় জনতা। ও হে মুজাহিদ ! ছায়েমার রক্তের বদলা নিতে কি তুমি ভুলে গেছ ? শত শহীদের রক্তের সাথে কি বেঈমানী

করছ ? তোমার উঞ্চ শোনীত ধারা কি জমাট হয়ে গেছে ? প্রতিশোধের পাবক শিখায় কি তোমার হৃদয় দাহ করেনি ? ওহে মুজাহিদ তুমি কি মূক, না বধির, না অন্ধ, না বয়রা, না তুমি জড় প্রদার্থ, না প্রাণহীন, তাসকন্দ, সমর কন্দ আর বুখারার অলিতে গলিতে পাষান্ড বলসেবিক হায়েনারা ইসলামের শব যাত্রা বয়ে বেড়াচ্ছে, ইসলামের কবর খনন করে দাফনের জন্য হাত ছানিতে ডাকছে তুমি ও কি সে জানাজার মুসল্লী হতে চাও ? ইসলামের আত্ব চিৎকারে এখনো তোমাকে মাহমুদা-হেলেনার রচিত কোমল শয্যা থেকে ময়দানে টেনে আনতে পারছে না। নবীর রক্তের চেয়ে কি তোমার রক্তের দাম বেশী হয়েগেল ? যে নবীর পবিত্র শরীর মোবারকে মশা, মাছি বসা হারাম ছিল। সে নবীর রক্ত দ্বীনের জন্য ঝরিয়েছেন। দাঁত মোবারক শহীদ করেছেন, সেদ্বীন তোমার সামনে কেঁদে কেঁদে বিদায় নিচ্ছে, আর তুমি ঘরে বসে আরাম করছ। হায় উম্মত হায় মুসলমান হায় দ্বীন হায় ঈমান গাছ-পালা, তরুন্ন-লতা, ফল-ফুল, পাখ-পাখালী সাবাই যেন এসব কিছু বলে আমাকে বিদ্রুপ করছে। আমার আঁখি থেকে নির্গত হচ্ছে অশ্রুর স্রোত ধারা, বয়ে চলছে গন্ড দেশ থেকে দাঁড়ি বেয়ে।

মাহমুদা চা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল আমার পার্শ্বে খাটের সাথে ঠেঁস লাগিয়ে। আমার পার্শ্বে কি কোন প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে সে দিকে আমার মোটেই খেয়াল নেই। সে আমার এদৃশ্য দেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। সেও যেন আমার হৃদয়ের সাথে তার হৃদয় মিশিয়ে দিয়ে ভাব সাগরে হারিয়ে গেছে। সে সময় সূর্যটা তার লালিমা কেটে শুভ্র রং ধারন করে তাপ বিচ্ছুরিত করছিল। চা মাহমুদার হাতে শরবতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমন সময় হেলেনা এসে আমাদে মগ্নতায় আঘাত হানল সে বলে উঠল কি গো সুন্দরী । আমাকে দূরে রেখে একাই স্বামীর সোহাগ লুট করছ। আমাকে ডেকে নিলে কি ভাগে কম হয়ে যেত ? অমনি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি দু জনে নায়িকার মত চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাহমুদার হাতে চায়ের কাপ, আর চোখ ভরা জল। আর মুখ গাল ভরা হাসি। আমাদের চোখ ভেজা দেখে হেলেনা একটু লজ্জিত হয়ে গেল। সে দুজন কে একই অবস্থায় দেখে দ্রুত পদে সরে গেল অপর রুমে ভালভাবে ছিটকারী লাগিয়ে বসে গেল নির্জনে। হেলেনা মনে মনে ভাবছে দুজনকে একই সময়ে কাঁদতে দেখে যে, তাহলে আমিই তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছি আমি কি তাদের চলার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছি

আমিই কি উড়ে এসে জুড়ে বসেছি তাদের দুধ মাখা ভাতে? আমিই কি একটি নারীর অংশ ভাগ করে নিয়েছি আমাকে নিয়েই তাদের অশ্রুতে বুক ভাসাতে হচ্ছে ওরা তো বলে ছিল অন্য এক জন মুজাহিদকে বিয়ে করতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করা কি আমার উচিৎ হয়েছে ? ওনাকে ছাড়া অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করব না, এটা জেনে হয়ত মনের বিরুদ্ধে, মানবতার খাতিরে রাজি হয়েছেন। এটা তো আমার বুঝা উচিৎ ছিল। আমার যৌবন, আর রূপ লাবন্যের দিকে তো কোন দিন লোভ করেননি তিনি, একাকিও নির্জনে কোমলাঙ্গে হাত বাড়াননি তিনি। কত সুন্দর তার চরিত্র, কত পবিত্র তার আত্বা। এমন পবিত্র মহামানব এসংসারে আর কজন আছে ? এমন সুখ শান্তির সংসারে আমিই কি আগুন লাগিয়েছি ? এসব অহেতুক আর নিরর্থক ভাবনায় হেলেনার অন্তর চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অশ্রু ধারায় বক্ষদেশ প্লাবিত হয়ে বালিশ পর্যন্ত সিক্ত হচ্ছে। সে মনে মনে পরম করুনাময়ের দরবারে এবলে দোয়া করতেছিল যে, হে আল্লাহ ছিলাম তোমার পথ ভুলা বান্দি। ছিলাম সাত শত তের নদীর ওপারে খৃষ্টানদের স্বর্গরাজ্য ইউরোপে। সেখান থেকে আর এক ধোকাবাজ, মিথ্যুক, ফাওল, লম্পট খৃষ্টান পিতার নিকট থেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিয়ে এল রাশিয়ায়। এখানে এনে আমাকে দেয়া হল ধোকাবাজীর শিক্ষা। তার পর প্রচুর অর্থের লোভে নামলাম কর্ম জীবনে, সে খানে আমার ধোকাবাজীর দ্বারা কতইনা নিরপরাধ মুসলমান নির্যাতিত হল। কত মা- বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হল। কত মসজিদ-মাদ্রাসা আর খানাকা ধ্বংশ হল, তার এক দিনের হিসাব ও আমার হৃদয় ডায়রীতে অংকন নেই। নেই আমার মনের পাতায়। প্রভুহে তোমারই খাস রহমতে আমাকে দেখায়েছ সত্যের পথ। অলীক ধর্ম থেকে দিয়েছ পরিত্রান। আমি তো শোনেছি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সমস্ত পাপ তুমি ক্ষমা করে দাও। আমিও তা বিশ্বাস করেছি। এখন আমার এটি মাত্র চাওয়া তোমার দরবারে। আশাকরি তা পুরণ করবা। হে আল্লাহ আমাকে দাও তওফিক দাও, আমি যেন তোমার রাস্তায় জিহাদ করতে করতে অসংখ্য- অগনিত তোমার দুশমনকে হত্যা করে শহীদ হতে পারি। হে আল্লাহ আমার এ আশা যদি তোমার দরবারে কবুল না হয় তাহলে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও। আমি আর মানুষের দিলে আঘাত দিয়ে গোনাহগার হতে চাই না। চাই না অন্যের সুখ শান্তির মাঝে কাঁটা হয়ে থাকতে। হে আল্লাহ তুমি আমার প্রিয়তম স্বামী ও আমার বোন

মাহমুদার শান্তি বাড়ীয়ে দাও। আমার জিবীত মুখ খানা আর তাদেরকে দেখাইও না। আমীন ইয়া রাব্বুল আলামীন

আমি আমার চোখের অশ্রু মুছে নিয়ে মাহমুদাকে টেনে কাছে বসালাম। সে বসতে বসতে আমার উরুদ্ধয়ে মস্তক স্থাপন করে শোয়ে পড়ল। আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, মাহমুদা তুমি কি চাও অমন করে হেসেখেলে আমাদের জীবন কেটে যাক ঐ যে চারি দিক থেকে মজলুমানের কান্না ভেসে আসছে। সবাই হাত ছানিতে ডাকছে। এদের ডাকে সাড়া দেয়া কি উচিৎ নয় ?

আমিই আপনার সে পথের বাধা ? আমি চাই আপনার সফর হোক এক রনাঙ্গণ থেকে অন্য রনাঙ্গণে। আমি চাই আপনার মাধ্যমে দুনিয়ার বুক থেকে কালিমা চিহ্ন মুছে যাক। আপনার শানিত তলোয়ারের আঘাতে কুফরি ফেৎনার মূল উৎপাটন হোক। দুনিয়ার মধ্যে আবার শান্তি প্রতিষ্টিত হোক। সমস্ত জুলুম অন্যায়ের অবসান ঘটুক। আমি কোন দিন আপনার গতী পথে প্রাচির সৃষ্টি করব না আমাকে সব সময় পাবেন আপনার ছায়ার মত সাথে সাথে। দুর্গম গিরি, কান্তর, মরু, দুস্তর, পারাবার ও স্বর্গ মর্তে। আমি চাই আপনি বন্ধ কুটিরে না থেকে রনাঙ্গনের মুক্ত মাঠে সীনা টান করে উচ্চ শীরে দাঁড়িয়ে দুশমনের কিলস্নায় রকেট নিক্ষেপ করে তাদের গর্বের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে দিন। আমিও কিন্তু আপনার সাথে থাকব।

মাহমুদার দিলের উচ্চাকাংখা আর তার আলিশান হিম্মত দেখে সত্যিই অবাগ হতে হয়। ছায়েমার শুন্য স্থান সে পুরা করতে সক্ষম হয়েছে। এমন দ্বীনের প্রতি অনুরাগী, খোদা প্রেমিক, বীরাঙ্গনা কয়জন পুরুষের ভাগ্যে জুটে। অনেক পুরুষরা জিহাদের ফজিলত শোনে জিহাদ করতে চায়। তারা মসজিদ থেকে বয়ান শোনে বাড়ী পর্যন্ত পৌছার সাথে সাথে বিবিদের হুমকী ধমকীর কারনে বসে পরে। আর মাহমুদা ঝিমিয়ে পড়া মনকে সাহস দিয়ে সতেজ করে। ঘুমন্ত আত্বাকে জাগিয়ে দেয়। দিধাগ্রস্ত হৃদয়কে শোনিয়ে দেয় অভয় বানী। সে যেন আল্লাহর এক নেয়ামত, যা আমার জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে। মাহমুদার কথা গুলোতে খোঁজে পাওয়া যায় দ্বীনের ভালবাসার নতুন ইতিহাস। তার কথায় ফুটে উঠে দ্বীনের জন্য আত্ব ত্যাগের করুণ কাহিনী। আমাদের এ আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না হেলেনা।

তাই মাহমুদাকে বললাম, কি হে মাহমুদা হেলেনা কোথায় আছে ? ওকে দেখছিনা যে ?

সে অনেক সময় অভিমান করে পিছিয়ে থাকে। চুল ধরা সে আমাদের আলাপে অংশ নিতে চায় না।

যাও ওকে ডেকে নিয়ে আস, ৩ জনে মিলে পরামর্শ করি।

মাহমুদা চলে গেল হেলেনাকে ডাকতে। সে অনেক জোরে জোরে ডাকছে, রুমের দরজাই খুলছে না। অনেক ধাক্কা ধাক্কি করছে কোন সাড়া নেই তার। অবশেষে মাহমুদা এসে বলল। আপনি ছাড়া আজকের অভিমান আর কেউ ভাংতে পারবে না। দরজা বন্ধ করে বসে আছে।আমি গিয়ে দরজায় হাত মেরে ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। মনে হচ্ছে কামরায় কোন লোকই নেই। অবশেষে ছিটকারী ভেঙ্গে রুমে প্রবেশ করে দেখি সে মুর্চা খেয়ে মেজে পড়ে আছে। মাহমুদা এদৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল। আমি তাকে শান্তনা দিয়ে পানি আনতে বললাম সে পানি এনে দিয়ে তৈলের জন্য ওবুমে গেল। আমি বার বার তার মুখমন্ডলে পানি ছিটাতে লাগলাম। এক বার পার্শ্ব পরিবর্তন করে আমার দিকে এক নজর চাইল। আবার এক চিৎকারে বেঁহুশ হেয়ে গেল। কারন কিছুই বুঝলাম না। তার পর মাহমুদাকে নিয়ে হাতে পায়ে গরম তৈল মালিশ করতে লাগলাম। কিছুক্ষন পর জ্ঞান ফিরে এল। তার পর আমার আর মাহমুদার দুটি হাত নিয়ে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগল।

অত পর অনেক শান্তনা ও প্রবুধ দিয়ে এরকমটা হওয়ার কারণ জানতে চাইলাম। সে বলল, প্রিয়তম আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি মাহমুদা আপার সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছি। আপনাদের সুখময় দাম্পত্য জীবনে আমি কাঁটা হয়ে আছি। আমাকে ক্ষমা করুণ। আমি আর আপনাদের ভালবাসার মাঝ খানে বিষ ফুরা হয়ে থাকতে চাইনা। বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাকে এক ডোগ পানি পান করতে দিন। মাহমুদা পানি এনে তার মুখে ধরল। সে পানি পান করে আবার বলল এদুনিয়াতে আর বেঁচে থাকতে চাই না,আমায় ক্ষমা কর। তার একথা গুলো আমাদের অন্তরে শেলের মত আঘাত হানছিল তার পর সে উঠে বসে তার মনের অবস্থা খুলে বলল। আমরা দুজনে অনেক কিছু বলে. অনেক শ্বাসিয়ে তার অন্তর থেকে তার অহেতুক চিন্তা দুর করে দিলাম। এবার সে লজ্জার হাসি হেসে দুজনের মধ্যে ঘেষে বসে বলল, "আমার মন খুবই ছোট, খুবই

সংকীর্ণ। অনার্থক চিন্তা করে মরতে বসে ছিলাম। আপা আমাকে ক্ষমা কর, প্রিয়তম থেকে ক্ষমা আদায় করে দাও। করবে কি আপা আমায় ক্ষমা? মাহমুদা বলল, ক্ষমা করতে পারি এক শর্তে তা হল আর কোন দিন অমন ছিনাল পনা করে ব্যথা দিবি না। এখন শোন তোমার শওহর কি বলছেন-

আমি বললাম আজ তিন তিনটি মাস অতিত হয়ে চলছে, আমি ঘরে আবদ্ধ। আমারা যদি নিজেরা কুশেষ না করি তা হলে কেউ আমাদের পথ খুলে দেবে না। তাই আমি ইচ্ছা করেছি আজ রাত্রেই আফগানিস্তান ছেড়ে তাজিকিস্তানে চলে যাব। সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে নেয়ার চেষ্টা করব। একটা ভাল স্থান পেয়ে গেলেই হয়। যাওয়ার পথে শেষ বারের মত খতিব সাহেবকে সতর্ক করে যাব। হেলেনা বলল ওদিকে যাওয়াটা আমি ঠিক মনে করি না, তার পরও যদি যেতে চান তবে বাধাও দেব না। আল্লাহ হেফাজত করুন। বিকালটা আমরা ৩ জনে খুব হাসি খুশীর ভিতর দিয়ে কাটালাম। রাস্তার জন্য দুজনে মিলে গুরুর ভুনা আর রুটি তৈরী করে দিল। আমার সমস্ত ছামান ঘুচিয়ে দিল। উভয়ে উভয় থেকে দু-চার মাস চলার মত টাকা পয়সা দিল। এশার নামায আদায় করে ৩ জনে একে অপরে মুখে রুটি-তুলে দিয়ে মহা আনন্দের সাথে খানা খেয়ে ঘর-থেকে বের হলাম। হেলেনা বলল। প্রিয়তম আপার জন্য বেশী দোয়া করবেন, সে অসুস্থ। আর একটি কথা বলে যান তাহল, যাদি ছেলে হয় তা হলে কি নাম রাখব আর মেয়ে হলে কি আমি বললাম ছেলে হলে নাম রেখু মোহাম্মদ আর মেয়ে হলে হাওয়া। সবাই হেসে কুট পাট।

মাহমুদা বলল। স্বামি গো আপনিতো জানেন এক মাত্র জিহাদের খাতিরেই আপনাকে বেছে নিয়েছি। যে ভাবেই হোক আমাকে আপনি রনাঙ্গনে নিয়ে যাবেন। আমিও কাফের হত্যা করতে করতে আপনার সাথে শহীদ হব। হেলেনা বলল প্রিয়তম এটাই জীবনের শেষ দেখা হয় কি না তা আলস্নাহ জানেন। আর যদি দেখা নাই হয় তবে কিয়ামত দিবসে আমাকে ভুলবেন না। মুহমুদা আর ছায়েমার সাথে আমাকেও শামিল করবেন। আমিও রনাঙ্গনে যেতে ইচ্ছুক, যদি আপনার দয়া হয়। এখন থেকে আপনার আগমনের পথ পানে চেয়ে থাকব। বিরহ ব্যথ্যায় কেদে কেদে উড়নী সিক্ত করব এবলে আমার কপালে উভয়ে কত গুলো চুমু বসিয়ে দিল। বেরিয়ে এলাম। উভয়ে আমার পিছন দিকে অশ্রু ভরা নয়নে তাকিয়ে রইল।

উনিশ

আমি বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম রিক্ত হস্তে । সাথে আনিনি কোন অস্ত্র। কারণ যেতে হবে কয়েক দিনের পথ। আমার উপর বিধি নিষেধ জারি হওয়ার পর সশস্ত্র অবস্থায় সরকারী লোকজন পেলে জামেলা করতে পারে। তাই অস্ত্রলওয়া থেকে বিরত রইলাম। এক বার যদি সীমান্ত এলাকায় যেতে পারি তবে শরনার্থী শিবিরে অনেক অস্ত্র রাখা আছে, সেখান থেকে নেয়া যাবে।

বাসা থেকে বের হয়ে সুজা চলে গেলাম জামে মসজিদ আঙ্গিনায়। ঘোরাটি এক বৃক্ষের সাথে বেঁধে আমি হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছালাম দিলাম, হুজুর ছালামের উত্তর দিয়ে একটু মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি এত রাত্রে। কোত্থেকে এলে ?

আমি আবদুলস্নাহ বিন মাসবুর। আসছি আপনার সাথে মুলাকাত করতে ও দোয়া নিতে।

তুমি কি মুজাহিদ আবদুল্লাহ ?

জ্বী হুজুর। এমনি দরজা খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকে মোসাফাহা করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হুজুর ইশারা দিলেন বসতে। আমি বসলাম। হুজুর খুব চিন্তামগ্ন। চেহারায় রাগের আভা ফুটে রয়েছে। আমি ভাবলাম যে হয়ত এত রাত্রে আসছি বিধায় হুজুরের কষ্ট হচ্ছে। তাই খুব নম্র ভাষায় বললাম, হুজুরের মনে হয় তকলিফ হচ্ছে আমি চলে যাই, হয়ত আর দেখা হবে না দোয়া চাই।

কোথায় চলে যাও ? তাহলে এখানে এসেছ কেনে ?

চলে যাব দেশে। আসছি শেষ মোলাকাতের জন্যে।

এত দিন কোথায় ছিলে ?

কিছু দিন ছিলাম বাইরে। আর বাকী সময় বাসায়।

তা হলে তো সবই শোনেছ ?

হ্যাঁ শোনেছি এজন্যই বাদশাহের আদেশ পালন করতে কাবুল ত্যাগ করছি। আমার জন্য হতভাগা জাতির জন্য খাসভাবে দোয়া চাই। আর আমরা যেন ভিন্ন দেশের বুঝা না হয়ে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পরিস্থিতি

কায়েম করতে পারি ও নিজ দেশে ঈমান, আমল, ও ইজ্জত সম্মান নিয়ে থাকতে পারি।

তোমরা তা হলে আমার কথায় কর্নপাত করলে না। যদি করতে তা হলে এমন হত না। আমার নিষেধের পরেও তুমি ৪০ জন যুবককে প্রেরণ করেছ।

হুজুর এযুবকরা এদেশের সম্পদ এদেরকে নেব না, আমার ইচ্ছার পরিবর্তন করেছি। এদের দ্বারা তো এত টুকু হয়েছে যে তাদের ফরজ টুকু তারা আদায় করেছে।

তুমি কথায় কথায় মাসআলা বল। নিজেকে খুব বড় পন্ডিত হিসাবে জাহির করছ। এত পন্ডিতি ভাল নয়।

হুজুর ক্ষমা করবেন। এবেয়াদব আর কোন দিন বেয়দবী করবে না। এখন বিদায়ের অনুমতি চাচ্ছি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে ছেলেগুলো রয়েছে এরা আপনার উপকারে আসবে। এরাই হবে আপনার বিপদের দিনের সাথী

এরা আমার বিপদের দিনের সাথী তাহলে মনে হয় আমার বিপদ আছে। কাশ্‌ফ এলহাম হয় তো ?

হুজুর আমিতো পীরও না বুজুর্গ ও না, কাশ্‌ফ এলহাম কি তাও জানি না। তবে আকাশের ঘন ঘটা দেখে বৃষ্টি আসার কথা বলতে পারি। ধুয়া দেখে নিচে আগুন আছে তা বলতে পারি। এটা বুজুর্গী আর এলহামের কিছু নয়।

তা হলে এটাও তো নিশ্চয় বলতে পারবে, আমার কি বিপদ হবে আর কবে হবে।

কবে হবে তা বলতে পারি না, তবে বিপদ আছে।

কি ধরনের বিপদ ?

সে বিপদে হয়ত জীবন ও যেতে পারে।

কাদের মাধ্যমে ?

আপনার একান্ত আপন জন কলিজার টুকরার মাধ্যমে।

তুমি কি উজিরের কথা বলতে চাও ?

হতে পারে। এসময় হুজুর বাইরে গিয়ে তার খাদেমকে পাঠিয়ে দিলেন উজিরকে ডেকে আনতে। আরে আমি এতটুকু বুঝতে পারিনি। মানুষ যে অন্ধ ভক্ত হতে পারে তাও জানা ছিল না। আমি ভাবছি অন্য কোন কাজে তাকে পাঠাচ্ছেন। সময় বেশি নষ্ট হচ্ছে তাই আবার বললাম হুজুর

আমাকে বিদায় দিলে ভাল হয় রাত গভীর যাব বহুদুর। হুজুর বললেন, একটু বস, এক্ষণি আসবেন।

একটু পরেই উজির ও কালো পোষাকদারী দুজন লোক হুজরায় এসে ঢুকলেন। হুজুর আমাকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে বললেন এই সে ব্যক্তি যাকে আপনারা খোঁজে বেরাচ্ছেন। ওরা কোন কথা না বলে বললেন ,চল বাইরে চল, তোমার সাথে কাজ আছে। তাদের কথার সুরে বুঝতে পারলাম যে আমি গ্রেপ্তার। তাই হুজুরকে বললাম, হুজুর যখন শাহান শাহ আমার উপর সফর করা, ওয়াজ করা, ট্রেনিং দেয়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, সেদিন থেকে আমি সফর করা ও জিহাদের তাবলীগ করা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বলেছেন আমাকে আফগানিস্তান থেকে তাড়িয়ে দিতে না হয় নজর বন্ধিতে রাখতে। আমি নিজ ইচ্ছায় তাঁর এদুটি হুকুমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি। তিনটি মাস আমি নিজ গৃহে নজর বন্ধীর হুকুম পালন করেছি, এখন দেশ ত্যাগের হুকুম পালন করতে ঘর ত্যাগ করে আপনার সাথে আখেরী মোলাকাতের জন্য আসছি। বিদায় দিলে এখনি জন্মভূমির দিকে অশ্ব হাকাব।

এখন আপনার সম্মুখ থেকে লোকগুলো আমাকে একমত জোর করে কোথায় নিয়ে যেতে চায় তা আমি জানি না। এদের চেহারায় আমাকে সাক্ষী দিচ্ছে এরা নাসারা বহু মুসলমানদের কাতেল। আমি কিন্তু শুধু দুজন কেই বলছি না, এর সাথে আপনার মুরীদও সামিল। এরা কিন্তু শুধু আমারই দুশমন নয়। আপনার রাষ্ট্রের এবং দ্বীনের। এদেশে যত গুপ্ত হত্যা হচ্ছে সে সব হত্যা তাদের মধ্যেমে ও দ্বারা হচ্ছে । আমার মনে হয় আপনার আয়ুকাল ফুরিয়ে আসছে। আপনার মাধ্যমে যা উদ্ধার প্রয়োজন ছিল তাদের তা তারা উদ্ধার করে নিয়েছে। এখন আপনার ফায়েজ আর বরকতের ও দরকার নেই তাদের। এই উজির এক সময় আপনার দেয়া খেলাফত আপনার নাকে মুখে ফিকে মারবে। আমি আপনার হাতে পায়ে ধরে অনুনয় করছি, এদেরকে ফিরিয়ে নিন। আমার দেশে আমাকে যেতে দিন।

তুমি না মুজাহিদ মৃত্যুকে এত ভয় পাও ? তুমি যাও না তাদের সাথে। তোমাকে কি এরা গিলে খাবে ?

অপ মৃত্যুকে অবশ্যই ভয় করি। আমার মৃত্যু হবে রনাঙ্গনে খুন রাংগা পিচ্ছিল পথে। আমার লাশ রক্তে গোসল করবে। আমার লাশ খুন রাংগা

কর্দমাক্ত হবে। এমন কাপুরুষের মৃত্যু আমি চাই, না। বাইতুল মোকাদ্দাছের ছেহেনে আমার মৃত্যু হোক, হারাম শরীফে আমার মৃত্যু হোক এমন মৃত্যু আমি চাই না। আমার মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানে এটাই আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন

যাও বাবা যাও দেরি করোনা, এরা তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যে বেয়াদব তার আর একটি প্রমান এখানেই। তা হল তুমি তাদেরকে কত কথা বলছ, কিন্তু তারা আমার সম্মানার্থে মুখ খুলেনি। আর তুমি এক তরফা ওয়াজ আরম্ভ করে দিয়েছ। যাও উঠো এখান থেকে। আমি বিদায়ী সালাম জানিয়ে বললাম হুজুর আমার লাশের যদি খবর হয়, আর জানাজার ব্যবস্থা হয় তখন আপনি আমার জানাজায় যাবেন না। পবিত্র কুরআনে তা নিষেধ করা হয়েছে।

হুজুর আমি কর হানাফী, আমরা কিয়াছ বেশী করি তাই কিয়াছ করে বলছি। আল্লাহ তাঁর হাবিব (সাঃ) কে নিষেধ করেছেন যারা জিহাদ না করে তাদের জানাজা পড়তে। এ হিসাবে আমিও বলছি যারা জিহাদ করে না বিরোধিতা করে, তারা যেন আমার জানাজায় শরীক না হয়।

নেও তো চাপাবাজকে। জলদি নিয়ে যাও। হুজুরের কথার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম এবং হুজরার বাইরে এলাম। এমন সময় ৩ জনে ধরে আমার হাত দুটি পিছনে নিয়ে মজবুত করে বানতে লাগল। হুজুর জানালা দিয়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। আমি ওদেরকে বললাম তোমরা এত পেরেশান হচ্ছ কেন, বাঁধছ কেন ? আমি ভেগে যাওয়ার লোক নই। বল কোথায় যেতে হবে। হাত বেঁধে চোখ দুটিও বেঁধে ফেলল। সারা দুনিয়া আমার নিকট সংকির্ণ মনে হচ্ছিল।

আমাকে অশ্বারোহন করিয়ে উর্ধ্ব শ্বাসে অশ্ব হাকাচ্ছে। মনে হল কয়েক মঞ্জিল পথ গিয়ে গিয়ে অশ্ব পাল্টিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মধ্যে দু'একটি শুকনো রুটি বা ছোলার ছাতু আমাকে খেতে দিত। আর দিত সামান্য পানি। কয়েক বারই বিরক্ত হয়ে বলছি, হে নাসারা কুত্তার বাচ্চারা তোরা আমাকে নিয়ে এত কষ্টে কোথায় যাচ্ছিস। তোদের আখেরী কাজটি সেরে ফেললেই তো পারিস। গালি দিলে ওরা আমাকে সপাস সপ চাবুক লাগাত। একটি বারও নামায পড়তে দিতনা ওরা। কত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলছে। চলছে তো চলছেই। আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে

তাও ঠাহর করতে পারিনি। দিন না রাত তাও বুঝতে পারিনি। যখন হীম হাওয়া প্রবাহিত হত তখন মনে করতাম এটা রাত। আবার যখন সূর্যের তাপ গায়ে লাগত তখন বুঝতাম এটা দিন। অনেক কিছু বলা কওয়ার পরও শোকরের বাচ্চারা সামান্য সময়ের জন্য চোখ খুলে দেয়নি। এ যে কত বেদনাদায়ক মুর্হুত ছিল তা ভাষায় বলে শেষ করা যাবে না। এদিকে আমার গ্রেপ্তারের কথা তো কেউ জানে না। কত দিন কত রাত অতিবাহিত হল তা বলতে পারিনি। তবে ১০/১৫ দিন দিবা-রাত্রে চলেছি বলে মনে হয়। একবার অশ্ব থেকে অবতরন করাল। তার পর পায়ে হেটে চলল। আনুমানিক ৫/৬ ঘন্টা পথ অতিক্রম করার পর এক স্থানে এসে উপনিত হলাম। এবার এক হারামযাদা আমার কটিদেশে লাথি মেরে বলল, এই শালা। তোর বাসভবনে এসে গেঁছি, এ বলে চোখের ও হাতের বাঁধন খুলে দিল। আমি রাগে কট মট করতে করতে বললাম এ হারামী কুত্তার বাচ্চা আমাকে শালা বলে গালি দিলে কেন অন্য কোন গালি পেলে না ? শালা তো আত্বিয়াতার সাথে সম্প্রিক্ত। কুকুরের সাথে আত্বিয়তা হয় না। উত্তরে সে বলল, আমরা কিতাবী ,অত্বিয়তা হবে না কেন ? আমি বললাম বর্তমানে কোন নাসারারা কিতাবী নয়। এগুলো পরের লিখা মন গড়া কত গুলো কাগজ মাত্র। এগুলো আসমানী কিতাব নয়। আমি এদ্দিক ওদিক তাকিয়ে চোখে কিচ্ছুই দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল এটা পাতাল পুরীর কোন কক্ষ। বহুদিন চোখ বাঁধার কারনে হঠাৎ ছাড়ায় কিছুই দেখছি না।

এক বদমাইশকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কিবলা কোন দিকে? বেওনিজ উত্তর দিল তোদের খোদা বুঝি শুধু কিবলার দিকেই থাকে। অন্য দিকে থাকতে পারে না। আমি কোন উত্তর না দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে লাগলাম। কাযা নামাজ, কছর নামায। পরলাম বেশ কিছুক্ষণ। তার পর এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক এসে নামায পড়তে দেখে এক থাপ্পর বসিয়ে দিল গন্ড দেশে এবং বলল কি করছিস এখানে ? আমি বললাম নামায পড়ছি। কাযা নামায । সে বলল, নামাযে আর কাজ হবে না। নেও তোমার খাবার ও পানীয়। আমি হাত বারিয়ে তার হাত থেকে খানা নিলাম খানার ওজন দেখে মন খুশী হল যে বহু দিনে পেট ভরে আহার করব। রুটির পুটুলীটা হাতে দিয়েই বলল, এটা তোমার তিন দিনের

খাবার এর মধ্যে আর খাবার আসবে না। পানির বোতলে রয়েছে আনুমানিক এক লিটার পানি। পানির জন্য আমার জিহ্বা শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমি বোতলের ছিপি খুলে মুখের কাছে নিতেই বের হল পচা গন্ধ। নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে আসার উপক্রম। আমি এক ধমক দিয়ে বললাম, তিন দিনের জন্য এক লিটার পানি, তাও নর্দমার। আমাকে পান করার উপযুক্ত কিছু পানি দিন। সে আমাকে আর একটি চর মেরে বোতলটি কেড়ে নিয়ে গেল। একটু পর এক বোতল ভাল পানি এনে দিয়ে সে চলে গেল। আহারয্যগুলো বের করে উদর পূর্ন করে খেয়ে নিলাম। তার পর ছবর করতে লাগলাম।

লোকটি চলে যাওয়ার সময় গেইটে তালার আর্তনাদ শোনছিলাম। আমি আস্তে আস্তে তালার শব্দের দিকে এগিয়ে গেলাম। খুব আঁকা বাঁকা সুড়ঙ্গ পথ। শেষ প্রান্থে গিয়ে দেখি উপর দিকে সিরি রয়েছে। সিরি বেয়ে উপরে উঠলাম। দেখি মজবুত লোহার দরজা বাইরে তালা জুলানো। বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে খুব সামান্য আলো বাতাস অনুভব হল। এভাবে কেটে গেল তিন দিন। ক্ষুধা-পিপাসায় কাঁতর হয়ে জীবন উষ্ঠাগত। আল্লাহং ছাড়া সাহায্যকারী আমার আর কেউ নেই। তাই খুব বেশী বেশী আল্লাহকে স্বরণ করতে লাগলাম এবং দোয়া করতে লাগলাম। কক্ষের অভ্যন্তরে যখন আর থাকতে পারতাম না তখন শিরি বেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে দাঁড়িয়া থাকতাম।

এক পর্যায়ে ৫ জন লোক এসে আমাকে বাইরে নিয়ে এল। চেয়ে দেখি এটা একটি পাহাড়ী অঞ্চল। চার দিকে যম কালো পাহাড়গুলো দানবের মত দাড়িয়ে আছে। ঘনকান্তারে ভরা সর্ব দিক। তবে মাটি। গাছ-গাছড়া, আর পাহাড়ের। এটা আমার জম্ম ভূমি। এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কি খুবায়েবের গ্রুপের না অন্য কারো ?

খুবায়েবে কে, তার পরিচয়ইবা কি তা জানি না।

আচ্ছা বল শরনার্থী শিবিরে যে হত্যা কান্ড সংগঠিত হয়েছে এটা কার ইশারায় ?

শরনার্থী শিবির কোথায় অবস্থিত আর কবে সে খানে মার মারামারি হয়েছে সে খবর আমি কি জানি ? একজন বেলে উঠল স্যার এলোকেই আমার নিকট খুবায়েব বলে মনে হয়। অন্য জন আরে না তার ছবি দেখেছি। সে এক পাহাড়ী জন্তু। ওরা সামান্য কিছু সওয়াল জওয়াব করে আমাকে পূর্বের স্থানে রেখে গেল।

বিশ

আমাকে গ্রেপ্তার করার পর এক মাসের মধ্যে কাবুল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গুপ্ত হত্যার স্বীকার হয়। কাবুলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এসব হত্যার কোন ক্রো খোঁজে পাচ্ছে না। আর না পাওয়ারই কথা। প্রবাদে বলে বেড়ায় ক্ষেত খেলে ফিরাবে কে ? এর বাস্তব নমুনা হল বর্তমানের কাবুল। যাদেরকে হত্যা করেছে এরা সাধারণ নাগরিক নন। কেহ নাদির শাহের মজলিসে শুরার মেম্বার, কেহ বড় ব্যবসায়ী, আবার কেহ বড় আলেম। কোন রাষ্ট্রে যদি নেতৃত্ব দেয়ার মত লোক না থাকে তাহলে রাষ্ট্রটা এক সময় না এক সময় যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বিরান মুলুকে পরিণত হবে। বলসেবিকরা এসত্য সবচেয়ে বেশী বুঝেছিল। তাই তারা নিজ দেশের ভিন্নমত পোষণকারী নেতৃত্ব স্থানীয় লোককে নির্বিচারে হত্যা করেছে। পার্শবর্তী রাষ্ট্র থেকে কেউ যেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য পর্শী ও বন্ধু প্রতিম দেশেও তারা অতি সংগোপনে সে অভিযান চালিয়ে ছিল। প্রশাসন তাদের চাল বুঝতে বুঝতে কাম শেষ করে ফেলত।

দেশে বিরাজমান অস্থিতিশিলতার ও খুন খারাবী বেশী হওয়ার ব্যপারে খতিব সাহেব মুখ খুলতে লাগলেন। এতে জনগণ প্রতিটি গ্রামে সেচ্ছা সেবক গঠন করে পালাক্রমে পাহাড়া দিতে লাগল। খতিব সাহেবের এসব কর্মকান্ডে গোপ্তচরেরা খুবই ক্ষুদ্ধ হচ্ছিল খতিব সাহেবের প্রতি।

যখন থেকেই গোয়েন্দারা বেশী বেশী মিটিং করতে লাগল। এ ব্যপারটা কমান্ডার সাহেবের গোপ্তচর আঁচ করতে পেরে কমান্ডার সহেবের গোচরে দিলেন। সে দিন থেকে কমান্ডার সাহেব তাঁর বাহিনী সুসংগঠিত করে নিয়মিত অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন জুমার নামাজের পর উজিরে খারেজা খতিব সাহেবের হুজরায় প্রবেশ করে বলল, "হুজুর আপনি আজ কয়েক জুমার মধ্যে যে সব আলোচনা করেন, এতে জনগনের কোন উপকার হবেনা। বরং দেশে অরাজকতা বিরাজ করবে। এসব দমনের কাজ হল সরকারের। সরকার এব্যপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। যত টুকু নিয়েছেন, তত টুকু যথেষ্ট নয়।" এ ধরনের বক্তব্য রাখার অর্থহল সরকারের বিরোধিতা করা। এক

জন আদেল ইনসাফগার বাদশার বিরোধিতা করা তো সম্পূর্ণ রূপে হারাম। অতএব নিরব থাকাটাই আপনার জন্য শ্রেয় মনে করি।

আমি জাতিয় মসজিদের জাতিয় খতিব। আমার উপর ফরয দায়িত্ব হল জনগনের বা সরকারের ভুল গুলো ধরে দেয়া। দেশের সার্বিক বিষয়ে অবগত করানো। জনগণের প্রানের দাবী সবার সম্মুখে বিবেচনার জন্য ধরে তুলা। এতে কে বেজার হবে আর কে নাখোশ হবে সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমি হক কথা বলে যাব অনর্গল। এতটুকু আলোচনার পর এরা চলে আসল। তাদের কথা শোনে খতিব সাহেবের দিলে আমার কথাগুলো রিতিমত মিছিল করতে লাগল। তিনি মনে মনে এও ভাব ছিলেন যে এরা আমাকে বয়ানে বাধা দেবে কেন। না আবদুল্লাহবিন মাসরুরের (আমার ছদ্ধ নাম)কথাই সত্য হয় এরাত্রে খতিব সাহেবের ভাল ঘুম হল না। শয্যাপরে তিনি শুধু এপাশ ও পাশ করে রাত্র পোহালেন। সারা দিন তিনি গম্ভিরভাবেই কাটালেন।

মাসবৃত যমিনীর প্রথম ভাগ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। পথে নেই পথিকের ভীর,নেই কোলাহল। এতক্ষনে শহরের রাস্তার মাত্র কয়েকটি আলো ছাড়া সবগুলো নিভে গিয়েছে। যম কালো রাত, ঘুট-ঘুটে আঁধারে ছেয়ে আছে চার দিক। জাতির দিশারী, কাবুলের মুরুব্বী আল্লামা সামসুল হক নজদী (খতীব সাহেব হুজুর) সাহেব কিতাবাদী মুতালা করতে ছেন হুজরার মেজের উপর বসে। চোখে ঘুম ডুলু ডুলু করছে। আর একটু পড়েই শোয়ে যাবেন তিনি। এমন সময় বাহির থেকে জুতার আওয়াজ আসল তাঁর কানে। বাহিরে চেয়ে দেখেন ৩/৪ জন লোক দাড়ানো। ওরা কে অন্ধকারে চিনতে পারেননি তিনি। তাই আওয়াজ দিলেন, কে তোমরা এত রাত্রে ? এদিকে এসো। আগন্তক কাফেলা তাঁরই একান্ত বক্ত মুরীদ উজিরে খারেজা, প্রধান দ্বার রক্ষী, সেনাবাহিনীর সালার ও স্থানীয় এক জন উচ্চ পর্য্যায়ের নাস্তিক। এ ৪ জনই হযরতের মুরীদ, আশেকীন, ছালেকীন, ছালেহীন ও মুনাফেকীন। হযরত তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরাকি খানকায় রাত্র যাপন করবে ? উত্তরে ওরা না বলল। হযরত আবার সুধালেন কোন হাদীয়া তুহফা আননি তো ?

না হযরত নিতে আসছি।

ফয়েজ অ বরকত না দোয়া ?

আপনাকে।

আমাকে এত রাত্রে ?

জ্বী হযরত।

কোথায়, বাসায় নাকি ?

হ্যাঁ,

যাব কিভাবে ?

আমরা ধরে ধরে নেব।

তোমরা আস্তা বেকুফ। এখন ঘুমানোর সময়, এখন এসেছ।

হুজুর সেখানে নিয়ে আপনাকে আরামে ঘুম পাতাব।

একটু দাঁড়াও। হযরত জামা কাপড় আর পাগরী পরে বের হলেন। ছেহেনের বাইরে যেতেই পাগরী খুলে চোখ দুটি বাঁধলেন।

আরে আরে তোমরা একি করছ ? ছাড় ছাড়।

আমরা নিয়ে যাব,পথ আমরাই দেখব, আপনাকে কষ্ট করে দেখতে হবে না। চিল্লা-চিল্লি বন্ধ করুন। বাতায়নের ফাক দিয়ে হযরতের এক মাত্র পরমা সুন্দরী কন্যা মায়মুনা এদৃশ্য দেখে আব্বু আব্বু চিৎকার দিয়ে উঠল। দুর্বিত্তরা কান্নার অপরাধে তাকেও ধরে নিয়ে এল।

কমান্ডার সাহেবর কমান্ডোজ বাহিনী নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে এমন একটা কিছুর অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় ওরা সুরঙ্গ পথ দিয়ে পরিত্যক্ত গৃহে অর্থাৎ গোপন আস্তানায় এস পৌছল। হায়েনারা পিতার সম্মুখে মেয়েকে নেংটা করে পাশবিক অত্যাচারের জন্য তৈরী হবে এমন সময় পঙ্গ পালের মত দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পরল মুজাহিদ বীর সন্তানেরা। চোখের পলকে ৪ জনকে বেঁধে ফেলল হুজুর আর মায়মুনা ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এবার কমান্ডার সাহেব উজিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে কুত্তার বাচ্চা হারামী বদমাইশ কত দিন যাবৎ একাজ করছিস এপর্যন্ত যত গুপ্ত হামলা হয়েছে এর দায়ী কারা ? সবাই নিরব। আবার ধমক দিলে অত্যন্ত ক্ষীণ সুরে বলল আমরাই।

তোদের হুজুরের উপর এত আক্রোশ কেন বলবে কি ?

তার কারণ অনেক। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল, রাশীয়ার সুপ্রীম কমান্ডের হুকুম, তিনি বড় আলেম ও পীর, তিনি মুজাহিদদের মদদ দাতা, তিনি জিহাদের প্রতি উদবুদ্ধ করে বক্তৃতা দেন। এগুলো হল প্রধান প্রধান কারণ।

এখন পরিনাম কি হবে তা ভাবছ ?

হ্যাঁ মৃত্যুদণ্ড।

সত্য কথা বলছি আমাদেরকে ছেড়ে দিলে কিছুই প্রকাশ করা হবে না। আপনাদের কাছে ক্ষমা ও জান ভিক্ষা চাচ্ছি।

জান দেয়া নেয়ার মালিক আমরা নই। কাজেই এদাবী প্রত্যংখান কর। আর অন্তিম সময়েে তোমাদের করনীয় কিছু থাকলে করতে পার।

আমাদের খোদা যীশু ক্রোশ বিদ্ধ হয়ে আত্ব দান করেছেন। সে হিসাবে আমরাও মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করতে চাই। আমরা যা করেছি তা দ্বীনের জন্যই করেছি ঈসা মসিহ তা অবশ্যই দেখেছেন। আপনাদের হাতে শহীদ হতে পারলে সব পাপের প্রায়চিত্ব হয়ে যাবে। এসব কথোপকথনের মধ্যে কমান্ডার সাহেব উজিরের দাড়ীতে ধরে হেচকা একটি টান দিতেই অর্ধ পাকা দাড়িগুলো হাতে এসে গেল এবং ছেট্র একঠি দুর পালস্নার ওয়ারলেছ ছিটকে পরল। আর গাড়ীর ভাঁজে-ভাঁজে পুরতে- পুরতে রয়েছে ছোট বড় অসংখ কাগজের টুকরা। এতে রয়েছে কাবুলের সামরীক ঘাটির নক্সা, বিশেষ বিশেষ স্থাপনার অবস্থান ও ম্যাপ। তা ছাড়া অনেক অনেক গোপনীয় ও খুটি নাটি বিষয়। যা বাহির মুলুকে প্রকাশ করলে রাষ্ট্রের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। এসব তথ্যাবলীতে পাগড়ী বুঝাই। মাথার চুল ধরে টান দিলে বেরিয়ে পরল জাম্বুরার মত টাককু মাথা।

কমান্ডার সাহেব এবার হযরত পীর সাহেব কেবলা কে প্রশ্ন করলেন, হুজুর আপনার প্রধান খলিফা, আল্লামাতুল দাহার অ বাহার, মাশায়েখ দের নয়ন মনি, আপনার গদীনশীন, বা স্থলাবিসিক্ত, আরেফে শয়তানের কর্ম-কান্ড ব্যপারে আপনার কাশফ এলহামের কেরামতীর মাধ্যমে কিছু জানতে চাই, বলুন ?

বাবা হাদীস শরীফে আছে, আখেরী জামানায় মানুষ মোমেন হিসাবে বের হবে ফিরবে বেঈমান হয়ে। অনেকে সারা জীবন ভাল ভাল কাজ করবে কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান হারা হয়ে মৃত্যু বরন করবে। আমার এমুরীদগুলোর অবস্থা তাই হয়েছে। এরা আগে খুব ভালই ছিল, এখন কোন বদ আমলের কারণে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে।

হুজুর আমল বরবাদ হয়ে গেলেও কি ঈমান বরবাদ হয়ে গেছে ?

আল্লাহ জানে তাদের ঈমানের অবস্থা কি ?

তাহলে এখানে আপনার কাশফ এলহাম কি মুখ থুবড়ে ধুলায় লুকিয়েছে না পাওয়ারই কমে গেছে। এরা তো জম্মলগ্ন থেকেই কাফির।

জাতিতে ঈসায়ী। মুসলমানদের জাত শত্রু। ঈমান থাকলে তো বেশী কমের প্রশ্ন। এদের তো ঈমানই নেই। শোনলেন না একটু আগে এরা কি বলেছে ?

ওরা ঈসায়ী থাকলেও তো আমার কাছে তওবা করে ছবক নিয়েছে তিন তছবী, বার তছবী, মোরকাবা,মোশাহেদার ছবক আদায় করেছে,তাহলে ?

আপনি যা বলেছেন তাতে ঈমান আনা বুঝাযায়নি। তাওবা করলে ঈমানদার হয় না। ওরা যা করেছে তা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য করেছে। এখন তাদের কাজ শেষ তাই আপনাকে বলি দিয়ে শেষ সওয়াব টুকু কামাই করে নিতে চাচ্ছে। হাদীয়া তুহফা বেশী বেশী দিলেই মনে করবেন না যে সে ফানা ফেসশাইখ বা ফানা ফিররাসুল হয়ে গেছে। আর সেই এক মাত্র খিলাফতের হক দার। কতগুলো বেঈমান, মুনাফিক ও দ্বীন বিদ্বেষি মানুষগুলোকে এক যুগ লালন পালন করেও বুঝতে পারেননি যে এরা কারা। এখন তাদের আচরনে ধরা পরেছে তো ? না এখনো বুঝতে পারেননি ?

হাঁ বাবা বুঝেছি। এবার খুব ভাল করেই বুঝেছি।

বলুন আপনার মুরীদদেরকে কি করা ?

বাবা এরা কতলের উপযুক্ত। এদেরকে কতল করে দিন। আমার সামনে না। আমি ঈমানদার। আলস্নাহ বলেছেন, কাফিরদের ধর, মজবুত করে বাঁধ, সময় থাকলে জুড়ায় জুড়ায় বানাও, ঠেংগাও সময় না থাকলে গর্দানে মার অর্থাৎ এক কুপে কল্লা জমিনে গিরায়ে দাও। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে কাফির জবাই করলে মুসলমানদের অন্তর ঠান্ডা হয়। হাদীয়ার ফান্ডা পান করে অন্তর ঠান্ডা না করে কাফির কেটে অন্তর ঠান্ডা করে দেখুন কত মজা,কত সাধ, কত লজ্জাত এতে। আল্লাহর কথার বাস্তবতা পরীক্ষা করুন। এবলে ধারালো খঞ্জর টি বেরিয়ে দিয়ে বললেন, এই নেন ছুড়া এর বুকে কলিজায় উপুর্য্য পুরী আঘাঁত করতে থাকুন। তার পর পাহারাদারটির হাত পা দেঁধে দিল। হুজুর প্রথমে কাঁপতে কাঁপতে বুকে খঞ্জর মারল। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ভিতরে ঢুকছে। কাপনের চুটে খুলতে পারলেন না। তার পর কমান্ডার সাহেব খঞ্জর খুলে হুজুরের হাতে ধরিয়ে নিজের হাত হুজুরে হাতের উপর রেখে পাযান্ডকে হত্যা করলেন। এ বার হুজর এক দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন, বাবা বাকিগুলো তোমরা সার। আমি দাড়িয়ে দেখি। তার

পর মায়মুনাকে বলল, বোন তুমি বাদ থাকবে কেন? তুমি একটি শেষ কর। তার পর গ্রাম্য ব্যক্তিটির হাত পা বেঁধে দিলে মায়মুনা তাকে শেষ করল। এ বদমাইশটাই মায়মুনার কাপড় খুলছিল।

তার পর কমান্ডার হুজুরকে লক্ষ করে বললেন, হুজুর আপনি এছেলে গুলোর বিরুধিতা করে ছিলেন। এখন এরাই হল আপনার বিপদ দিনের বন্ধু। তার পর হুজুর ও মায়মুনাকে পৌছে দিলেন মসজিদে। তখন রাত প্রায় শেষ। কমান্ডার সাহেব সবাইকে নিয়ে নামায পড়ে দুজনকে নিয়ে চলে গেলেন নাদির শাহের বাস ভবনে। নাদির শাহ দুজনের এক জনকেও চিললেন না। ইশারা দিয়ে সাবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দেখতো এদুজন লোককে চেন কি না ? সবাই না বলে উত্তর দিলেন। তার পর কমান্ডার সাহেব দুজনকে অন্য রুমে নিয়ে পূর্বের পোষাক পরিয়ে দরবারে আনলেন। এবার সকলেই উঠে তাজিম করতে লাগল। নাদির শাহ কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার সাথে যে দুজন ছিল তাদেরকে নিয়ে আসুন এবং ওদের কি আরজী তা নিজ মুখে দরবারে পেশ করুক। নাদির শাহের প্রশ্নের উত্তরে কমান্ডার সাহেব বললেন, সে দুজন ব্যক্তিই হল এদুজন। তারাই দেশের গুপ্ত হত্যার আসামী। যদি বিশ্বাস না হয় তবে মহাঁমান্য খতিব সাহেব ও তার মেয়ে মায়মুনাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুণা। অতঃপর উনাদেরকে দরবারে ডেকে সব কথা শোনলেন। সবাই আর্শ্চায্য হয়ে এদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কমান্ডার সাহেব আবার তাদের দাঁড়ি, বাবরী ও পাগড়ী খুলে নাদির শাহের দরবারে রাখলেন। তার পর পাগড়ীর ভাঁজে লুকানো কাগজের টুকরাগুলো বের করে দেখালেন। নাদির শাহ দাঁত কটমট করতে করতে জল্লাদকে হুকুম দিলেন প্রজাবৃন্দকে ডেকে প্রকাশ্য দরবারে তাদের কতল করতে। অতপর কাবুলের অলিতে গলিতে সংবাদ পৌছানো হল। বিকালে নেমে এল লক্ষ জনতার ঢল। তার পর বিকাল ৪ টায় নাদির শাহের হুকুম কার্য্যকরী করা হল। অর্থাৎ দুজনকে কতল করা হল।

নাদির শাহ এঘটনার পর তার যত সেনা ইউনিট ছিল তা নতুন করে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ জারি করেন। শুধু তাই নয়, অশ্বারোহী ,পদাতিক, গুলন্দাজ তীরন্দাজ, পুলিশ, আনসার সকলের উপরই এহুকুম জারী করেন। তাছাড়া গোয়েন্দা বিভাগকে আরো শক্তিশালী করার জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এবং দেশের সর্বত্র এধরনের মুনাফিকদের

খোঁজে বের করার জন্য এক সমন জারি করেন। মুনাফিকদের মাথার মূল্য ধার্য্য করেন এক লক্ষ আফগানী মুদ্রা। যারা এক জন মুনাফিক জিবীত বা মৃত্যু ধরে দিতে পারবে তাকেই এপুরুস্কারে ধন্য করা হবে। এতে সাধারণ নাগরীকদের সাহায্য সহায়তাও কামনা করেন। তার পর সারা দেশে তল্লাসি চালিয়ে ৩ মাসে ৭০ এর উপরে মুনাফিক পাকরাও করে প্রকাশ্য দরবারে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্য্যকরী করা হয়। এতে পুরা দেশটাই যেন শান্তির পারাবারে ভাসছিল।

একুশ

তিন মাস পর্যন্ত আমাকে ভূগর্ভস্ত কক্ষে একাকি থাকতে দিল। সেখানে নেই সাথী, নেই বাতি, নেই কথা বলার একটি লোক। নিঃসঙ্গ জীবন যে এত বেদনাদায়ক তা কোন দিন অনুভব করা তো দূরের কথা কল্পণাও করিনি। আজ আমাকে জ্যান্ত প্রশ্নথিত করা হল আঁধার কবরে। কঠিন কবরের বাস্তব অবস্থার নমুনা আমার একক্ষ। তিন দিন পর সামান্য কিছু খাবার দিয়ে যায় আর করে টর্চারিং। যতগুলো টিম আসল সকলেরই কমন প্রশ্ন আমি খোবায়েবকে চিনি নাকি। তাকে কোন দিন দেখেছি কি না আমি কোন গ্রুপের মুজাহিদ, গোয়েন্দা হত্যা সম্পর্কে আমি কি জানি ? আমি না বলে সব উত্তর দিয়েছি। কখনো কখনো প্রহার করে বেহুশ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যেত। আপনা আপনি হুস ফিরে এলে শরীরে বেদনা অনুভব করে বুঝে নিতাম আমাকে পিটানো হয়েছে।

তিন মাস পর আমাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে অন্য এক স্থানে। আনুমানিক এখান থেকে ৪০/ ৫০ কিলোমিটার দূরে। সে খানে দ্বীতল বিশিষ্ট একটি ভবণ তার নিচ তলায় হিংস্র কুকুরের ফার্ম। কুকুরগুলো দেড় ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট উচুঁ। এককে টাকে বাঘের মত দেখায়। কুকুরগুলোকে এত বড় করেছে মুসলমানের গোস্ত খাওয়ায়ে। লোক মুখে শ্রুত, প্রতিদিন এদেরকে দু'থেকে তিনটি মানুষ খাওয়ানো হয়। কুকুরের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫টি। চার দিকে শুধু মোটা রডের গিরিল। গেইট খুলার জন্য যখন গেইটের নিকটে গেল, তখন এক যুগে হা করে সবগুলো কুকুর গেইটের নিকটে এসে গেল। ওরা বুঝতে পেরেছে তাদের খাবার নিয়ে আসছে। পাষন্ডরা গেইট খুলে কয়েক জনে ধাক্কায়ে গেইটের ভিতর ঢুকায়ে

গেইট বন্ধ করে দিল। আমি হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালাম, প্রভু হে আমি তোমার গোনাহগার বান্দা। আমার পাপের সীমা নেই, তুমি রাহমান, রাহিম, স ত্তার, গাফফার। তোমার এসিফাত গোলোর উপরও আমি পূর্ণ ঈমান এনেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর রহমত না যিল কর। তোমার এক্ষুধার্ত মাখলুকগুলোর রিজিক বানাইও না। আমাকে তাদের গ্রাস না বানিয়েও তুমি তাদের জঠর জ্বালা নিবারন করতে পার। অতএব আমার এবিপদ মুহুর্তে তোমার কুদরতের এযাহার দেখতে চাই। প্রভু হে আমি নালায়েক তো তোমার পরীক্ষার উপযুক্ত হইনি। তাহলে কেন পরীক্ষা নিচ্ছ ? যখন পরীক্ষা নিতেছই তখন তোমার কুদরত দ্বারা পাশ করায়ে নিও। আমীন।

ফার্মের ভিতরে প্রবেশের আগে কুকুরগুলোর যে অবস্থা দেখে ছিলাম তাতে মনে করছিলাম যে, এক্ষুধার্ত কুকুর গুলো ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথে ছিড়ে-ফেড়ে খেয়ে ফেলবে। ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথে কুকুর গুলো আমার থেকে সরে দাঁড়াল। মোনাজাতের সময় কুকুরগুলোর মনে হয় আমীন আমীন বলছিল। ওরা এক মায়াবী লোচনে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। ওরাও যেন আমার ব্যথায় ব্যথিত, আমার চিন্তায় চিন্তিত, আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে সমবেদনা প্রকাশ করছিল।

দর্শকরা গিরিলের চার পার্শ্বে দাঁড়ি হাত তালি দিয়ে কেহবা সিস দিয়ে, কেওবা হৈ হোল্লার মাধ্যমে আনন্দ ফুর্তি করতে লাগল। ভুভুক্ষ কুকুর দল আমাকে কিভাবে ছিড়ে ফেড়ে খাবে সে দৃশ্য দেখার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু নিমিষের মধ্যে তাদের আশায় ছাই পড়ে গেল। হাত তালী কলরোল স্থিমিত হয়ে এল। এবার তারা বিস্বয়ে নেত্রে তাকাতে লাগল। একে অপরের কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলছিল। আল্লাহ যে আমার প্রর্থানা কবুল করেছেন সে জন্য তায়ম্মুম করে কয়েক রাকাত শুকরানার নামায আদায় করলাম।

লোকমুখে শ্রুতঃ যেদিন কুকুরের খাদ্যের জন্য মানুষ না দিতে পারে সে দিন ৫/ ৭ টা জ্যান্ত বকরী বা দুম্বা এনে ছেড়ে দেয় ওরা ছিড়ে ফেরে খায়। আমাকে যে দিন ঢুকাল সে দিন ৩ টি জ্যান্ত বকরী এনে নিক্ষেপ করল কুকুরের খোয়ারে। বকরী গুলো জিব বের করে বে বে করে চিৎকার দিতে

দিতে অসহায়ের মত আমার চার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতেছিল। কিন্তু একটি বকরিকে ও ওরা ভক্ষণ করেনি। এসংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পরল চারদিকে। দলে দলে লোক জন এসে নিজ চোখে দেখতে লাগল। উক্ত জেলার ডি,সি, কুকুলার্ড স্কোন্ডের নিকট এসংবাদ পৌছলে কয়েক গাড়ী পুলিশ নিয়ে উক্ত ফার্ম পরিদর্শনে আসল। ডি, সি, এবিষয়টি নিজে তদন্ত করে এমনটি হওয়ার কোন কারণ খোজে পেলেন না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন। তিন দিন পর আবার তিনি দেখতে এলেন। এদিন এসে দেখলেন প্রায় ১০/১৫ টি ছাগল ও দুম্বা অক্ষত রয়ে গেছে, একটি ও ভক্ষণ করেনি। তিনি আরো বেশী আশ্চর্য্য হলেন। তিনি জনে জনে জিজ্ঞাসা করছেন কুকুরগুলো আগে কি পরিমান খাবার খেত। খাবারের সময় কি করত ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর তিনি জেলা পশু চিকিৎসককে ডেকে এনে কুকুর গুলোকে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। ডাক্তার টিম যত ধরনের পরীক্ষা আছে বস ধরনের পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন যে ,কুকুর গুলোর খাবার চাহিদা প্রচুর। হযম শক্তি ও রয়েছে বেশ, রুচি তাদের বিকৃত হয়নি। কেন যে ওরা খাচ্ছে না তার কারণ বুঝতে পারেনি। পর পর কয়েকটি ডাক্তার টিমের রিপোর্টি একই ধরনের।

অতঃপর ডি,সি,ফার্ম পরিচালক কর্মকর্তা কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ ৪ দিনে কয়েদিকে খাবারের জন্য কি কি দেয়া হচ্ছে ? কর্ম কর্তা বলেন কিছুই দেয়া হয়নি। তার পর ডিসি গোস্ত,রুটি,পানীর ও প্রচুর ফলমূল এনে আমাকে খেতে দিলেন। আমি আমার রুটি কয়টা ছিড়ে কুকুর গুলোকে দিয়ে দিলাম। কুকুর লাফা লাফি করে মনের আনন্দে রুটির টুকরা গুলো খেল। ডিসি আরো রুটি এনে দিলে আমি তা উদর পূর্ন করে খেয়ে পানি পান করলাম বাকি রুটিগুলো কুকুরকে দিয়ে দিলাম। তার পর কুকুর গুলো কয়েকটা বকরী ধরে ছিড়ে ফেড়ে খেল। এবার সকলেরই ধারণা হল যে আমাকে উপোষ রেখে কুকুরগুলো আহার করে না। এভাবে কয়েকবার পরীক্ষার পর এটাই প্রমান হলযে আমাকে ছাড়া কুকুররা আহার করে না।

এভাবে ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ডি.সি আমাকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় জেল খানায়। ঢুকিয়ে দিলেন সাপের সেলে। একেকটা বড় বড় আজদাহা। আস্তা মানুষ গিলে ফেলে। কত শত মানুষযে এসব আজদাহারা

গিলে খেয়েছে তার কোন হিসাব নেই। একবার তাকালে শরীরে কম্পন আরম্ভ হয়ে যায়। আমাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ডি,সি চলে আসেন। আমি আমার মাওলাকে করুন সুরে ডাকতে লাগলাম। আমি কেঁদে কেঁদে আলস্নাহ দরবারে দোয়া করতে লাগলাম এবলে যে হে আল্লাহ আপনি আমার প্রভু আপনিই আমার রক্ষাকর্তা সারা দুনিয়ার মানুষ যদি আমাকে ধ্বংস করতে চায় আর আপনার মর্জি যদি না থাকে তবে পারবে না। আর আপনি যদি ধ্বংশ করতে চান তবে সমস্ত মাখলুক মিলে যদি আমাকে রক্ষা করতে চায় তাহলে ও পারবে না । মাওলাগো তুমি আমাকে যে অবস্থায় যতদিন যে খানে রাখ, তত দিন সে অবস্থায় সেখানে থাকব। কিন্তু আপনি আমায় ভুলে যাবেন না। আপনি আমার যদি সাথী হয়ে যান তবে, পাহাড়, পর্ববত, গিরি কন্দর, মরম্ন বিয়াবান, সাগর-মহাসাগর এমন কি জাহান্নামেও যেতে তৈরী আছি। আর যদি আপনাকে ছাড়া জান্নাতেও যাই, সেখানে রাখেন তবু আপনাকে ছাড়া আমার ভাল লাগবে না। আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। অতএব, আপনি আমার সারা জীবনের ইহকাল ও পরকালের বন্ধু হয়ে যান। মাওলাগো আপনি আমার সঙ্গী হলে আমাকে যেখানেই রাখুক আমি কোন পরোয়া করি না।

এমনভাবে দোয়া করে আমি আমার চোখ দুটি বন্দ করে নফি এছবাতের জিকির অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাললাহ। লাইলাহা ইল্লাললাহ। জিকির আরম্ভ করলাম আমার মনে হচ্ছিল জেল খানার প্রতিটি বালুকনা জিকির করতে লাগল। সেলের সাপগুলোও তার ভাষায় মাওলা পাকের জিকির আরম্ভ করল। এ ভাবে সাপের সেলে কাঠিয়ে দিলাম জীবননের ৩টি দিন।

তিন দিন পর ডিসি এসে দরজা খুলে দেখলেন আমি এক পার্শ্বের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে মনের আনন্দে উচ্চ সুরে গেয়ে যাচ্ছি. লাইলাহা ইল্লাললাহ লাইলাহা, আল্লাললাহ লা মা' বুদা ইল্লাললাহ লা মাশুকা আল্লাললাহ লাইলাহা ইল্লাললাহ লা নাজিরা ইল্লাললাহ লাইলাহা ইল্লাললাহ ।

আমার জিকিরের তালে তালে সাপগুলো এক কোনে জড় হয়ে দুলতে ছিল। অবশেষে জেলার ও ডিসি আমাকে বের করে জিজ্ঞাসা করলেন. হে যুবক তোমার নাম কি ? উত্তরেবললাম, ইল্লাললাহ

তুমি আমাদের কাছে কি চাও ? উত্তর ইল্লাললাহ।

তোমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে ? উত্তর ইল্লাললাহ।

তুমি কি পাগল ? উত্তরঃ ইল্লাললাহ

তোমাকে মেরে ফেলাহবে উত্তরঃ ইল্লাললাহ

সে সময় আমার প্রতিটি শিরায়, উপশিরায়, রগ রেশায় ও প্রতিটি ধমনিতে ধমনিতে অনুরনিত হচ্ছিল ইল্লাললাহ। চার দিক থেকে একই রব, একই আওয়াজ লাইলাহা ইল্লাললাহ এদিকে কারাগারের প্রতিটি রুমে রুমে সেলে সেলে একটি সংবাদ পৌছে গেল যে, একজন আল্লাহ প্রেমিক, তরুন, মজজুব জেলখানায় আনা হচ্ছে তাকে, বাঘে খায়না, কুকুরে ধরেনা, ইত্যাদী। তখন সে সব সেলের কয়েদিরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন এক নজর দেখার জন্য।

ডি,সি ও জেলার আমাকে প্রেরণ করলেন জাবৎজীবন সাজা প্রাপ্ত কয়েদিদের সেলে। আর আমার জন্য ধৈর্য্য করলেন তিন বেলা রুচী সম্মত ও পুষ্টি কর খানা। আমাকে দেখার জন্য হুরা হুরি, গুরা গুরী,করে অনেক লোক এসে ভীর জমাল। তখন ডি,সি, ও জেলার আমার পশ্চাতে দাড়িয়ে আমাদের মিলন দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। সবাই সালাম, মোসাফাহা মোয়ানাকা করতে লাগলেন। সাবাই দোয়ার জন্য আবেদন জানালেন।

আমি সবগুলো সেল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আহা এ কারাগারে হতভাগা মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতির ঠাই নেই। কত নিরপরাধ, নিরিহ মানুষ বছরের পর বছর নিষ্টুর কারাগারের অন্ধকার প্রকুষ্ঠে ধুকে ধুকে মরছে। সেখানে রয়েছে বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেম, হাঁফেজ, ক্বারী, মুফতী মুহাদ্দীস আরো কত শত নেককার দ্বীন দ্বার, পরহেজ গার উম্মত। তাদের অপরাধ শুধু একটিই তা মুসলমান। তারা মানুষের মতবাদে বিশ্বাসী নয়। তারা কমিউনিজম মানে না। তাদের মধ্যে মুজাহিদ, কেউ জিহাদের কথা বলত, কেউ জিহাদে আর্থিক সহায়তা করত। কেউ মুজাহিদের আশ্রয় দিত। কারো ভাই, কারো ছেলে মুজাহিদ ছিল। কেউ মুজাহিদের সাথে পরিচয় ছিল, কারো ছিল অনেক দূর থেকে আত্বিয়। কারাগারে আসার জন্য এগুলো ছিল তাদের অপরাধ। নাতি জিহাদ করার কারনে অন্য কাউকে না পেয়ে ১২২ বৎসর বয়স্ক তার দাদাকে ধরে নিয়ে এসেছে। জেল খানায় থাকতে থাকতে পিঠ কুঁজু হয়ে গেছে। চোখের ভ্রু সাদা হয়ে গেছে চোখের জ্যোতি বিদায় নিয়েছে। দাঁত তাকে রেখে চলে গেছে। এমন বুড়ুর সংখ্যা এবং এধরনের অপরাধির সংখ্যা নগন্য নয়। এমন অনেক মহিলাদের কেও দেখেছি নিষ্ঠুর জিন্দান খানায়। কারণ চোখ তুলে

নিয়েছে ,কারো কান কেটে দিয়েছে। কারো দুহাত কেটে ফেলেছে, কারো পা ভেঙ্গে দিয়েছে, কারো মস্তক বিগড়ে দিয়েছে, এর কোন হিসাব নেই। নারী পুরন্নষ, যুবক যুবতীর একই ধরনের পোষাক, গায়ে হাফ শার্ট আর পরনে হাফপেন্ট একটি কম্বল, একটি বাটি আর একটি বাসন। এহল তাদের ছামানা। রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী কয়েদিরা প্রতি দিন গোসল করার, সপ্তাহে একদিন কাপড় কাচার সুযোগ সুবিধা ভোগ কবে কিন্তু তারা পানির অভাবে ১৫ দিনেও একদিন গোসলের সুযোগ পায়না অর্থাৎ পানি দেয়না। ওরা কোন দিন জেল খানায় একটি সাবান দেয়নি। শরীরের পঁচা গন্ধে কারো কাছে যাওয়া যায় না। হায়রে কমিউ নিজম, হায়রে সম অধিকার

জেলখানায় যারা বেশী অসুস্থ হয়ে যায় তাদেরকে জবাই করে বা জ্যান্ত ধরে নিয়ে যায় চিড়িয়া খানায়। নিক্ষেপ করে বাঘের খোয়ারে। এহল লেনিন, ষ্টালিন, কালকামার্ক্স আর মাওসেতুং এর কমিউনিজম। এসব নির্মম,নিষ্ঠুর আচরনের কথা ভাবতেও অবাক লাগে এসব কয়েদিদের মধ্যে ৪/৫ জন কয়েদিকে পেলাম তারা আনোয়ার পাশার সহযুদ্ধা ছিলেন। তাদের থেকে মাঝে মধ্যে জিহাদের চমক প্রদ কাহিনী আর খোদায়ী নুসরত শোনে দিলে শান্তি পেতাম। এদের মধ্যে এক জন বললেন, আমাদের প্রিয় কমান্ডার শহীদ আনোয়ার পাশা (রহঃ) ছাড়াও এক জন মুজাহিদ ছিলেন। নাম তার খুবায়েব তিনি জিহাদের ময়দানেই শাদী করেছিলেন ছায়েমা নাম্মী এক বীর বালাকে। তাঁর ঘটনাগুলো খুবই আর্শ্চায্য জনক। তিনি আনোয়ার পাশার সথে সাক্ষাৎ করতে এবং তার দলে ভর্তি হয়ে জিহাদ করতে অনেক কষ্ট করেছিলেন কিন্তু ১ দিন ব্যবধানে সাক্ষাত হলনা। তিনি কুকান্দুজে আমাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সে যুদ্ধে তাঁর প্রিয়তমা বিবি ছায়েমা শাহাদাত বরন করেন। সে বীর পুরুষ এখনো জিবীত আছেন কি না তা আল্লাহ জানেন কিন্তু সরকার এখনো তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খোবায়েবের চেহারার সাথে আপনার চেহারার অনেকটা মিল রয়েছে। আমি বললাম, যার কথা বলছেন সে আমার ভাই তাই তার জন্য দীর্ঘ হায়াত এবং সে যেন জিহাদ করতে পারে সে জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন।

এক দিন জেল খানার সাথীদের একত্র করে বলতেছিলাম হে আমার যাবৎ জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ভাই ও বোনেরা আমরা চোরী, ডাকাতী, করে জেলে আসি নি। আমরা আল্লাহর একটি ফরয বিধান কে পালন

করতে গিয়ে এখানে এসেছি। এটা আমাদের ঈমানের পরীক্ষা হল। পরীক্ষায় যদি আমরা ফেল করি তা হলে আমাদের সব কিছুই বরবাদ হয়ে যাবে। এত কষ্ঠ মুসাককাত সবই বৃথা যাবে। সাবধান ! সাবধান ! যে কোন মূল্যে আমাদেরকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। তা নাহয় আমাদেরকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। কাজেই আপনারা যত কষ্টই করুন্নন না কেন জাহান্নামের কষ্টের তুলনায় এগুলো কোন কষ্টই না, বরং ফুল বাগান। সাবধান ! সাবধান ! আল্লাহকে বিন্দুমাত্র দোষারুপ করবেন না। ঈমানের ঘাটতি যেন না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। হে আমার ভাই ও বোনেরা আল্লাহর জিকির ছাড়া একটি শ্বাস নিশ্বাস যেন না ফেলেন। আল্লাহর জিকিরকে বর্ম বানিয়ে নিন, কোন নির্যাতনই আপনাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। যে দিন আল্লাহ এ অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্তি দান করবেন সে দিনে জেল খানার গেইট থেকেই নারা দিতে দিতে সামনে এগিয়ে যাবেন। সেদিন যেন আমাদের শ্লোগান হয় সাবিলুনা, সাবিলুনা-------আল জিহাদ, আল জিহাদ। তারিকুনা,তারিকুনা-------- আল জিহাদ, আল জিহাদ। আজ হামারি একহি কাম--------এন্তেকাম, এন্তেকাম। উক্ত জেলখানায় এক বৎসর কাটানোর পর আমাকে ও মুজাহিদ আজিম ভাইকে সুদুর সাইবেরিয়ার বরফাঞ্চলে প্রেরন করা হল।

বাইশ

শরনার্থী শিবিরে যে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ হত তা প্রশাসনের চাপের মুখে বন্ধ হয়ে গেল। শরনার্থীদের জন্য যে সব সাহায্য বরাদ্ধ দেয়া হয়েছিল তাও অনেকটা কমে গেল। উজিরে খারেজা সু-কৌশলে নাদির শাহের রিলিফ দেয়া হ্রাস করে দিল। খাদ্য চিকিৎসা, ও তাঁবুর অভাবে অনেক পরিবার অতি কষ্টে দিন যাপন করতে লাগল।

মার্কাজের ভারপ্রাপ্ত জিম্মাদার মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী জায়গা তালাশ করার জন্য যে দুজন মুজাহিদকে উজবেকিস্তানে পাঠিয়ে ছিলেন, তারা প্রায় এক মাস পর ফিরে এসে বলল আমারা উজবেকিস্তানের ও

তাজিকিস্তানের পাহাড় জঙ্গল তন্ন তন্ন করে তালাশ করেছি। তালাশ করেছি কিরগিজিয়া, ফ্রাঞ্জে, আনডিজাহান, দুসানবে, বোখারা, টোরটকোল, তাসকন্দ সহ আরো অনেক অঞ্চলে কিন্তু নিরাপদ স্থানের যথেষ্ট অভাব। সারা দেশের আনাচে কানাচে, পাহাড়ে জঙ্গলে অসংখ্য সেনা ছাউনি স্থাপন করেছে। প্রতিটা চেক পোষ্ট বা ছাউনিতে ২০ থেকে ৩০ জন সেনা ভারি ভারি অস্ত্র দিয়ে মোতায়ন করেছে। সপ্তাহে দু এক বার ক্রেকডাউন লাগিয়ে এ্যাম্বুশ বসায়ে অভিযান চালাচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে চলছে চিরুনী অভিযান তবে কিরগিজিয়া ও তাসকন্দ এর মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকার পাহাড়গুলো এসব জান্ত্য থেকে অনেকটা মুক্ত। সেখানে কয়েকটি পাহাড় দেখেছি, এর মধ্যে মারবানিয়া পাহাড়টি খুবই সুন্দর, খুবই মনোরম। তার আশ পাশের পাহাড়গুলো মারদানিয়া, মারবেলিয়া ও মাদাসিকো। সবগুলোতেই মুর্চা তৈরী করতে পারব। তবে মারবানিয়া পাহাড়টি অন্যান্ন পাহাড় থেকে একটু নিচু। এর চারদিকে রয়েছে নির্ঝরিণী। ঢালে ঢালে রয়েছে ফলমুলের গাছ। এফল মুলগুলো কোন মালিকাধিন নয়। কুদরতী ভাবেই এগুলোর জন্ম। চার দিকে সবুজের মাতামাতি। ফলমুল খেয়েও থাকা যাবে বহু দিন। পাহাড়ের কিছু অংশ পরেছে কিরগিজিয়ায় আর বাকি অংশ তাজিকিস্তানে।

আশ পাশে নেই গ্রাম,বস্তি, নেই হাট বাজার নেই রাস্তা ঘাট। সে সব পাহাড়ে নেই লোকের যাতায়াত। পাহাড় থেকে পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত তাসকন্দ। নিকটতম যে বাজার রয়েছে তার দুরত্ব হবে আনুমানিক ২০ মাইল। সেখান থেকে আমরা মাসে এক থেকে দুটি হামলা করতে পারব। ৪ দিনের প্রোগ্রাম নিয়ে বের হলে একটি হামলা করা যাবে। কোন কোন সময় মালামাল আনা নেয়ার জন্য কিরগিজিয় সীমান্ত নদী ব্যবহার করতে পারব। এখন চিন্তা করুন কি করা যায়।

সাত্তার বলখী সাথীদের বললেন, প্রিয় ভায়েরা আমরা এদিক দিয়ে কিছুতেই হামলা পরিচালনা করতে পারব না কারণ এখানে রয়েছে আমাদের শরনার্থী শিবির। এখান থেকে হামলা করলে দুশমনরা শরনার্থী শিবিরে পঙ্গপালের মত ঝাপিয়ে পরে সব লন্ড-ভন্ড করে দেবে। তা ছাড়া আফগান সরকারের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আবার এপারে ওপারে সেনা মোতায়ন করেছে খুব বেশী। এসব দিক নিয়ে চিন্তা করলে আমার দিলে সাক্ষ্য দেয় আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে মারবানিয়ায় চলে যাই। ভাই

গো ! আমরাতো দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য সৃষ্টি হই নাই। দ্বীন গালেবের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। গোলাগুলোর শব্দ আমাদের বাদ্য যন্ত্র আর আল্লাহর জিকির হল আমাদের গান। বারূদের গন্ধ আমাদের মেশক আম্বর। অনিদ্রা-অনাহার আমাদের নিত্য দিনের সাথী। দুঃখ, কষ্ট, আমাদের বাহন। শাহাদাত আমাদের পথ আর জান্নাত আমাদের বাসস্থান। তাছাড়া দিলের মধ্যে যা আছে সে গুলোকে কতল করে মাটি চাপা দিয়ে দাও।

প্রিয় বন্ধুরা ইসলাম যখন বিজিত হবে। কিল্লায় কিল্লায় আর তোরণে তোরণে যখন কালিমা খচিত ঝান্ডা পত পত করে উড়বে, মা-বোনরা যখন ইজ্জত নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরে যাবে এবং আবাস ভূমি ফিরে পাবে সে দিন আমাদের আনন্দ দেখবে কে ? সে দিন আমাদের মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠবে।

হে আমার প্রিয় সাথীরা ! আপনারা যদি দিধাদন্ধের উর্দ্ধে থেকে শতস্ফুর্তভাবে সমর্থন করেন তাহলে দু এক দিনের মধ্যে কাফেলা রওয়ানা করব। এখন আপনারা আমাদের স্বঠিক পরামর্শ দিন, তার পর এস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহর ইংঙ্গিত অনুস্বরণ করব। বলখী সাহেবের বয়ানের পর আর কারো কোন প্রশ্ন রইল না। সকলেই হাসিমুখে বললেন আমরা সব ভাই ইনসাল্লাহ তৈয়ার আছি। যখন বলবেন, তখনই লাব্বাইক। এক পা পিছু হটব না। আমাদেরকে বলুন কবে যেতে হবে ? বলখী একটু চিন্তা করে বললেন, আমরা আগামী সোমবার এশার নামায পরে এখান থেকে মোবারক জিহাদে চলে যাব। ইনশা আল্লাহ।

মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী শরনার্থী শিবিরের লোকজনকে ডেকে বললেন, প্রিয় দেশবাসী ! আমরা অসহায়, মজলুম, আমরা আজ-সর্বহারা কিন্তু আলস্নাহ হারা নই। জালেমরা আমদের কে ভিটে মাটি থেকে উৎক্ষাত করেছে। কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত ধন দৌলত। তাদের বুলেটে কেড়ে নিছে আমার কলিজার টুকরা সন্তানদের,কেড়ে নিয়েছে পিতা,মাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনদের । আমাদের একটি মাত্র অপরাধ আমরা তাদের চেপেদেয়া কুফুরী মতবাদ মানতে পারেনি। যারা তাদের বুলেটের ভয়ে, সম্পদের লুভে বিক্রি করে দিয়েছে অমুল্য সম্পদ ঈমানকে, তারা আজ আমাদের শত্রু এবং তাদের বন্ধু হয়ে কাজ করছে। প্রিয় দেশবাসী আমরা কষ্ট করেছি, সব হারিয়েছি তবু বাতিলের কাছে পরাজয় বরন করিনি বা মাথা নত করিনি। ইতিহাস আমাদেরকে স্বরণ

করবে মজলুম হিসাবে আর তাদেরকে স্মরণ করবে কাপুরুষ ও মুনাফিক হিসাবে। কাজেই আমরা চির উন্নত মমশীর।

প্রিয় রিপুজী ভাই ও বোনেরা হিজরত করার পর থেকে আমরা আজ পর্যন্ত আপনাদের সাথেই বসবাস করেছি। অনেকেই আমরা অনেককে চিনতাম না,জানতাম না। প্রবাসী জীবনে আমরা হয়েছি চিনা পরিচয়। আমাদের মাঝে গড়ে উঠেছে এক ঐক্যের বন্ধন। প্রবাসী জীবনে এসে আমরা একে অপরের দুঃখে কাদতে শিখেছি। যদিও আমরা বিভিন্ন খান্দান বিভিন্ন কবিলা ও বিভিন্ন গোত্রের লোক, কিন্তু আমরা মুসলমান। এ সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না।

প্রিয় প্রবাসী ভাই ও বোনেরা। প্রবাসী জীবনে বড়রা আমাদেরকে পুস্নেহে সাদর সম্ভাসন জানিয়েছেন কেউ দিয়েছেন ভাই এর মর্যাদা, কেউ দিয়েছেন বন্ধুর মর্যাদা। অনেকে আমাদেরকে দিয়েছেন আদর, স্নেহ মায়া মমতা। কেহ নযরানা হিসাবে দিয়েছে গাল ভরা মিষ্টি মধুর হাসি। কেহ কেউ সাহস, বল আর হিম্মত দিয়ে আমাদেরকে আগে বারতে সহায়তা করেছেন। আবার কেউ কেউ অতিতের স্মৃতি বিজড়িত দিন গুলো স্বরন করিয়ে অতিত গর্ব ধরেরাখার পথ সুগম করেছেন ও অনুপ্রানিত করেছেন।

হে আমার প্রাণ প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা আমরা মুসলমান। আমাদের অধ্যায়ে নেই পরাধিনতা আর পরাজয়ের কালিমা। আমাদের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। আমাদের বিজিত তাজি ঘোড়া জাপান থেকে ইউরোপের পশ্চিম সীমার নদ-নদী আর মহা সমুদ্রের পানি পান করেছে। দক্ষিণে আর্জেন্টিনার ভিয়ামোন্টের দ্বীপপুঞ্জ,দক্ষিণ আফ্রিকার পোট এলিজাবেথ ও অষ্ট্রেলিয়ার মেলবর্ণ আর উওরে কানাডার ভিক্টোরিয়া, গ্রীনলেন্ডের ডেনমার্ক,সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং নোভা জেম্বলিয়ার ও কাজাচি পর্যন্ত আমাদের ঘোরসাওয়ার আর রনতরী পৌছেছে। আফ্রিকার গহীন অরন্যের লতা পাতা আমাদের ঘোড় গুলো খেয়েছে। আমরা বিশ্বজয়ী বীর কাফেলার গর্বিত সন্তান। মুসলিম মায়েরা কাপুরুষ সন্তান প্রসব করে না।

হে আমার ভাই ও বোনেরা ! আজ আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই. এযুগে এসে আমরা আমাদের গৌরবগাঁথা ইতিহাসকে ভুলতে বসেছি আমাদের আদর্শ থেকে আমরা লক্ষ কোটি মাইল দুরে সরে পরেছি বাদশার জাতি হয়ে কান কাটা গোলামের জাতিতে পরিণত হয়েছি।

ওহে মুসলিম নামের কলংক এযুগের যুবকেরা তোমরা নবীর আদর্শকে ছেড়ে দিয়ে ইউরোপিয়ানদের সভ্যতার চর্চায় মেতে উঠেছ। আমেরিকা, জাপানের মসৃণ কাপড় পরে গর্ববোধ করছ। ছিঃ ছিঃ তোমার পোষাককে সবাই ধিক্কার দিচ্ছে। মোটা কাপড়ের উর্দি পরতে শিখনি তুমি। কোথায় শীরস্ত্রাণ আর কোথায় তোমার তীরভূণীর ? তবু তুমি তোমাকে মুসলমান বলে দাবী করছ। তোমার মুসলমানিত্ব দেখে শয়তান পর্যন্ত খিল খিল করে হেসে বেড়ায়।

ওহে, মুহিউস সুন্নার দাবীদার উম্মতেরা তোমার নবীর আনিত দ্বীন, নবীর রক্তে রঞ্জিত দ্বীন তোমার সামনে পরাজিত, তবু তুমি কাঁদলে না দ্বীনের ঝান্ডাবুলন্দ করতে একটি বার এগিয়ে এলে না। ওহে সুন্নত জিন্দাকারী ধোকাবাজ উম্মতেরা তোমরা কি দেখনি একজন উম্মতের জন্য নবী সহ ১৪শ সাহাবা মওতের জন্য তৈরী হত ? তোমার চোখে কি ভাসে না নবী ওহুদ, বদর, হুনাইনের ময়দানে বুক টান করে কাফিরদের সাথে লড়তে। তুমি কি দেখনি নবীকে অস্ত্র নিয়ে নামায পড়তে ? দেখনি কি তোমার নবীকে বদর প্রান্তরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুহাত তুলে দোয়া করতে আর সেজদায় লুটি পরতে। তুমি কি দেখনি তোমার নবীকে প্রচন্ড লড়াইয়ের ময়দানে দাড়িয়ে ফিল্ট মার্শালসেজে কমান্ড দিতে। রনসাজে সুসজ্জিত হয়ে জিহাদের ময়দানে ছুটা-ছুটি করতে?

ওহে আশেকে রাসুল আর মুহিউসসুন্নার মিথ্যা ধোকাবাজ ও ভন্ড দাবীদাররা ! তোমরা কি শুধু নবীর তছবিহ, পাগড়ী আর লম্বা জামাটুকু নিয়েই সুন্নত জিন্দা করার শেস্নাগানে আত্বতৃপ্ত হচ্ছ ? তুমি দেখনি নবীকে দ্বীনের জন্য প্রস্তরাঘাত খেতে ? দেখনি তার দাঁত ভাঙ্গতে। দেখনি পবিত্র মস্তকে শিরস্ত্রণের লৌহ শলাকা বিদ্ধ হয়ে রক্তে জামা কাপড় রঞ্জিত হতে ? দেখনি নবীকে দিনের পর দিন উপবাস থেকে পেটে পাথর বাঁধতে ? তুমি কি দেখেছ কভু আমার নবীকে দামী কাপড়ে দেহ মুবারক আচ্ছাদিত করতে। শোনেছ কি কোন দিন নবী তোমার মত জাজিম আর তুষকে শোয়ে আরাম করতে ? দেখেছ কি কোন দিন নরম বালিশ শিয়রে দিয়ে আর কুল বালিশ বুকে জড়ায়ে ঘুমাতে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

তাবিজ, কবজ, পানি,পড়া সুতা পড়া, খেঁতা পড়ার জন্য লোকে ভীর জমায় দেখে তুমি তোমাকে বড় পীর মনে করে আত্ব তৃপ্তি লাভ করছ।

আসলে তুমি ধোকাবাজ দান্দাবাজ, মিথ্যুক, ভন্ড কবিরাজ। তোমরাই আকাবিরে দ্বীনের কলংক। তুমি নতুন করে অধ্যায়ন কর উলামায়ে দেওবন্দের ইতিহাস। অধ্যায়ন কর চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকার বুজুর্গদের ইতি কথা।

কাফির, বেঈমানরা কোনদিন নবীজিকে ভাল চোখে দেখেনি। তাই মুসলমান দেরকে বরদাস্ত করতে পারে না, ভয় পায়। আর তোমাকে কাফেররা ভালবাসে, নিমন্ত্রণ জানায় পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রে যেতে চাইলে ভিসা দেয়। আর আমাদেরকে আমাদের দেশে থাকতে দেয় না, পৃথিবীর সব দেশের ভিসার দরজা আমাদের জন্য বন্ধ এমন কি হজব্রত পালন করতেও দিচ্ছে না। তাহলে তুমি এমন কি মারেফত হাছেল করেছ যার ফলে কাফিররাও তোমাকে স্বাদর সম্ভাষণ জানায় তোমাকে ভয় করে না। নবীকে ভয় করত। ভালবাসত না। আর তোমাকে ভয় করে না, ভালবাসে। এব্যাপারটা একবার ভেবে দেখছ কি ? হাঁ আজীবন ভেবে তোমারা তার সমাধান পাবে না। তোমরা মনে করবে আল্লাহ আমাকে ভাল বাসে তাই কাফিররাও ভালবাসে। এটাকে তোমরা বুর্জুগী হিস্বাবে ধরে নিবে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তুমি ওয়াজ কর যে, আমি আপনাদের এখানে দ্বীনের জন্য হিজরত করেছি। তাকবিরে উলার সাথে জামাতে নামাজ পড়ব ও জিকির আজকার করব। আপনারা যদি আমাকে মুরগীর রান, খাসির মাথা, গরুর সীনা আর কলিজা খেতে দেন তবে মদীনার আনসারদের নুসরাতের সোয়াব পাবেন। হে ধোকাবাজ হিজরত আর নুসরত কাকে বলে তা উলামায়ে হকের নিকট জেনে নাও। হাঁ তোমাদের আরাম আয়েশ, দাওয়াত হাদীয়া ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন এতেরাজ নেই। নেই কোন অভিযোগ। আল্লাহর দ্বীন যদি দুনিয়াতে গালেব থাকত, তবে এর চেয়ে বেশী আরাম করাতে কোন দোষের কারণ ছিল না। কাফিররা দ্বীনের খাজানা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আর তুমি সামান্য কয়টা আমল,নিয়ে বুজুর্গ সেজে বসে আছ, মা-বোনদের কান্নায় তোমার ঘুম ভাংছে না এজন্য তোমার বুজুর্গীর উপর আমার সন্দেহ হয়। আসুন ! আমরা মতপ্রার্থক্য ভুলে গিয়ে দ্বীন বিজয়ীর আমলে ঝাঁপিয়ে পরি। দ্বীন বিজিত হলে অনেক আরাম করা যাবে।

হে আমার রিপুজী ভাই ও বোনেরা আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা চলে যাচ্চি আমাদের ভিটে মাটি উদ্ধারের জন্য। শহীদ ভাইদের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য। হয়ত জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে। তাই ক্ষমা করে দিবেন। এক সাগর ব্যথা বুকে নিয়ে কথা গুলো

বলছি, এতে যদি কারো হৃদয়ে আঘাত লেগে থাকে তবে মুসলমান ভাই হিসাবে ক্ষমা করে দিবেন। খোদা হাফিজ-।

বুখারা সমরকন্দ জিন্দা বাদ
মুসলিম বিশ্ব জিন্দবাদ
মুজাহিদ কাফেলা জিন্দাবাদ

মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী কথা বলা শেষ করলে সমস্ত শরনার্থী শিবিরে কান্নার রোল পড়ে গেল।

তেইশ

ডাক্তার রাগেব মিকচি ছওদাকে ঘরে রাখা নিরাপদ মনে করেননি। কারণ যুবতী মেয়েদের কে ধরে ধরে নিয়ে যায় যৌন কেন্দ্রে। যৌন কেন্দ্র হল সরকার পরিচালিত এক বিশেষ পাপের কারখানা। যুবকরা মাঠে-ঘাটে, মেইল ফেক্টরী আর কল কারখানায় কাজ করবে, যৌন চাহিদা পুরনের জন্য চলে যাবে যৌন কেন্দ্রে। বিবাহ-শাদীর প্রথা বাদ দিয়ে এ নোংরামি প্রথা চালু করেছে। এখানে জোরপুর্বক মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যায়। ডাক্তার রাগেব মিকচির এক ছাত্র ডাঃ এস করিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব গুলো স্তর অতিক্রম করে চাকরি নিয়েছেন বিদেশে। অর্থাৎ পার্শবতী দেশ আফগানিস্তানে। থাকেন কাবুলে। ডাক্তর এস, করিম এখন কাবুল মেডিক্যেল কলেজ হাসপাতালের মহা পরিচালক। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর নাম ডাক অনেক। দ্বীনদারীর দিক দিয়েও তুলনা হয় না। এস, করিমের সাথে ছওদার রিয়ে ঠিক ঠাক হয়েছিল অনেক পূর্বেই। কিন্তু দেশের বিরাজমান পরিস্থিতির কারনে অনেকটা বিলম্ব হয়ে গেছে। এখন আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাই ডাক্তার এস, করিমকে ডেকে এনে ছওদার সাথে শুভ বিবাহ পড়িয়ে দিয়ে বললেন বাবা মেয়ের ইজ্জত আবরু, রক্ষা করা এখন তোমার জিম্মাদারী কালবিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি পার তোমার সাথে নিয়ে যাও। হারেছ মিকাঈলী বললেন, আমার মেয়ে মাহমুদা ও জামাতা বর্তমান কাবুল সরকারের রাজনীতি আশ্রয়ে আছেন। বলেছিলাম দেখে-শোনে একটি বাড়ী কিনে নিতে। বাড়ী কিনার মত টাকাও দিয়েছি আজ বহু দিন পার হতে চলছে, তাদের কোন বার্তা পাচ্ছি না। আপনি গিয়ে এদের একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন। যদি সন্ধান মিলে

তাহলে মাহমুদা আর ছওদা উভয়েরই চিন্তা পেরেশানী কেটে যাবে। এখানেও দুজনের মধ্যে ছিল গলায় গলায় মিল, সেখানে এক জন আর একজনের ছায়া হয়ে দিন কাটাতে পারবে।

হারেছ মিকাঈলী এস, করিম সাহেবকে লক্ষ্য করে আরো বলেন, বাবা তুমি গিয়ে কাবুলে বাসা বাড়ী করার মত পছন্দ সই জায়গা তালাশ কর। শহরের ভিতরে না হয় শহর তলীতে ভাল হয় দামেও কম আবার কোলাহল মুক্ত। আমি তোমার শ্বশুরকে খুব তাড়া তাড়ি একটা ফায়সালায় পৌছব। সহায়-সম্পদ, জায়গা জমি ও ব্যবসা বাণিজ্য তো ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। গোপনে গোপনে দেখি কিছু কম দামে হলেও বিক্রি করে দেয়া যায় কিনা। এদেশের অবস্থা যে ফিরে আসবে সে আশা একেবারেই ক্ষীণ। এদেশে মুসলমানরা থাকতে পারবে না। হিজরত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

এস, করিম ফুফাজান আপনার জামাতার নামটা জানি কি বলছেন হারেছ মিকাঈলী খোবায়েব জাম্বুলী।

খোবায়েব নামে এক মুজাহিদ কে তো সরকার হন্যে হয়ে খোজে বেড়াচ্ছে এবং ধরে দেয়ার জন্য পুরুস্কার ও ঘোষনা দিয়েছে, সে খোবায়েব না তো ?

মনে হয় না। কারন হুলিয়া জারিকৃত খোবায়েবের ছবি দেখেছি। তার সাথে এর কোন মিল নেই।

কাবুলে খোবায়েব নামে কেউ আছে কিনা তা জানাযাবে। তবে কিছুদিন আগে আবদুল্লাহ বিন মাসরুর (খোবায়েবের ছদ্ধ নাম) মানে এক জন মুজাহিদ গিয়েছেন। বিভিন্ন মসজিদে তাঁর অনলবর্ষি বক্তব্য শোনেছি। জিহাদ ফান্ডে অনেক আর্থিক সাহায্য দিয়েছি এবং আমার বন্ধু বান্ধবদের উদবুদ্ধ করেছি। আজ বেশ কিছু দিন যাবত তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না। মনে হয় রনাঙ্গনে চলে গেছেন।

মুজাহিদরা তো ছদ্ধ নামে চলে, এখানেও এমনটি কি না?

হাঁ,আমি গিয়ে খোজ নেব।

ডাক্তার এস করিম ছত্তদাকে নিয়ে চলে এলেন কাবুলে। উঠলেন সরকারী কোয়াটারে। বড় অফিসার হিসাবে সরকার আগেই কোয়াটার দিয়ে ছিলেন। এবার শুরু হল ছওদা ও এস, করিমের দাম্পত্য জীবনের নবযাত্রা। কিছু দিন যেতে নাযেতেই ছওদার চাকরী হল হাসপাতালে

এবার আরো খুশী। ছওদা একদিন তার স্বামী এস, করিমকে নিয়ে বের হল মাহমুদার সন্ধানে অনেক ঘুরাঘারি করেও সন্ধান পেল না। এমন ঘুরা-ফেরা এক দিন নয়,বহু দিন করেছে। কোন পাত্তা পায়নি। ডাক্তার সাহেব ভাবলেন যে যদি আবদুলস্নাহ বিন মাসরম্নরকে পাওয়া যায় তাহলে তার কাছে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত কোন সুরাহা হতে পারে। তাই অনেকের নিকট মুজাহিদ কমান্ডার আবদুলস্নাহ বিন মাসবুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অনেকেই বলল, লোকটাকেতো আগে প্রায় সময়ই ঘোড়া নিয়ে ছোটা ছুটি করতে দেখেছি। দেখেছি বিভিন্ন মসজিদে জিহাদের দাওয়াত দিতে কিন্তু আজ বহু দিন যাবত তো তাকে আর দেখিনা। হয়ত রনাঙ্গনে চলে গেছেন, নাহয় দেখতাম। এর পর থেকে তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন যে, হয়ত আর পাব না।

এর মধ্যে কেটে গেল কয়েকমাস। ডাক্তার এস, করিম শহরের বাইরে একটি মনোরম জায়গায় বাড়ী করার জন্য নির্বাচন করে ডাক্তার রাগেব ও হারেছ মিকাঈলীকে জানালে ওনারা এসে জায়গা জায়গাদেখে পছন্দ করেন এবং দরদাম ঠিক করে বায়না নামা রেজেষ্ট্রী হয়। অতঃপর উনারা আবার দেশে ফিরে যান। উঁনার যে কয়দিন কাবুলে ছিলেন সে কয় দিন পাগলের মত নিজ কন্যা ও জামাতাকে তালাশ করে কোথাও এদের কোন আলামত পেলেন না। অবশেষে এটাই মনে করে নিলেন যে এরা আর এদিকে নেই চলে গেছে রনাঙ্গনে, আলস্নাহ তুমি তাদের হেফাজত কর। অতঃপর ডাক্তার রাগেব ও হারেছ সাহেব দেশে ফিরে গেলেন। তিন মাস পর দেশের জায়গা জমি নামে মাত্র মূল্য নিয়ে বিক্রি করে জালেমের মুলক থেকে প্রিয় জম্ম ভূমির মায়া ত্যাগ করে কাবুলে চলে এলেন।

হিজরত করা যে এত বেদনাদায়ক, এত মর্মান্তিক, এত পীরাদায়ক তা তিনি এর আগে অনুভব করতে পারেননি। চলে আসার আগের তিনটি দিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। চলমান বিশাল ব্যবসা প্রষ্ঠিান যা থেকে প্রতি বৎসর আয় হত লক্ষ লক্ষ টাকা। এব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেই মুজাহিদদের কে মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা দেয়া হত। তাছাড়া অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যুদ্ধ সামগ্রী দেয়া হত এপ্রতিষ্ঠান থেকেই। এপ্রষ্ঠিানের উসিলায় বেশ কয়টি পরিবারের নুন রম্নটির ব্যবস্থা হত। ব্যবসার উসিলায় দেশী বিদেশী বনিকদের সাথে গড়ে উঠেছিল সুসম্পর্ক। আজ কোটি টাকার সম্পদ মাত্র কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করা হচ্ছে। হয়ত আর কোন দিন এপ্রতিষ্ঠান আসবে না নিজ দখলে।

পৈত্রিক সম্পতিতে নিজ হাতে গড়া আধুনিক পদ্ধতিতে মন মত প্রাসাদ। যা দেখার জন্য দুর দূরান্ত থেকেও লোক জন এসে ছিল। সামনের বিশাল চত্বরে নিজহাতে লাগানো দেশী-বিদেশী ফল-ফুলের চারা। আজ এগুলো বড় হয়েছে, ফল ফুল ডাল গুলো মাটি চুম্বন করতে চায়। এ বাগানে বিচরণ করলে ক্লান্তি দূর হয়, মন ভরেউঠে আনন্দে। ছায়াদার বৃক্ষগুলোর মূলদেশে বসার সু ব্যবস্থা, পুকুরে পানি টলমল করছে, রূপসী মাছগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বিচরন করছে। প্রস্তর নির্মিত পুকুরের ঘাটগুলো কত সুন্দর মানিয়ে ছিল। লাল শালুক ও শাপলা ফুলেরা সব সময় হাসি ছড়াত। ফসলের জমি গুলোতে সব সময় সবুজ শ্যামল চাদর গায় দিয়ে থাকত। কোন সময় অনাবাদি থাকত না। আমার চাষি ভায়েরা সারাদিন মাঠে বিভিন্ন ফসল ফলায়ে মাঠ ভরে দিত। দক্ষিণা সমিরন মনের আনন্দে ঢেউ খেলে বয়ে যেত সকাল বিকাল। এরঙ্গ মহল, বাগবাগিচা কতই না সুন্দর কতই না মনোরম। এসব বাড়ী ঘর আর বাগান ভূই ফেলে রেখে, মাত্র সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে, কাওকে না বলে রাতের গহীন অন্ধকারে বেরিয়ে আসাতে হল। আত্নীয় স্বজনরা জানেনি। কাউকে বলা ছাড়াই ঘন অন্ধকারে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। স্মৃতিরা কেবলই তাদের নিরব ভাষায় হাত ছানিতে ডেকে বলছিল। মুসাফির, যেওনা আমায় রেখে। আরো কিছু দিন এখানে অবস্থান কর। ডাক্তার রাগেব মিকচি ও হারেছ মিকাইলী স্বপরিবারে কাবুলে হিজরত করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হত কিছু দিন পর এলাকার লোক জনের সাথে চিনা-পরিচয় মত বিনিময় লেন-দেন আদান প্রদান হতে হতে তাদের মনের সংকীর্নতা অনেকটা কেটে গেল। (বিঃদ্রঃ তখন পাসপোর্ট-ভিসা, এসবের কোন বালাই ছিল না, এক রাজার প্রজা অন্য রাজার রাজ্যে চলে গেলে তাকে খুব যত্ন সহকারে বসবাস করার জন্য ব্যবস্থা করে দেয়া হত। চাষাবাদের জন্য জমিও দেয়া হত)।

* * * * *

ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মাওঃ আঃসাত্তার বলখী এবং তাঁর সহযোগী দুই সালার আলায়েভ ও ফাগুদায়েভ সহ ৬০ জন মুজাহিদ নিয়ে পরামর্শ করলেন কি ভাবে কোন পথে রানাঙ্গনে যাওয়া যায়। আলায়েভ বললেন" জনাব আমীর সাহেব এক কাফেলায় সব যাওয়া যাবে না। আমাদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যেতে হবে। আমরা যদি পায়ে হেঁটে যাই

তাহলে কমপক্ষে ১৮ থেকে ২২ দিন সময় লাগবে। আবার রাস্তায় যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে সময় লাগবে আরো বেশী। আর আমরা যদি ঘোটক ব্যবহার করি তা হলে সময় লাগবে তিন দিন। রাহাবর হিসাবে আমাকে ও ফাগুদায়েভকে ব্যবহার করতে পারেন। তা ছাড়া অন্যেরা তো কেউ চিনবেনা । এখন আপনার ফায়সালাই চুড়ান্ত ফায়সালা।

ফাগুদায়েভ বললেন, হযরত আমরা যে খানে মার্কাজ স্থাপনের চিন্তা করেছি, সেখান থেকে পায়ে হেটে গিয়ে দুশমনের ঘাটিতে আক্রমণ করে আবার নিরাপদে ফিরে আসা খুবই কঠিন হবে। তাই কম পক্ষে ১৫/ ২০ টি অশ্ব নিয়ে যেতে হবে। সেখানে অশ্ব রাখায় কোন বেগ পেতে হবে না। এসব দিক বিবেচনায় রেখে আপনি ফায়সালা দিন।

অন্য এক মুজাহিদ এব্যপারে আমাদের প্রধান আমীর সাহেবের (খুবায়েব) সাথে পরামর্শের দরকার হবে কি ?

বলখী তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন এবং বলেছেন, যথা সম্ভব জায়গার ব্যবস্থা হলে চলে যেতে। এখন তো আল্লাহর রহমতে জায়গা পেয়ে গেছি। এখন আমি মনে করি এক কাফেলা পাঠিয়ে দিয়ে আমি কাবুলে চলে যাই। তার কাছে সব বলে কয়েকটি অশ্বের ব্যাবস্থা করি। অতঃপর মাওঃ আঃ সাত্তার বলখী আলায়েভকে গ্রুপ কমান্ডার নিযুক্ত করে আরো নয় জন মুজাহিদকে দিয়ে মোট ১০ জনের একটি গ্রম্নপ রচনা করে প্রয়োজনীয় ছামানা এবং ১০ টি অশ্ব দিয়ে রনাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন। তার পর তিনি আমার সন্ধানে চলে গেলেন কাবুলে। সেখানে গিয়ে প্রথমই উঠলেন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আল্লামা সামসুল হক নজদী সাহেবের নিকট। কারণ আমার নিকট খাতিব সাহেবের ভূয়াসী প্রশংসা শোনে ছিলেন।তাই ওনার সাথে সাক্ষাৎ সালাম কালামের পর আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে হুজুর মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা আবদুলস্নাহ বিন মাসরম্নর সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছি দয়া করে তাঁর ঠিকানাটা দিলে ভাল হয়। হুজুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আগে এখানে মাঝে মধ্যে আসতেন, এখন অনেক দিন যাবত আসেন না। বর্তমানে সে কোথায় আছেন তা বলতে পারি না। বলখী খতিব সাহেবের কথা শোনে চিন্তিত হয়ে গেলেন খতিব সাহেব আমার গ্রেপ্তারীর কথা জানালে চার দিক থেকে উঠবে নিন্দার ঢেউ, শোনতে হবে মানুষের ধিক্কার লোকে বলবে খতিব সাহেবের সহযোগীতার মুজাহিদ কমান্ডারকে বলসেবিক গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করেছে। তাই তিনি আমার গ্রেপ্তারীকে গোপন করেছিলেন। তাছাড়া আরো

একটি দিক তিনি চিন্তা করেছেন, তা হল তিনি মনে করেছেন ওরা আমাকে নিয়ে মেরে ফেলেছে, জিবীত থাকেলে বললে হয়তো উদ্ধারের একটা চিন্তা করা যেতে। যেহেতু মেরেই ফেলেছে এখন আর গ্রেপ্তারের কথা বলে আগুন ধরানোর দরকার নেই। তাই তিনি নিরব রয়েছেন।

বলখী সাহেব কয়েক দিন পর্যন্ত কাবুলের অলিতে গলিতে ঘুরে আমাকে তালাশ করেছেন এমনকি কমান্ডার আতাউল্লাহকে (প্রশিক্ষণের জন্য-নাদির শাহ যে অবসর প্রাপ্ত সৈনিককে দিয়েছিলেন) খোঁজতে লাগলেন দুঃখের বিষয় তাঁরও কোন পাত্তা পেলেন না। অবশেষে দুঃখ ভরা মন নিয়ে আবার শরনার্থী শিবিরে যাত্রা করলেন। চিন্তা পেরেশানী দুঃখ, কষ্ট আর হতাশার অন্ত নেই। ব্রেইন আউট হয়ে যাওয়ার উপক্রম। অতি কষ্টে শরনার্থী শিবিরে এলেন। অন্যসব মুজাহিদরা কাবুলের সংবাদ জানার জন্য এসে ভীর জমালেন। বলখীর যবান থেকে কোন কথাই বেরচ্ছে না। তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়েই অনেকে বুঝতে পারছেন যে সংবাদ আমাদের অনুকুলে নয়। কমান্ডার ফাগুদায়েভ বললেন, হযরত যে কোন পরিস্থিতির মকাবেলার জন্য আমাদেরকে আপনার পার্শ্বে পাবেন। বলুন কাবুলের সংবাদ কি ?

প্রিয় সাথীরা আমারা বিরাট এক পরিক্ষার সম্মুখিন, তাহল, সেখানে আমাদের আমীরে মোহতারাম আবদুল্লাহ বিন মাসরুর ও উস্তাদ আতাউল্লাহ, কাউকেই খোঁজে পাইনি। খতিব সাহেবও অনেক দিন যাবত তাঁদের খবর রাখেন না। শুনেছিলাম তাঁর নিকট জিহাদের ফান্ডে টাকা পয়সা জমা হয় সে টাকা পয়সা আমাকে না চেনার কারনে দেননি। ভেবে ছিলাম আমীর সাহেবের সাথে পরামর্শ করব এবং টাকা পয়সা নিয়ে ছামানা পত্র ও আরো ১০ টি ঘোড়া খরিদ করব। এখন তো একটি ও হলনা। যে দশটি ঘোড়া ছিল তাও তো দিয়ে দিলাম প্রথম কাফেলাকে। এখন আমরা কি করব না করব তা ভেবে পাচ্ছি না। এখন আপনারা আমাকে পরামর্শ দেন আমরা কি করতে পারি।

ফাগুদায়েভ বললেন, হযরত ভিনদেশে কে আমাদের কি করবে তা খুব ভালই জানা আছে। আমাদেরকে যে রিলিফ দেয়া হত তা আস্তে আস্তে কমিয়ে আনাহচ্ছে। আমার মনে হয় মহানুভব নাদির শাহের কানে কোন বদমাইশ কুমন্ত্রণা দিয়েছে। তা নাহয় তিনি তো খুবই দয়ালু, বিনয়ী, পরহেজগার খোদাভক্ত লোক। প্রথম তিনি বলতেন আমরা নির্যাতিত হয়ে

তাঁর দেশে এসেছি। আমরা ঈমান রক্ষার জন্য হিজরত করেছি। আমরা আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর মেহমানের যেন কোন কষ্ট না হয় তার প্রতি ছিলেন স্বচেতন। এখন রিলিফ হ্রাস করে দিয়েছেন, ট্রেনিং বন্ধ করে দিয়েছেন আর সীমান্তে ও দিয়েছেন কড়া পাহারা। ফলে শত শত শরনার্থীরা সীমান্ত থেকে আবার ফিরে যাচ্ছে জালেমদের কবলে। কাজেই আমাদের যার কাছে যা আছে তা নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে হবে। ভিন দেশে আর এক মুহুর্ত থাকতে আমার ইচ্ছা নেই। হয়ত বিজয় ছিনিয়ে আনব না হয় শহীদ ভাইদের সাথে মিলিত হব। তার বক্তব্য শোনে সবাই এক মত হয়ে গেল এবং সবাই এক সাথে নিজ নিজ ছামানা নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভিতরে চলে গেল।

চব্বিশ

কমান্ডার আলায়েভ তাঁর সাথীদের নিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে মারবানিয়া পর্বত মালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আহঃ কি বিদঘটে পথ। বিপদসন্কুল, বন্ধুর, গিরি কান্তার ও প্রস্তর সমাকুল প্রান্তর পেরিয়ে এগিয়ে চলল। কোথাও নেই বেশ্ম, নেই আলয়, নেই চলার উপযুক্ত রত্ন। কণ্টাকাকীর্ণ প্রান্তর। চলার পথে জামা কাপড় রেখে দিতে চায় যেনা ওরা বিপদাপন্ন ভিখারী অশ্বগুলো জীবন বাজি রেখে চলতে চলতে একক সময় ক্লান্তি জনিত দুর্বলতার থেমে যায়। শ্রমক্লান্ত ও কণ্টকাহত ঘোটক মুখগাহবর ও নাসারন্দ্রে থেকে প্রচুর ফেনপুঞ্জ নিঃসরণ করতে লাগল। আরোহীরা ঘর্মাজুত দেহের উর্ধ্বগামী রুধির ধারা মস্তিস্ক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করে তুলছে। ক্ষুধা-পিপাসায় আক্রান্ত মানুষ গুলোর দেহ পিঞ্জির থেকে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম।

সাথে নিয়ে আসা আহার্য্য আর পানীয় অল্প অল্প করে ৫ দিন খেয়ে ছিল। এখন দুদিনের অনাহার। জীবন ওষ্ঠাগত। সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছে না কেউ। বিশ্রাম অবশ্যই নিতে হবে। কোথায় বিশ্রাম নিবে তেমন একটি উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন। আলায়েভ বললেন আমরা এখানে যাত্রা বিরতি না দিয়ে চল আরো একটু এগিয়ে যাই। যদি কোন ঝর্ণা পাই তাহলে তারই পার্শ্বে আমরা ডেরা ফেলব। সবাই আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাক আল্লাহ এমন একটি জায়গার ব্যবস্থা করে দেন। কাফেলা আবার নতুন করে কোমর বেঁধে সামনে চলছে।

পড়ন্ত বেলা। মাতুর্ভ দগ্ধ ধরনি বক্ষে শীতলতার আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন বিশাল এলাকা জুড়ে বন্য খর্জুর বাগান। গাছগুলো তুলনামুলক খুবই ছোট। খেজুরের সাইজও ছোট। পাকা কাচাঁ কাঁধিগুলো ঝুলছে। হাত দিয়ে ধরা যায়। এবাগনের নিম্মদেশে কল কল তানে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। আসলে এটাকে নদী বলা যায় না। বৃহদাকার ঝর্ণা। কাফেলা এস্থানের সন্ধান পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কয়েক রাকাত নামায আদায় করার পর কমান্ডার সাহেব দুজনকে পানি সর্বরাহ করতে, দুজনকে খেজুর কুড়াতে ৪ জনকে তাঁবু রচনা করতে আর দুজনকে পাহারার কাজে লাগিয়ে দিলেন। আর অশ্বগুলির জ্বিন মুক্তকরে ছেড়ে দিলেন লতা পাতা বক্ষণ করার জন্য। উক্ত স্থানে তারা তিন দিন বিশ্রাম করে আবার পানি আর খেজুর নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে চলতে চলতে আবার এক সময় উপবাস জীবনের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। আবারও তিন দিন উপবাস থেকে তারা লোকালয়ের সন্ধান করতে লাগল। পাহাড়ী এলাকা পিছনে রেখে চলল পশ্চিম উত্তর দিকে। রাত ঘনিয়ে এল। বনের ঘনত্ব অনেকটা পাতলা থেকে পাতলা হয়ে আসছে। ওরা ভাবছিল এই বুঝি লোকালয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। সকলের মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল পরোক্ষ নেই দুশমনের ভয়ে সমস্ত আনন্দটুকু কেড়ে নিল।

রাত গভীর থেকে গভির হতে যাচ্ছে। এখন আর সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে না করে একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে ডেরা ফেলল। সকলেই অনাহারে মরনাপন্ন। তাই তারা গাছের লতা পাতা সিদ্ধ করে কিছু কিছু খেয়ে নিল। এরই সামান্য একটু দুরে ছিল নবাগত দুশমনের ঘাটি। এরা সবসময়ই থাকত মুজাহিদদের ভয়ে আতংক। এদেরকে তাদের ইচ্ছার বাইরে এখানে পাঠানো হয়েছে। সৈন্যরা এ দিনই বিকালে এখানে এসে ছাউনী ফেলেছে। এ এলাকার জন্য সৈন্যরা ছিল সবাই নতুন। পথঘাট কিছুই ছিলনা জানা। সংখ্যায়ও ছিল একদম কম।

অরণ্যের অগ্নি দেখে তাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। কেউ বলল, মুজাহিদরা আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে আসছে। কেউ বলল এরা সাধারন শক্তি নিয়ে আসে নি বিপুল লোক লস্কর ও অস্ত্র সস্ত্র নিয়েই আসছে। অপর এক জন বলল আমার মনে হয় আজ রাত্রেই আমাদের উপর আক্রমণ করবে। এধরণের বলা বলির পর সৈন্যদের

মনোবল এক দম ভেঙ্গে গেল। সকলের অন্তরেই পালাই পালাই ভাব বিরাজ করছিল। মুজাহিদরা লতাপাতা সিদ্ধ করে খেয়ে সবাই বসে পরামর্শে বসে গেল। কমান্ডার সাহেব বললেন, এখানে বন জঙ্গলের অনুপাতে বুঝা যায় লোকালয় তেমন দুরে নয়। সব কিছু না জেনে রাত্রি যাপন নিরাপদ নয় যে কোন সময় সাধারন হামলা বা রকেট হামলা হতে পারে। তাছাড়া আগুন জালিয়েও আমরা আর এক ভুল করেছি। তাই ৪ জন এখানে থাকবে আর ৬ জন তিন দলে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে প্রায় আধামাইল এলাকা গোপনে ঘুরে দেখবে। যদি দুশমনের আলামত পাওয়া যায় তাহলে আমরা স্থান পরিবর্তন করে আরো গভীরে চলে যাব। সবাই এতে এক মত হলেন এবং দুজন করে তিনটি দল তিন দিকে বেরিয়ে গেলেন। তারা রাইফেল, ষ্ট্রেনগান ও গ্রেনেড নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগলেন।

দুজন মুজাহিদ কোয়াটার মাইল পশ্চিমে গেলে টর্চলাইটের আলো দেখতে পেলেন। একজন অপর জনকে সুধালেন, দোস্ত কোন কিছু দেখছেন কি ?

হ্যাঁ, পথিকের টর্চের আলো।

পথিক না অন্য কেউ তা কিকরে বুঝলেন ?

বুঝব না ? কোন বাড়ীর আলো হলে সব সময় জ্বলে থাকত। এতেই বুঝা যায় এটি পথিকের।

বাড়ীতে কি টর্চ লাইট সব সময় জ্বালিয়ে রাখে, না প্রদিপ ?

যদি দুশমনের ঘাটি হয় ?

দুর্ গাধা ! এখানে আবার দুশমন আসবে কোত্থেকে ? ঘাটিতে কি একটি টর্চ হঠাৎ জ্বলবে ? ঘাটিতে থাকবে চার দিকে শুধু মশাল আর মশাল। তা না হয় থাকবে জেনারেটরের বিজলী বাতি। বুঝলে গাধা ?

অ-----ঠিকই তো ?

চলুন তো দোস্ত দু' কদম এগিয়ে লোকটিকে দুশমনের কথা জিজ্ঞেস করি। তা হলে এত হাটা-হাটি লাগবে না।

যদি দুশমন হয় ?

দুর্ বেকুফ এক বারই না বলছি এখানে দুশমন আসবে না। চল জলদি চল। এর কাছে হাট বাজার কাছে আছে কিনা তাও জানা যাবে।

আমার কিন্তু কিছুটা ভয় লাগছে।

আপনার তো ভয় লাগবেই, জোরে বাতাস বের হলেও তো আপনাকে দেখেছি চমকে উঠতে। এখন তো ভয় লাগবেই। এত ভয় পেলে আসলেন কেন ? কেউ কি জোর করেছিল ?

সতর্ক হতে কি মানা আছে ?

দুর ছাগল এটার নাম বুঝি সতর্কতা। সতর্কতা হল জিহাদের ময়দানে ! পথে ঘাটে আর বনজঙ্গলে সতর্কতা কিসের ? দুইশ ফৌজের সাথে আমি একা। অর্থাৎ দুইশ শক্তিশালী লস্করকে কুপোকাত করতে আপনার মত ছাগলের দরকার নেই, আমি একাই যথেষ্ঠ, বুঝলেন ? আমার সাথে আর যদি দুশমনই হয়ে থাকে তবে আপনি শুধু দাড়িয়ে দেখুন। কি করতে হয় তা আমি করব (এদুই মুজাহিদ ছিল, গ্রাম্য মুর্খ। তারা ছিল ছাগল রাখাল)

ওরা এসব আলাপ আলোচনা করে সামনে যাচ্ছিল। এর মধ্যে দুশমনের এক পাহারাদার এক ঝুপের আড়াল থেকে শেষের কথাগুলো শুনে মনে মনে ভাবল সত্যিই তো এরা মুজাহিদ, মনে হয় আক্রমন করেই বসবে। বাপরে -----বাপ, এক জনেই দুইশর সাথে লড়বে, ইস কত সাহস ও শক্তিশালী এদের সাথে লড়াই করা জীবন খোয়ানো ছাড়া আর কি হতে পারে ? যদি আত্বসর্ম্পন করে প্রাণ ভিক্ষা পাই তবে আত্বসর্ম্পন করাই শ্রেয়। এমনে করে অস্ত্রটি ঝুপের আড়ালে রেখে একদম পাবলিক সেজে দ্রম্নত পদে, আর একটু সামনে গিয়ে আবার টর্চ ফুকাস করে জিজ্ঞাসা করল কেহ এত রাত্রে এদিকে আসছ ? তোমরা যাবে কোথায় ?

আমরা মুজাহিদ ! বলসেবিক ঘাটি তালাশ করছি।

কেন ?

ওদের উপর কিয়ামত নাযিল করার জন্য।

তোমরা কত জন ?

আমরা লোক অনেক, এখানে আসছি দুজন।

কুলাতে পারবে কি ?

ওকে আনছি দেখার জন্য। আমি একাই লড়ব দুশ শক্তি শালী ফৌজের সাথে ।

এ ছাউনীর সৈন্যরা ছিল সবাই নতুন। ও প্রশিক্ষণে দুর্বল। কোন দিন ফাইট করেনি ওরা। এদেরকে বাড়ী ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ধরে এনে ১০/১৫ দিনের ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কিছুই

নেই। মুজাহিদ দুজনের অবস্থা প্রায় একই। তবে এরা কমান্ডো প্রশিক্ষণও নিয়েছে।

এদের কথা শোনে পাহারাদার সৈন্যটি সামনে এসে দুহাত উচিয়ে বলল, ভাই তোমরাও মুসলমান, আমরাও মুসলমান। আমি তোমাদের কাছে সত্য কথা বলব যদি জীবনে না মারো । প্রাণ ভিক্ষা দিবে কি ?

হ্যাঁ, সত্যের মৃত্যু নেই, বল ?

আমরা এখানে আছি ১২ জন, দুদিন পর আরো সৈন্য পাঠানোর কথা। জানি তোমরা খবর পেয়েই আসছ,তা নাহয় এত রাত্রে আসতে না। তোমরা যদি ওয়াদা কর যে আমাদের উপর আক্রমণ করবে না, আর ছেড়ে দিবে, তাহলে আমরা সবাই আত্বসমর্পন করব। মুজাহিদ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল তোমরা কত জন ? উত্তরে বলল ১২ জন।

সত্যি কি আত্ব সমর্পন করবে ?

যদি হত্যা না করেন ।

আরে গাধা আত্বসমর্পন করলে কি আমরা কাউকে হত্যা করেছি তা শোনেছ ?

তা হলে কি ওয়াদ করেছ ?

হ্যাঁ ওয়াদা করেছি।

পাক্কা ওয়াদা ?

তা হলে তোমরা দাঁড়াও আমি উদেরকে নিয়ে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদেরকে বেকুফ বানিয়ে ভাগবার ফন্দি করছ।

না স্যার ভেগে যাব কই। এবলে ঝুঁপের আড়াল থেকে তার এস এল, আর, টি এনে তাদেরকে দিয়ে দিল গুলীসহ।

তুমি গিয়ে কি করবে ?

আমি গিয়ে সবাইকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলব, তার পর সবাই খালি হাতে আপনাদের এখানে আসবে।

ঠিক আছে যাও ! ব্যতিক্রম হলে কিন্তু---------------------।

সৈন্যটি তাদের ছাউনিতে গিয়ে সে যে পরিমান ভয় পেয়েছে তার চেয়ে শতগুন বারিয়ে ভয় দেখিয়ে বলল' ওরা শত শত মুজাহিদ আক্রমন

করতে আসছে। আর আমাদের একে বারে নিকটে এসে পৌছেছে দু'জন। এদের এক জন লড়াই করে দুশ জনের সাথে। আমি ওদের থেকে প্রাণ ভিক্ষা পেয়েছি তোমরা ও যদি প্রাণ ভিক্ষা চাও তবে আত্ব সমর্পন কর। তা না হয় তোমাদেরকে একে বারে মেরে ফেলবে। কমান্ডারঃ তুমি সত্য বলছ ?

হাঁ স্যার আমি নিজে দেখেছি, কথা বলেছি, তার পর আমার অস্ত্র ও টর্চ তাদেরকে দিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। এখন কি করবেন জলদি করুন্ন, পরামর্শের সময় নেই।

কমান্ডার দেখল, মুজাহিদদের সংবাদ পাওয়া মাত্র সমস্ত সৈন্যরা ছাগল ছানার মত থর থর করে কাঁপতেছে। এদেরকে নিয়ে হামলা করার অর্থহচ্ছে মৃত্যুর সাথে সাক্ষাত করা। তাই তিনি সবাইকে বললেন, তোমরা হাত উচিয়ে আমার পিছু পিছু আস। সবাই হাত উচিয়ে কমান্ডারের পিছু পিছু যাচ্ছে আর বলছে

"মুজাহিদ মুজাহিদ -----স্বাগতম, স্বাগতম।

তাছলিম,তাছলিম------বারহম, বারহম।"

গুন গুনিয়ে সুর মিলিয়ে গেয়ে গেয়ে চলছে। মুজাহিদ,মোটা গলায় ঘোষণা দিলেন, হে শান্তি প্রিয় সৈনিক ভায়েরা আমরাও শান্তি চাই। মুসলমান আর মুসলমানে খুনা খুনি ভাল নয়। এখন থেকে তোমরা আমাদের বন্ধু। তোমাদেরকে কিছুই করা হবে না, তা পূর্বেই ওয়াদা করেছি। এখন তোমরা একে অপরে হাত পিছন দিয়ে বেধে ফেল। বাঁধার জন্য লাই নার ওজুতার ফিতা ব্যবহার করতে পার। আমরা শুধু তোমাদের বডি চেক করার জন্যই তা করব। হুকুম পাওয়া মাত্র একে অপরকে বেধে ফেলল। বাকি একজনকে নিজেরা বেঁধে নিল। তার পর ১২ জন সৈন্যের যাবতীয় অস্ত্র-গোলা বারুদ ভূমি মাইন, গ্রেনেড ও ডিনামাইন্ট এবং সমস্ত খাবার দাবার এক সাত করে বলল, এগুলো আমাদের ঘাটিতে পৌছে দাও। প্রথম আত্ব সমর্পন কারী বলল, স্যার আমাদের মাল বহনের জন্য ৬ টি গাধা আছে। আপনারা মাল টানার জন্য গাধাগুলো নিয়ে যান আর দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন। তার পর বলল আচ্ছা তোমরা তা ব্যবস্থা করে দাও। তার পর ৪ জনকে বন্ধন মুক্ত করে দিলে ওরা সুন্দরভাবে গাধার পিঠে মাল গুলো সাজায়ে দিল। অতঃপর ওদেরকে বলল, তোমরা এক লাইনে তোমাদের গন্তব্যের দিকে চলে যাও। সবাই চলে গেল।

দুজন রাখাল মুজাহিদ অনেক বিলম্বে ডেরায় পৌছলে, তাদের কমাকান্ড দেখে সবাই তাদের কপালে চুমু খেতে লাগলেন। কমান্ডার ফাগুদায়েভ তাদের বর্নণা শোনে তিনি বললেন, প্রীয় সাথীরা আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর হুকুমে অল্প হয়েও অধিধের উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। তারই বাস্তব উদাহরণ এখন কার কাহিনী দুজন ব্যক্তির উপর আল্লাহর অনুগ্রহের নজর পড়েছে তাই তারা বিশাল কাজ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এখান থেকে ওরা দের মাসের খাবার, পেয়ে গেছে। তাছাড়া মাল টানার জন্য গাধা এবং বেশ অস্ত্র সস্ত্র। সকলেই আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

পঁচিশ

আমার প্রিয় জম্মভূমি কাজাকিস্তান থেকে সোজা উত্তরে এবং রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তরত যে শহরটি অবস্থিত তার নাম হল ওমস্কা। ওম্স্কা থেকে প্রায় দু'হাজার মাইল উত্তরে সাইরেরিয়ার সীমান্ত শহর হল টুইমেন। এ টুইমেন থেকেই বরফাঞ্চল ধরা হয় টুইমেন থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত শুধুবরফ আর বরফ। আল্লাহ তাআলার বৈচিত্রময় সৃষ্টির রহস্য আজও কেউ উদঘাটন করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত সবাই মিলেও যদি চেষ্ঠা করে তবু তার হাজার ভাগের এক ভাগ উদঘাটন করা সম্ভব হবে না। তবু মানুষের জানার আগ্রহ প্রবল। কেউ গবেষণা করছে পাতাল নিয়ে,কেউ গবেষণা করছে সাগর নিয়ে। কেউ পর্বত, কেউ সমতল ভূমি নিয়ে। আবার কেউ পৃথিবীনামক গ্রহ ছেড়ে শূন্য জগৎ, মহাকাশ, চন্দ্রলোক,সৌরজগত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বর্তমানে গ্রহে গ্রহে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এখনো কত শত গ্রহের সন্ধানই পাননি। তেমনি ভাবে ভূপৃষ্ঠের অনেক কিছু অজানাই রয়ে গেল। ঠিক তেসনিভাবে সাইবেরিয়া আল্লাহর এক আর্শ্চয্য সৃষ্টি। সেখানে রয়েছে বিশাল বিশাল পর্বতমালা। দুর থেকে দেখলে মনে হয় কোন কোন তাপস সাদা চাঁদরে আবৃত হয়ে তপস্যারত। ক্ষণিকের ব্যবধানে একটি পাহাড় লয়প্রাপ্ত হয়ে নদীতে পরিণত হচ্ছে। আবার কোন নিম্ম ভূমি পাহাড়ে পরিনত হচ্ছে। এ খেলা ওখানে নিত্য দিনের। আবার কিছু এলাকা সমতল। এখানে নেই পরিবর্তন-পরিবর্ধন। বরফে পিচ্ছিল সে অঞ্চল। মানুষ নেই, বাড়ী ঘর নেই। নেই মেইল,

ফেক্টরী ও কল কারখানা। কুদরতের হাতছানিতে কেন যেন বরফ গলে নিম্ম দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে। এমনভাবে গর্জন করে প্রবাহিত হয় যেন পাহাড়ী খড়স্রোতা নদী। পেঙ্গুইন জাতীয় এক প্রকার বড় বড় পাখী উড়তে দেখেছি। সেখানকার অবস্থা বর্ননা করে শেষ করার মত নয়।

যাহোক,বলসেবিকরা আমাকে ও আজিমকে জেলখানা থেকে বের করে হেলিকপ্টার যোগে সাইবেরিয়া নিয়ে যায়। আমাদের কে টইমেন থেকে কয়েকশ মাইল উত্তরে কুদিমকারা অঞ্চলে নিয়ে যায় রেখে আসার জন্য। ায়েনারা আমাদের জীবন ধারনের জন্য কিছুই দিয়ে আসেনি। হেলিকপ্টার লেন্ড করে আমাদের কে রেখে ওরা মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে দেখছিল আর ছবি তুলছিল। সেখান থেকে বার্তাও প্রেরণ করে ছিল মস্কোতে। ওরা লোক সংখ্যা ৬ জন। এর মধ্যে চালক ছিল ২ জন আর অন্যরা কমিউনিষ্টদের উচ্চ পর্যায়ের নেতা। দুজন তো লেনিনের সমপর্য্যায়ের নেতা। ওরা সকলেই হীম প্রুফ পোষাক পড়ে আর স্কন্ধদেশে অক্সিজেন সেলেন্ডার নিয়ে অবতরন করছিল। পায়ে এক প্রকার পাদুকা। যা বরফের উপর দিয়ে চলতে সাহায্য করে। আমরা বেশী বেশী আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। ওরা বরফের উপার নিশান গেড়ে ছবি তুলছে। বরফের নদী আর পর্বতের ছবি তুলছে। আমাদের এলাকা ছিল সমতল। এখানে নদী নালা বা পাহাড় ছিল না। আমি আজিমকে বললাম জিকির করে শরীর গরম করে ফেল, দেখবে একটু আরাম অনুভব করবে। তার পর আমিও তার সাথে জিকির করতে ছিলাম। সত্যিই একটু একটু গরম বোধ করছিলাম। একবার ঘার ফিরিয়ে চেয়ে দেখি দুজন চালক সহ আরো দুজনকে বরফে গিলে ফেলল। মনে হল ওরা যেন চোরা বালির অন্তপুরে তলিয়ে গেছে। বাঁকি দুজন হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়িয়ে আসছে। ওরা এসে হেলিকপ্টারের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশকরল। আমরাও তাদের সাথে ভিতরে প্রবেশ করলাম । হেলিকপ্টারের ভিতরে ছিল হীম প্রুফ পোষাক জুতা ও অক্সিজেন সেলেন্ডার। আমরা দুজনে দুটি পোষাক পড়ে নিলাম। সুবহানাল্লাহ আল্লাহ মানুষকে কত জ্ঞান দান করেছেন পোষাক গায়ে দেয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছিল এটা তুষারাঞ্চল নয়। ঠান্ডা কি জিনিস তা বুঝার কায়দা নেই।

তাদের পাকানো গরম খাবারগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাজিয়ে রেখেছিল। আমরা ছিলাম কয়েক দিনের উপবাস। বিলম্ব না করে উদর পূর্ণকরে আহার করে নিলাম। তার পরও যে খাবার রয়ে গেছে তা ৪ জনে

১০/১২ দিন খাওয়া যাবে। চালক নেই। এখানে আমরা সবাই সমান। মহা বিপদে চাচাদের মুখ মলিন হয়ে গেল। কারো খুখেরা শব্দ টি নেই। সে সময় খুশীতে আমাদের আনন্দ দেখে কে ? বার বার অন্তরের অন্তর স্থল থেকে বেরিয়ে আসছে আল্লাহর প্রশংসা। পর পর কয়েক বারই নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। রয়ে যাওয়া দুজন নেতার মধ্যে এক জন হল মহিলা। এ শয়তানকে প্রথমে লক্ষই করিনি। আর করার সময়ই বা কই ? মওতের মুরাকাবার হাকিকত যার চিন্তা-চেতনা, দেহ মন আর চোখে বিরাজ করে তার সামনে মওত ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয়না। প্রতেক মুসলমান নর-নারী যদি নিয়মিত মওতের মুরাকাবা (চিন্তা) করত, তা হলে তার দ্বারা কোন প্রকারের গোনাহের কাজ হবে না। গোনাহ থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল মওতের মুরাকাবা।

কপ্টারে শীত-গরমের বালই নেই। যাকে বলে ইয়ারকন্ডিসন, বা এ,সি, শীতাতপ নিয়নত্রিত। কপ্টারে প্রবেশ করেই পোশাক সব খুলে ফেলল চেয়ে দেখি পরনে হাফ পেন্ট, গায়ে ঝুলা সেন্টু গেঞ্জি, মাথায় যেন ছেড়া ফাড়া পাট, চামড়া টা সাদা, মাঝে মধ্যে কালো কালো তিল, বক্ষ দেশ খুবই উন্নত। বয়স বাইশ-তেইশ হবে। চোখে গগছ, কাধে, ক্যেমেরা, হাতে দূর্বীন আর পৃষ্ট দেশে দূর পাল্লার ওয়ারলেছ। আমি প্রথম ভাবছিলাম সাথের ব্যক্তিটি তার স্বামী। পরে জানতে পারলাম মেয়েটি একজন বৈজ্ঞানিক। যারা যে খানে ভ্রমণে যায় সবাই তাকে নিয়ে যায়। মেয়েটির দ্বারা অনেকেই অনেক চাহিদা মিটায়।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম আপা আপনার যন্ত্রপাতি গুলো আমাকে দেন আমি একটু ঘুরে আসি। তেমন বাড়াবারি না করে সবগুলো আমাকে দিয়ে দিল। আমি এগুলো নিয়ে আজিম ভাইকে সাথে নিয়ে কপ্টার থেকে বেরিয়ে এলাম। আহ ! কোথায় শীত আর কোথায় গরম তা বুঝার উপায়ই নেই। আমরা মনের আনন্দে হেসে খেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সাইবেরিয়ার কত কিংবদন্তি গল্প ছোট কালে শোনতাম। আজ আল্লাহ পাক বিনা পয়সায় হাজার হাজার মাইল দূরে ভ্রমণ করাতে নিয়ে আসছেন। এটা যেন গরীবানা মতে মেরাজ।

আমরা প্রথমে চালকদের নিকট গিয়ে দেখি শুধু গলাটুকু বাঁকি আছে। আর সমস্ত দেহ বরফে গিলে ফেলেছে। এখনো এরা জিবীত, এক জনও মরেনি। আমি অনেক চেষ্ঠা করেছি এদেরকে উদ্বারের জন্য। কিন্তু সম্ভব

হয়নি। অতঃ পর জিজ্ঞাসা খরলাম এর আগেও কি তোমরা সাইবেবিয়ায় এসে ছিলে ? একজন চালক উত্তর দিল বহু বার এসেছি। এপর্যন্ত সাইবেরিয়ায় যত আলেম উলামা, পীর মাশায়েখ ও মুজাহিদদের আনা হয়েছে, সবই আমরা এ কপ্টারে করেই এনেছি। এতটুকু বলার পরই এরা একটি চিৎকার দিল এর পর আর জিন্দা রইলনা এবং আস্তে আস্তে বরফের নিচে চলে গেল। আমরা ভয়ে আস্তাগফার পড়তে পড়তে দৌড়িয়ে চলে এলাম। তার পর আরো বহু জায়গা ঘুরে দেখেছি এক স্থানে গিয়ে দেখি শুধু লাশ আর লাশ। এদেরকে অনেক আগে এনে ফেলে রেখে ছিলা। বরফের কারনে সেসব এলাকার লাশ নষ্ঠ হয় না। বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাশগুলো পড়ে আছে। টুপী, দাঁড়ী, পাগরী পাঞ্জাবী, সবই এখনো মজবুদ তার পর জায়গায় জায়গায় গিয়ে আমরা জানাযার নামায পরলাম। এ নামায তাদের ফায়দার জন্য নয়। এরা তো শহীদ হয়ে হাসিমুখে জান্নাতে চলে গেছে। এদের জানাযার দরকারই নেই। আমরা জানাযা পড়েছি আমদের ফায়দার জন্য। বেশ কিছু চেহারা ছিল আমার পরিচিত আর কিছু কিছু ছিল আজিমের পরিচিত। চোখের পানিতে জানালাম শহীদদের আলবিদা। এর মধ্যে অনেকগুলো চেনা অচেনা মুখের ছবি ক্যেমেরা বন্ধিকরলাম।

দূরবীনের সাহায্যে ২০/৩০ মাইলের দূরের পর্বতগুলো প্রাণ ভরে দেখতে ছিলাম। একবার এক স্থানে গিয়ে দেখতে পেলাম কতগুলো তাঁবুর উপরের ছূড়াটুকু শুধু মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি অংশ বরফ ঢাকা। পার্শ্বে একটি ছোট সাইন বোর্ড ও একটি নিশান। তাঁবুর ছূড়ায় ইংরেজি অক্ষরে লিখা ছিল ফ্রান্স। পতা কাটাও ছিল ফ্রান্সের। সাইন বোর্ডে লিখাছিল ৩ জন বৈজ্ঞানিকের নাম। সাইবেরিয়া বিজয় করতে ফ্রান্সের মন্টপিলার থেকে এখানে এসে ছিলেন। এখন থেকে তাদের আগমণ ঘটে ছিল ৫০ বৎসর আগে। সে সব বৈজ্ঞানিকদের নাম যথাক্রমে মিঃ গোসিলান এ্যান্টব্রার্ড, মিসঃজেমিলিনা ব্রুস (মেয়ে) মিঃগালবাথিন ব্রুস। কোন বই পুস্তকে এসব সন্ধানীদের নাম আছে কি না তা কে জানে। হয়তবা ইতিহাসের পাতা থেকে খসেপড়েছে এ নাম গুলো। সাইবেরিয়ায় তাদের আগমনের সাক্ষ্য বহন করে দাড়িয়ে আছে সাইন বোঁড টি। এটারও একটা চিত্র ধারণ করা হল। আমরা যে অঞ্চলে ছিলাম, সেখানে ১৬৮ ঘন্টা পর অর্থাৎ ৭দিন পর ১৫ মিনিট সূর্য দেখা যেত। এদীর্ঘ রাত্রে চলা ফেরার কোন ব্যঘাত ঘটেনি, কারণ বিশালাকারের ধ্রুব তারা দ্বাদশী

চাঁদের ন্যায় আলো ছড়াত। তাছাড়া অগনীত তারকারাজি মিট মিট করে হাসত। এতে ও অনেকটা অন্ধাকার দূও হয়ে যেত।

আমরা ঘুরা ফেরা করে ফিরে এলাম কপ্টারে। দুজন নেতা বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। মওতের ভয় আমাদের অনেক আগেই অন্তর থেকে হিজরত করেছিল। তাই মওতের চিন্তায় আমাদেরকে গায়েল করতে পারেনি। তাই আমাদের ঠোটে হাসি ফুটেই থাকত। আমাদের এঅবস্থা দেখে বৈজ্ঞানিক মনসা কেলিন্স বলল, তোমাদেরকে খুব নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। চালক নেই, কিভাবে দেশে ফিরবে তা ভেবে দেখছকি ?

স্যার আমরা তো আর দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি। আপনারা কিভাবে যাবেন তা ভাবছেন কি ?

মেয়েটি কোন উত্তর নাদিয়ে একটু নিরব বসে রইল। নেতাজী লেপনিন বলল, আমরা ওয়ারলেছ করে এখনই কাপ্টার এনে চলে যাব। তখন তোরা ---------?

কাপ্টার আসার আগ পর্যন্ত আপনারা জিবীত থাকবেন এসংবাদ দিল কে ? আশা করি এর অনেক আগেই আপনাদেরকে সাইবেরিয়ার জমিন গ্রাস করে ফেলবে। আপনারা কত নিরপরাধ আদম সন্তানকে হত্যা করেছেন তার পরিস্ংখ্যান কি আপনাদের ডাইরিতে দেখাতে পারবেন ? আমি সাইবেরিয়ার কুদিমকারা অঞ্চল চষে বেড়িয়েছি। দেখেছি বিভৎস চিত্র। হাজার হাজার মানুষের মরাদেহ ছাড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ ও দ্বীন দার পরহেজ গার লোক। তৃষার ভূমি এসব পবিত্র লাশ গুলোকে গ্রহন করেনি, হজম করেনি, গ্রাস করেনি। আমার মনে হয় এ সমস্ত পবিত্র লাশের উছিলায় জমিনের বিবর্তন আসেনি। তা ছাড়া দূর্বিনের সাহায্যে ২০/৩০ মাইল দুরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় চোখের পলকে বিশাল বিশাল পাহাড়গুলো গলে সমতল ভূমিতে পরিণত হচ্ছে, আবার সাধারণ সমভূমি পরিণত হচ্ছে জলাশয়ে। কিন্তু কুদিম কারা রয়েছে স্থির তার কোন পবিবর্তন নেই। এটা শহীদদের পবিত্র লাশের উছিলায়। আমি আরো বললাম জনাব সাইবেরিয়ার কুদিমকারায় অন্যসব লাশের সাথে আপনাদের কেও শোয়ে থাকতে হবে।

আজিম খান আমাকে লক্ষ্য করে বলল খুবায়েব ভাইয়া এদেরকে এখনই না মেরে আরো দু তিন দিন অবকাশ দেয়া হোক। এদের থেকে

হয়ত আরো কিছু জানা যাবে। খুবায়েব নাম শোনেই নেতাজীর হৃদকম্পন আরম্ভ হয়ে গেল বৈজ্ঞানিক মিস জমিলিনা ব্রুস এর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ফিস ফস করে বলল, কি হে খুবায়েব এই কি সে আলোচিত ব্যক্তি কিংবদন্ততি মুজাহিদ ? মিস জামিলিনা না, এহবে না। কারণ তার বয়স ও স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে তাবুঝা যায় না। তবে একে জিজ্ঞাস করে দেখতে পারি।

নেতাজী ওকি বলবে আসল কথা ?

জিজ্ঞাসা করা যাবে তো ?

অত পর নেতাজি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তোমার নাম কি ?

আমার নাম আবদুল্লাহ তবে সাথীরা আমাকে খোবায়েব জাম্বুলী বলেই ডাকে।

সত্যিকি তুমি খোবায়েব জাম্বুলী ? তোমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য তো আমরা ৫ লক্ষ ডলার পুরুস্কার ঘোষণা করেছি। তা হলে তুমিই সেই খোবায়েব ?

আপনারা যাকে খেঁজেন, আমি সেই খোবায়েব কি না তা জানি না। তবে এর আগেও আমি গ্রেপ্তার হয়ে ছিলাম। আমাকে আল্লাহ আপনাদের অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। এখন তো সাইবেরিয়ায়। বৈজ্ঞানিক না এ সে ব্যক্তি নয়। তার ছবি প্রকাশ হয়েছে। সে খুব দুর্দান্ত ও লাড়াকু মুজাহিদ। খুব ভয়ংর তার চেহারা।

তার ছবি তো আমরাই সংগ্রহ করে ছাপিয়েছি কিন্তু আজও পর্যন্ত এমন আকৃতির কোন মানুষ রাশিয়ায় কেউ দেখেনি।

এসব আলাপের মধ্যে দিয়ে দেখি সমস্ত আকাশ আলোকিত হয়ে গেল। প্রচন্ড আওয়াজে মনে হচ্ছিল সপ্ত আকাশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছিল। পুরা এলাকা আগুনের মত গরম এবং লাল হয়ে গেল। আমরা ভাবছিলাম এই বুঝি মহাপ্রলয়ের সিঙ্গা বেজে উঠল। চোখের পলকে বিকট আওয়াজে আমাদের থেকে ২০/৩০ মাইল দূরে উল্কা পিন্ড আঘাত হানল। দুর্বিনের সাহায্যে দেখলাম বিশাল তুষার পাহাড়টি ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করে দিল। আমার মনে হয় কয়েকটি উল্কা পিন্ড দুনিয়া ধ্বংস করে দিতে পারেবে। এতে আল্লাহ তাআলা এত শক্তি দিয়েছেন তা

প্রত্যক্ষ্যদর্শি ছাড়া বিশ্বাস করানো মুশকিল হবে। প্রতিরাতে দু একটি উল্কা পিন্ড আঘাত হানে। এটা আল্লাহর এক আজব কারিশমা। এর একটি পিন্ড যদি লোকালয়ে আঘাত হানত তবে ১০ টি এ্যটম রোমের ক্ষতির চেয়ে বেশী ক্ষতি হত। আল্লাহ আমাদেরকে কত হেফাজতে রেখেছেন। এর শোকরিয়া আদায় করার ক্ষমতা কার আছে? প্রানীজগতকে আল্লহ এমনি ভাবে হেফাজত করতে ছেন। আলস্নাহ যে কত হেকমত অলাও বিজ্ঞানময় তার কোন অন্ত নেই।

পর দিন আমরা সবাইকে নিয়ে আরো উত্তরে গিয়ে দেখার চেষ্ঠা করলাম। আনুমানিক ১৫-২০ মাইল উত্তরে গিয়েছিলাম। উত্তর দিকে কি যেন একটা আওয়ায হচ্ছিল। এ আওয়াজ বিরামহীন ভাবে হচ্ছিল। আমরা জানি সে দিকে কোন লোকালয় নেই। ইঞ্জিন চালিত কোন কিছু থাকার কথা নয়। কিন্তু মনে হচ্ছিল একটা ইঞ্জিন একই স্থানে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড ভাবে আওয়ায করছে। আমরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কপ্টারে ফিরে এলাম। অত পর নেতাজি আবার বললেন, বাবা ওয়ারলেছটি দাও। মস্কোতে র্বাতা পাঠিয়ে আর একটি কপ্টার আনাই। সে কপ্টারে করে তোমাদের কেও নিয়ে যাব। আমরা তোমাদেরকে জানের নিরাপত্তা দেব। আমি বললাম, আপনাদের জানের নিরাপত্তা নেই। আমাদের নিরাপত্তা দিবেন কি করে ? লোকটি ভয়ে আমার পায়ে লুঠিয়ে পরলেন এবং বললেন, বাবা এখন আমরা তোমাদের হাতে জিম্মি, দেশে ফিরলে তোমরা হবে আমদের হাতে জিম্মি। এ হিসাবে তোমরা আমাদের নিরাপত্তা দাও। আমরাও ওয়াদা করতেছি বিমান থেকে অবতরণ করে তোমাদের নিরাপত্তা দেব।

তার পর আমি ওয়ারলেছটি তাদের হাতে ফিরিয়ে দেই। মেয়েটি তৎক্ষনাত মস্কোর সাথে যোগাযোগ করে বলল আমাদের চালকের মৃত্যু ঘটেছে। আমরা কুদিমকারায় আটক রয়েছি। তোমরা অতি তাড়া তাড়ি উদ্ধার কর্মি পাঠাও। ওয়ারলেছ করার এক ঘন্টার মধ্যেই আর একটি শক্তি শালী কপ্টার আসে। তার পর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্রপাতি দিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা করে কাপ্টার ফিরে আসে। আমরাও কাপ্টারে চেপে বসলাম। তার পর রাত তিনটার দিকে আমাদেরকে নিয়ে কাপ্টার অবতরন করল মস্কোতে।

ছাব্বিশ

কমান্ডার আলায়েভ দুজন অদক্ষ,ও মূর্খ মুজাহিদদের এহেন সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে আল্লাহর অনেক অনেক শোকর আদায় করলেন। সাথীদেরকে নিয়ে দুশমনের পাকানো খাবার খেয়ে বললেন, বন্ধুরা আমাদের থেকে পালিয়ে যাওয়া দুশমনরা যখন তাদের আসল ঘাটিতে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা জানাবে তখন ওরা শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আমাদের উপর আক্রমন করে বসবে। তাই এখানে বিলম্ব না করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি এবং সামনে এগিয়ে যাই। এখানে বিশ্রামের পরিকল্পনা অবশ্যই বাদ দিতে হবে। গণীমতের সবগুলোমাল ভাগা ভাগী করে নাও। আর গাধাগুলোকে না নিয়ে ছেড়ে দেয়া ভাল হবে। কারণ এগুলো এখন ভেজাল হয়ে দাঁড়াবে।

কমান্ডার সাহেবের হুকুম পেয়ে সবাই মাল ছামানা নিজ নিজ অশ্বে বোজাই করে নিল। তার পর কাফেলা এগিয়ে চলল। সারা রাত পথ চলে ভোর বেলায় এক পাহাড় উপত্যকায় হাজির হল। স্থানটি অনেক নিরাপদ ও মনোরম। সবাই তাঁবু রচনা করে সামান্য আহারাদী করে ঘুমিয়ে পরল। কমান্ডার সাহেব একাই পাহারা দিয়ে সাথীদের আরামের ব্যবস্থা করে দিলেন। উক্ত স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করে আবার চলতে লাগলেন। বিশ্রাম নিতে নিতে আরো ৫ দিনের পথ এগিয়ে গেলেন। এখন অরন্য পথ শেষ। সামনে রয়েছে ধুধু মরম্ন ভূমি। প্রায় ২০ মাইল হবে এ মরম্নভূমিটি। এটা পারি দেয়া এত সহজ নয়। পূর্ণ কাফেলার পানি সাথে নিয়ে পথ চলতে হবে। তা নাহয় পথিমধ্যেই পিপাসায় ছটফট করে প্রাণ হারাতে হবে। সবাই নিজ নিজ মশকগুলো পানি ভর্তি করে বিরাট সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলল। সবিতা দগ্ধ বালুকাময় প্রান্তর। মরম্নৎ সমিরণে দেহ জালসিয়ে দিচ্ছে। নাসারন্দ্র ফেটে প্রবাহিত হচ্ছে শোণীতধারা। ঘর্মাপেস্নাত দেহ। অশ্বগুলো খুব কষ্টে এগিয়ে চলছে। অশ্বের পা বালুতে তলিয়ে যায় তাই চলার পথে ব্যঘাত সৃষ্টি হয়। মার্তুন্ড তাপে বিদগ্ধ ধরণী। আগুনে ভাজা বালুকারাশি। চাউল ফেলে দিলে খৈ ফুটবে। কাফেলা চলছে তো চলছেই। এক সময় অশ্ব গুলো পিপাসায় জিব বের করে ফেনপুঞ্জ নির্গত করতে লাগল। সাথীরা তা বুঝতে পেরে নিজ নিজ অশ্ব গুলোকে পানি পান করিয়ে পথ চলতে লাগল। বিশ্রাম নেয়ার মত নেই কোন স্থান,

নেই গাছ পালা। বাম দিকের গ্রামগুলোর দিকে দূর্বীন ধরে তাকালে আবছা আবছা দেখা যায়। কিন্তু সামনে কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না।

পরন্ত বেলা। ভাস্কর তেজ অনেকটা মন্দিভূত। একটু একটু হীম হাওয়া প্রবাহিত হতে লাগল। শ্রমক্লান্ত শরীর সজিবতা অনুভব করতে লাগল। এতক্ষণে সূর্যটা কস্তাকৃতি থালার মত মরু প্রান্তরে তলিয়ে যাচ্ছে। কাফেলা একটু বিশ্রাম নিয়ে খানা পানি খেয়ে অশ্বগুলোকেও কিছু ছুলাভুষি ও পানি পান করায়ে নিল। কমান্ডার বললেন, আমরা তিন ভাগের এক ভাগ পথ অতিক্রম করেছি। এখনো দুই ভাগ পথ রয়ে গেছে। মরম্ন ভূমিতে রাত্রে চলা আরাম দায়ক। আমি মনে করি একটু একটু বিশ্রাম নিয়ে যদি চলি তাহলে অল্প কষ্টে আমরা মরুভূমি পারি দিতে পারব। তাই চলুন আমরা চলতে থাকি। তার পর কাফেলা সামনে এগিয়ে চলল। সোবহে ছাদিকের সাথে সাথে কাফেলা মরুপ্রান্তর পারিদিয়ে এক স্থানে তাঁবু ফেলল । এখানে কিছু গাছ গাছালী আছে তবে পাতা গুলো কেমন যেন জলসানো। কিছু লাতা-পাতাও রয়েছে। এলাকাটা অসম তল। বাড়ী ঘর। পথ ঘাট। কিছুই নেই। এক অনাবাদি বদ্ধ ভূমি। বিশ্রামের জন্য এখানেই ছাউনি ফেললেন। এক দিন বিশ্রাম নিয়ে সামনে চলার পরামর্শ হল।

দশ জন অশ্বারোহী ধুলা-বালু উড়িয়ে যখন মরূপ্রান্তত্মর অতিক্রম করতে ছিল তখনই দুশমনরা দূর থেকে দূর্বিনের সাহায্যে দেখছিল। লক্ষ্য করছিল কাফেলা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে চলছিল গোয়েন্দা বা চোরা বিমান। যার কোন আওয়াজ নই উপর থেকে তাদের গতি-বিধি খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করছিল।

কমান্ডার আলায়েভের নিকট যে দূর্বীনটি ছিল তার দূরত্ব মাত্র ২০ কিলো মিটার। নাইট দূর্বীন ছিলনা তাদের কাছে। কাফেলা যখন পরন্ত বেলায় চলছিল তখন পিছন অর্থাৎ কাফেলার বাম দিক থেকে যে গ্রামটি আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল সে গ্রামেই ছিল মিনি ক্যান্টনমেন্ট সেখান থেকে ৩টি ট্যাংক কাফেলার পিছনে ছেড়ে দিল। ট্যাংকগুলো বালির উপর দিয়ে সাঁতার কেটে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। নাইট দূর্বিনের সাহায্যে পিছনের দিক থেকে কাফেলা দেখছিল।

সাথীরা খিমায় খিমায় অবসান্ন অবস্থায় ঘুমুচ্ছেন। অশ্বগুলো টেনে টেনে লতা পাতা ভক্ষণ করছে আলায়েভ একটি টিলার ঝুপের ভিতর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। তিনি দূর্বীন দ্বারা শুধু এলাকার বৈছিত্রময়

দৃশ্যাবলী অবলোকন করছেন আর খালি চোখে দেখছেন কোন দুশমন এদিকে আসছে কিনা। এতক্ষণে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে গেছে। রোদের প্রখরতা ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি ধূসর মরম্নভূমির চিত্র দেখার জন্য সে দিকে দূর্বীন ঘুরালেন। হায় একি সর্বনাশ দুশমনরা এক দম নিকটে এসে গেছে। তিনটি ট্যাংক সমান গতীতে বালুর উপর দিয়ে সাঁতার কেটে এদিকে আসছে। ট্যাংকগুলো এখনো ৫ কিলো মিটার দূরে রয়েছে। সম্মুখের ট্যাংকের উপরে মেশিনগান নিয়ে একজন সৈন্য বসে আছে। হাতে তার দূর্বীন। পেরেশান হয়ে এদিক সে দিক দেখছে। মনে হয় সেই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। সবগুলো ট্যানকে কাস্েত্ম হাতুড়ী মার্কা পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে।

কমান্ডার আলায়েভ কিংকতর্ব্যবিমূঢ়। কি করবেন না করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। তার পর তিনি সেজদায় পরে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মনে মনে বুদ্ধি উদিত হল। তিনি সবাইকে ডেকে জাগিয়ে বললেন-ভাই সব আপনার যে যেই খিমায় আছেন সেখান থেখে ক্রলিং করে টিলার উত্তর পার্শ্বে চলে আসুন। কেউ বিলম্ব করবেন না। বিপদ আমাদের মাথার উপর। সাথীরা সবাই ক্রলিং করে টিলার আড়ালে এসে গেল। কমান্ডার আলায়েভ সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন প্রিয় সাথীরা আমরা দুশমনের পাঞ্জার ভিতর রয়েছি। ট্যাংক বহর আমাদের পিছনে ধাওয়া করছে। এখান থেকে আনুমানিক ৫ কিলো মিটার দূরে আছে। এত ক্ষনে হয়ত আরো কিছু এগিয়ে আসছে। মোট কথা এখন আমরা তাদের রেঞ্জের ভিতর আছি। তোমরা অতি তাড়া তাড়ি একান্েত্ম প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারম্নদ, খাবার পানীয়,ওষুধ ও তাঁবু নিয়ে খুব তাড়া তাড়ি বেরিয়ে পর। আমাদের পূর্ব দিকে ঘন বন ও পাহাড় পর্বত রয়েছে। সেদিকে এগুলো সরিয়ে নাও। যে কয়টা তাঁবু টানানো রয়েছে এগুলো এঅবস্থায়ই রেখে দাও। তাঁবুর ভিতরে কিছু ছিড়া-ফাড়া কম্বল ও চট রেখে দাও। শুধু নূর মোহাম্মদ আমার সাথে থাক বাকিরা সব সে কাজগুলো ঘুচিয়ে নাও। মালগুলো নিরাপদ স্থানে রেখে দুজনকে পাহারাদারিতে রেখে বাকিরা আবার মাল নিতে এসে যাবে। যাও যাও জলদি যাও।

লেগে গেলেন। কমান্ডার সাহেব নূর মোহাম্মদকে নিয়ে অতিরোক্ত অস্ত্রগুলো একস্থানে জমাকরে যথা সম্ভব বিশেষ বিশেষ পার্সগুলো খুলে ফেললেন। তার পর অস্ত্রগুলোর নিচে একটি মাইল ফিট করে রাখলেন। তাবুগুলোতে চট ও ছেড়া-ফারা কম্বলগুলো এমন ভাবে রাখলেন যে কেউ দেখলে মনে করবে কম্বলের ভিতর মানুষ শোয়ে ঘুমাচ্ছে। তার পর তাবুর প্রবেশ দ্বারে দুটি করে ভূমি মাইন পুঁতে রাখলেন। আবার এক তাঁবু থেকে অন্য তাবুতে যাওয়ার পথেও মাইন বিছিয়ে রেখে দ্রুত চলে এলেন। অশ্বগুলো তখনো মনের আনন্দে লতাপাতা ভক্ষন করছিল।

দুশমন এতক্ষণে একদম নিকটে এসে গেছে। কয়েক জন সৈন্য ট্যান্ক থেকে অস্ত্রসহ নিচে নেমে এল। ওরা ভাবছিল এখানে হয়ত মুজাহিদদের বিশাল ঘাটি রয়েছে। তাই ঘাটি ধ্বংশের জন্য পাঠিয়েছে বহর। তাদের আয়োজন হিসাবে এখানে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছেনা। তিনটি তাঁবু দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকটি অশ্ব বিচরণ করছে। তা ছাড়া কোন দুর্গ, ব্যাংকার এমন কিছুই নেই। দুশমনরা পরামর্শ করল, মশা মারতে কামান চালাবনা। এরা সারা রাত মরুভূমি পারি দিয়ে এখন ঘুমাছে আর তাদের অশ্বগুলো ছেড়ে দিয়েছে ঘাস খেয়ে উদর পূর্ণ করতে। আমরা এদেরকে হত্যা না করে জিবিত গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসলে ভাল হয়। তাহলে এদের থেকে অনেক গুরুত্বর্পূন তথ্য পাব। তাই তারা চার চার জন করে তিন দলে বিভক্ত হয়ে তিনটি তাঁবুর দিকে সমান তালে এগিয়ে চলল। ওরা তাঁবুর দ্বার প্রান্তে পৌছার সাথে সাথে পর পর মাইন বিস্ফোরন হয়ে ১২ জন সৈন্য প্রাণ হারল। তাদের শরীরের অস্তিত্য রইল না। টুকরো টুকরো হয়ে চার দিকে ছাড়িয়ে পরল। এমন কি গাছে গাছেও ঝুলতেছিল তাদের শরীরের মাসং টুকরা।

বিকট আওয়াজে বন-বাদার, মাঠ-ঘাট প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মাটি কম্পনে মনে হচ্ছিল এই বুঝি মহাপ্রলয় সংগঠিত হল। অশ্বগুলো ভয় পেয়ে দিক-বেদিক ছুটা ছুটি করতে লাগল। আল্লাহর এক বিশেষ ধরনের প্রভু ভক্ত প্রাণী হল ঘোড়া। এ ঘোড়ার কথা আলস্নাহ পবিত্র কোর আনে ও উল্লেখ করেছেন। অনেক চিন্তা ফিকির ও গবেষনা করলে বুঝা যায়,

ঘোড়াকে আল্লাহ জিহাদের জন্যই সৃষ্ঠি করেছেন। যান্ত্রিক জগতে যে ঘোড়া জিহাদের কাজে ব্যবহার হবে তা কোন দিন কল্পনাও করতে রাজি ছিলাম না। এখন গেরিলা হামলা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, কিঁয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এসৃষ্টি যুদ্ধের জন্যে কাজে আসবে।

ঘোড়াগুলো ছুটা ছুটি করে পালিয়ে যায়নি। ওরা পাগল হয়ে তাদের প্রভুকে খোঁজতে ছিল। মুজাহিদরা নিজেরা বাঁচার জন্য তাদের বাহনকে দুশমনের হাতে ছেড়েদিয়ে এবং তুপের মুখে রেখে নিরাপদ স্থানে চলে গেল। অশ্ব নিয়ে যাওয়া তারা নিরাপদ মনে করেননি। অশ্বগোলো দেখে দেখে দুশমনরা মনে করবে মুজাহিদরা ভেগে যায় নি, এখানেই আছে। এসব চিন্তা করে অশ্বগুলো প্রভুদের যাওয়ার পথ ধরে, তাদের গায়ের গন্ধ নিয়ে তালাশ করে সেখানে চলে গেল। নিজ নিজ প্রভুর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মাথা ঠুঁকে আদর জাচ্ছিল। মুজাহিদরা তাদের প্রভুভক্ত দেখে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে ছিলেন, আয় আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করো। তাদের জানের বিনিময়ে আমরা বাঁচতে চেয়ে ছিলাম। এখন ওরাই বেচেঁ গিয়ে আমাদের নিকট ছুটে আসছে। আমাদের প্রতি রাগ করেনি পালিয়ে যায়নি। আলস্নাহ আমাদেরকে ক্ষমা করো। মাইন বিষ্ফোরণ হয়েছিল সকাল নয়টায়। এখন বিকাল ৩ টা। কমান্ডার আলায়েভ নূরমোহাম্মদকে সাথে নিয়ে দুশমনের অবস্থা দেখতে গেলেন। তাঁরা নিকটে গিয়ে এক গোপন স্থানে বসে দুর্বীনের সাহায্যে দেখতে ছিলেন। কিন্তু তিনটি ট্যাঙ্ক গুলো এতিমের মত পড়ে রয়েছে। কমান্ডার ট্যাংক বিষয়ে কোন এলেম নাথাকায় শুধু এক নজর দেখেই ফিরে এলেন।

অতঃপর সাথীদের নিকট সব ঘটনা খুলে বললেন, সবাই আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তার পর আবার আরম্ভ হল যাত্রা। চলতে চলতে আরো প্রায় এক মাস পর কাফেলা মারবানিয়া পাহাড়ে এসে উপস্থিত হল। প্রায় দুমাস লেগে গেল এখানে আসতে । এখন তারা নতুন করে ব্যাংকার খনন, মুর্চা নির্মান করতে লাগল। অন্য সাথীদের জন্যও তারা সুন্দর সুন্দর ব্যাংকার তৈরী করে রাখলেন। অতঃপর রেখে আসা সাথীদের আগমনের পথ পানে চেয়ে রইল।

সাতাইশ

রাত তিনটা। হেলিকপ্টার ল্যেন্ড করল মস্কো বিমান বন্ধরে। আমাদের দুসংবাদের কথা মস্কো বেতারে প্রচারিত হচ্ছে। এও প্রকাশ হচ্ছিল যে উদ্ধার কর্মিরা যন্ত্রপাতি নিয়ে সাইবেরিয়া পৌছেছে। আমাদেরকে দেখার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা কর্মিরা বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতে ছিলেন। আমরা কপ্টার থেকে নেমে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে ছিলাম কি করব? এখন তো আবার হায়েনাদের পঞ্জায় এসে ধরা দিলাম। আমাদের সাথের দুজন যুবতী মিস জমিলিন ব্রস ও মিঃ গালাবাথিন ব্রস আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা আমদের জীবন রক্ষা করেছ, আমরাও তোমাদের জীবন রক্ষার জন্যে আপরান চেষ্টা করব,এখান থেকে বের হওয়ার অন্য কোন পথ নেই। যদি থাকত তাহলে তোমাদেরকে সে পথে বের করে দিতাম। এখন তোমরা যদি একটু ঢিলা-মিশি কর তাহলে সাবাই তোমাদেরকে সন্দেহ করবে , তাই আমাদের সাথে সাথে চল। নিরূপায় হয়ে তাদের সাথে চললাম। গেইট থেকে বের হতে নাহতেই নেতা কর্মিরা আমাদের ঘিরে ফেলল। এল বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক। কার আগে কে ফটো নেবে তা নিয়ে চলছে প্রতিযোগীতা প্রাইভেট কারগুলো দীর্ঘক্ষণ যাবত আমাদের প্রতিক্ষায় ছিল। এবার আমাদেরকে নিয়ে যওয়া হল সরকারী অতিথী ভবনে। সেখানে আমাদেরকে উত্তম খানা খেতে দিল। খানা-পিনার পর চলল চা আর বিয়ার পানের পালা। আমরা দুজন এসব থেকে বিরত রইলাম। এবার এল বিশ্রামের পালা সবাই নিজ নিজ শয্যায় ঘুমিয়ে পরলেন।

আমার চোখে ঘুম নেই। আমার আত্মা ছটফট করতেছিল তাদের কব্জা থেকে বেরিয়ে যেতে কিন্তু কোন উপায় পাচ্ছিলাম না। অবশেষে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। কয়েক রাকাত নামায আদায় করে সেজদা বনত মস্তকে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পরলাম। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেছিলাম, প্রভুহে আমরা তোমার গোনাহগার বান্দা। আমাদের সমস্ত পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও। প্রভু গো আমাদেরকে যদি পরীক্ষা কর তা হলে পাশ করার তওফিক দাও। তোমার রহমত বিহনে আমাদের আর

কোন পাথেয় নেই। তুমি আমাদেরকে অনেক অনেক বার সাহায্য করেছ,যদিও আমরা তার উপযুক্ত নই। এখন আমরা তাদেরই হাতে বন্দি। তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দাও। প্রার্থনা করতে করতে আমি ভাব দরিয়ায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। কি বলছি না বলছি তা বলতে পারিনি। আমার কান্নার শব্দ পেয়ে মিস জমিলিনা শয্যা ত্যাগ করে আমার পার্শ্বে এসে বসল। আমি ভাবছিলাম আজিম খান হয়ত আসছে। আমার ধ্যান ভঙ্গ হল। আমি আজিম কে জড়ায়ে ধরে স্বস্নেহে বুকের কাছে টেনে নিলাম সেও আমাকে জড়ায়ে ধরল। অতঃপর বললাম,আজম ভাই আমাদের মুক্তির কোন পথ দেখছিনা। ভোরেই হয়ত আমরা আবার গ্রেপ্তার হচ্ছি। জানি না এবার আমাদের কে কোথায় প্রেরণ করে।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমার বাহু বন্দনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল নারী কণ্ঠ। আমি চমকে গিয়ে ওকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কে তুমি ? অন্ধকারে আমার কোল দখল করে নিলে ? উত্তর এল আমি তোমারই একজন হিতাকাঙ্খী বোন মিস জমিলিনা ব্রস। তোমার কান্না আমাকে শয্যা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

আপনি আমাকে জড়ায়ে ধরলেন যে ------

আপনি আগে ধরেছেন তাই আমি ধরেছি।

আমি তো আজিমকে মনে করে আদর করে ধরেছি।

তা তো আমি জানি না। আমি তো ভাবছি আমাকেই ধরেছেন

আপনি এক জন গায়রে মাহরম সুন্দরী রমণী, আপনাকে অমনভাবে ধরে বুকের কাছে টেনে নেয়া কি জায়েয আছে ?

আমি কি তা জানি ? অনেকেই তো আমার এ ধরনের ভালবাসা বিনিময় করে। আমি তো তাই ভাবছি।

ছিঃ ছিঃ কি নোংড়ামী !

তুমি কেঁদে কেঁদে কি বলছিলে ?

আল্লাহর নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিলাম।

আমরা তোমাকে মুক্তির জন্য আশ্বাস দিয়েছি তা সত্য। এখন চিন্তা করে দেখি এটা এত সহজ নয়। নেতা কর্মিরা তোমার পরিচয় চাইলে আমরা কি পরিচয় দেব ? তোমাদেরকে নির্বাসন দিতে আমরা গিয়ে ছিলাম ৬ জন। এর মধ্যে দুজন ছিল চালাক। দুজন চালাকসহ আমাদের দুজন

নেতা নিহত হয়েছেন। জিবীত আছি দুজন এখন আমরা হলাম ৪ জন তাহলে তোমরা কারা ? সকলের অন্তরেই ঘুরপাক খাবে। যদি বলি, যাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম, এরাই তারা। তাহলে প্রশ্ন জাগবে এদেরকে আনাহল কেন ? আর যদি বলি এরা আমার ফ্রেন্ড। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এদেরকে পেলেন কই ? ৬ জনকে হেলিকপ্টারে উঠানোর সময় আপনাদের ছবি রেখেছিলাম। তখনতো এসব চেহারার কোন মানুষ ছিলনা, তাহলে এরা কারা ? এ প্রশ্নের ও জবাব দিতে পারব না। এখন চিন্তা করে দেখছি তোমরা গ্রেপ্তারই হয়ে আছ। তবে তোমরা কোন চিন্তা করো না। তোমাদেরকে যদি জেল খানায় পাঠায় বা অন্য কোথাও পাঠায় তা হলে সেখানে তোমার মুক্তির ব্যপারে চিন্তা করব। জীবন দিয়ে হলেও মুক্ত করার চেষ্টা করব। এর মধ্যে কোন প্রকার অলসতা বা কাঁপন্যতা করব না। যদি তোমাদের বের করতে টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় তবে ওয়াদা দিচ্ছি পাক্কা ওয়াদা যত টাকাই লাগুক না কেন সব টাকা আমি একাই বহন করব এবং তোমাদের কে মুক্ত করব। তোমাদের মত অমায়ীক,ভদ্র ও দরদী লোক আমি আর পাইনি। তোমরা আমাদের অন্তর জয় করেছ। প্রাণ রক্ষা করেছ। উত্তম ব্যবহার করেছ, উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছ। কাজেই তোমাদেরকে মুক্ত করেই ছাড়ব। এসব আলাপ আলোচনা করতে করতে ফজর হয়ে গেল। আমি চুপি চুপি আজিম খানকে জাগিয়ে ফজরের নামায পড়ে নিলাম।

ভোর হল সকলেই শয্যা ত্যাগ করে পেশাব পায়খানা সেরে হাত মুখ ধুয়ে একত্রে জমা হতে লাগল। সবাই এসে গেল চা নাস্তা হাজির করা হল। আমরা সবাই নাস্তা সেরে নিলাম। আমাদের সাথে কমিউনিষ্ট কয়েক জন নেতা ও উদ্ধার কর্মিদের মধ্য থেকে দু তিন জন লোক ছিল। নাস্তার পর্ব শেষ হলে আরম্ভ হল সাইবেরিয়ার কাহিনী। কাহিনী শোনাচ্ছেন আমাদের সাথী নেতাজি। তিনি বলতেছিলেন আমরা কিভাবে গেলাম, কপ্টার কিভাবে অবতরন করল, তার পর চার জন সাথীকে কিভাবে বরফে গিলে ফেলল, সেখানকার প্রাকৃতি দৃশ্যাবলী কি ধরনের আমরা কি কি ছবি ক্যামারা বন্দি করেছি। তার পর কিভাবে উদ্ধার কর্মিরা আমাদেরকে উদ্ধার করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে একটা শোনলাম নতুন খবর যা ইতি পূর্বে জানতাম না। উদ্ধার কর্মিরা যাওয়ার সময় দুজন পাইলট অতিরক্ত নিয়ে ছিলেন, পতিত কপ্টার আনার জন্য। দুজন পাইলট আর কয়েক জন উদ্ধার কর্মি নিয়ে কপ্টারটি আকাশে ডানা মেলে। এক হাজার ফুট উপরে

উঠাতেই যান্ত্রিক গোলযুগের কারনে ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। উক্ত কপ্টারটি যাত্রিসহ আকাশেই জ্বলে পুড়ে বস্ম হয়ে যায়। একটি যাত্রী ও কোন পাইলট বাঁচতে পারেনি। আর যে ৪ জনকে বরফ গিলে ফেলেছে তার কারণ বৈজ্ঞানিক গন পরীক্ষা নিরিক্ষা করেও উদঘাটন করতে সক্ষম হননি।

এসব আলোচনার পর পরই এসে গেল আমাদের প্রসঙ্গ। প্রশ্ন উঠল আমরা কে ? কোথেকে এলাম, কিভাবে এলাম। এর ছহি কোন উত্তর কেউ দিতে পারেননি। মিস জমিলিনা বললো, এদের কে আমরা কুদিমকারা থেকে কুড়িয়ে এনেছি। কখন কিভাবে এরা সেখানে গেল তা ওরাও বলতে পারেনি। তাদের দুরবস্থা দেখে খুবই মায়া লাগল। তাই তাদেরকে আমাদের সাথে নিয়ে এসেছি। তবে লোক দুটি খুবই ভাল। তাদের আচার ব্যবহারে আমরা খুশী। অন্য এক জন বললেন এরাযে রুহানী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর মুজাহিদ ও হতে পারে। অপর একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন কি হে যুবক তোমার নাম কি ?

আমার নাম আব্দুল্লাহ বিন মাসরুর

খোবায়েবকে চিন ?

আমারই অপর নাম খোবায়েব।

আরে গাধা তুমি না। মুজাহিদদের নেতা ও কমান্ডার তাকে তুমি দেখছ কি না ?

আমি ছাড়া অন্য কোন খোবায়েব আছে কি না তা জানি না।

তা হলে তুমিই কি মুজাহিদ খোবায়েব ?

মুজাহিদ ছিল আমার চাচাত ভাই তার বয়স ছিল দু বৎসর। সুন্দর করে হাসত, ভাইয়া বলে ডাকত। সে তো অনেক আগেই মরে গেছে। আমি শুধু খোবায়েব। মুজাহিদ মরে গেছে।

যুদ্ধ করে যে সে মুজাহিদের কথা বলছি।

আমাদের গ্রামে মুজাহিদ নামক কোন আর্মী নেই.

এই শালা যারা যুদ্ধ করে তাদের কে মুজাহিদ বলে।

অ--- তাহলে আর্মীদেরকে মুজাহিদ বলে। কারণ আর্মীরাই তো যুদ্ধ করে তাই না ?

মুড়ু

মুন্ডু আপার বিয়ে হয়ে গেছে অনেক আগেই।

তোর মাথা ! তোর বাবার মাথা।

আমার মাথা আমার সাথে, আব্বারটা পৃথক। সবাই খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। অপর এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সেখানে গেলে কি ভাবে ? উত্তরে বললাম, আমরা একদিন রাত্রে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন কতগুলো লোক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আমাদের সম্মুক দিয়ে দৌড়িয়ে গেল। আমরা এদেরকে ডাকাত মনে করে ভয় পেয়েছিলাম। তার পর আর্মীরা এসে আমাদেরকে ধরে নিয়ে যায় তার পর মাইর পিট করে আরো কজনের সাথে আমাদেরকে হেলিকপ্টারে করে সেখানে ফেলে আসে।

তোমরা কত দিন সেখানে ছিলে ?

সেখানে তো দিন নেই আর রাত অনেক লম্বা ১৫ মিনিট সুর্য দেখেছি তার পর আবার রাত।

তোমরা বাঁচলে কিভাবে ?

তা বলতে পারিনি। এর পর উনারা আমাদেরকে নিয়ে আসছেন ।

বাড়ী কোথায় ?

দুসানবে।

লেখা পড়া শিখেছ কি ?

হাঁ, শিখেছি।

কত টুকু ?

মাপবো কি দিয়ে, মাপতে পারিনি।

তুমি কি গাধা ?

না স্যার মানুষ।

মানুষ হলে তো বলতে পারতে। কয় ক্লাস পড়েছ ?

ওয়ান, টু। দুই ক্লাস স্যার।

তাহলে তুমি বিরাট শিক্ষিত ?

জী স্যার। বানান করে পড়তে পারি।

কুরআন শরীফ ও কি পড়তে পার ?

হ্যাঁ, দাদা পড়তেন, শোনে শোনে অনেক শিখেছি।

পড়ত শোনি ?

আউজু বিল্লাহিমিনাস শায়তানের রাজিম বিট মিসমিল্লাহির রাকমানের রাহিম। আলাহামদু লিল্লাহি রাব্বেল আলামীন। আরকমানের রাহিম, মালেকের এও মেদ্দীন। আর কয়েক লাইন পরে আছে আমীন। মধ্যের গুলো পারি না।

নামাযের দোয়া টুয়া পার না ?

পারি স্যার, শোনেন। আট্রাহিয়াটু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আত্তাহিয়াটু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। স্যার ! খালি পেচ লাগে। আট্রাহিয়াটু গিয়ে সূরা ফাতিহার ভিতর ঢুকে পরে।

আচ্ছা আচ্ছা তোমাকে ধন্যবাদ।

কি বললেন স্যার ?

তোমাকে ধন্যবাদ দিলাম।

কই দিলেন, পেলাম না তো, হাতে দেন। (সবাই হেসে কুট-পট)

তোমাকে কারাগারে যেতে হবে, রাজি আছ ?

স্যার আমিতো চিনি না, ঠিকানা আর ভাড়া দিলে আশাকরি যেতে পারব। দূর কতটুকু ?

বেশী দুরে নয়, আমরাই পৌছেয়ে দেব।

তাহলে তো ভালই হয়। আপনারা সেখানেই থাকেন ?

আমরা সেখানে থাকব কেন ? আমরাকি আসামী ?

স্যার আমরা আসামী না, আমরা তাজিক। আমাদের এখান থেকে আসাম অনেক দুরে। আসাম ভারতের মধ্যে। আমার কথা শোনে অনেকেই হাসল, আমার দিল কাদল। তার পর পুলিশ ডেকে এনে আমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এদুজনকে জেলখানায় পাঠিয়ে দাও। পুলিশ আমাদের হাতে হ্যান্ডকাপ পরাল। আমরা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে চোখের পানি দিয়ে দাঁড়িকে গোসল করাতে লাগলাম। আমাদের দাঁড়িগুলো কত বার যে অশ্রুতে গোসল করেছে তার কোন হিসাব নেই।

পুলিশ আমাদেরকে ভেড়াদুম্বার মত টেনে টেনে ভ্যানে নিয়ে উঠাল। ভ্যান চলছে নিষ্টুর জেল খানর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে

পৌঁছে দিল লাল দালানে। গেইট থেকে বন্ধুকের বাঁট দিয়ে পাছার মধ্যে কয়েকগা বসিয়ে স্বাগত জানাল। তার পর নিয়ে গেল যাবত জীবন সাজা প্রাপ্ত কয়েদিদের সেলে। চেয়ে দেখি এটা সেই সেল যেখান থেকে আমাদেরকে সাইবেরিয়া সফরে নিয়ে ছিল। আমাকে পেয়ে অন্য সব সাথীরা আনন্দে আত্ব হারা। অনেকেই শ্লোগান দিতে দিতে আমার কাছে আসলেন। তার পর থেকে এখানেই থাকতে লাগলাম।

আমি সমস্ত জেলখানার সাথীদেরকে আমার ইতিহাস শোনায়ে ঈমান তাজা করলাম। তার পর বললাম, ভায়েরা দুনিয়ার জেল খানা শত শত গুন ভাল জাহান্নাম থেকে। দুনিয়ার রিমান্ড শত শতগুন উত্তম কবরের শাস্তি থেকে। আল্লাহ আমাদের দরজা বুলন্দ করার জন্যই বার বার কারাগারে নিক্ষেপ করছেন। তিনি দেখছেন এর পরও তাঁর প্রতি আমরা সন্তষ্ট কিনা ভায়েরা আমার! আল্লাহর প্রতি সবর্দা সন্তুষ্ট থাকুন। এতেই আমাদের মঙ্গল, কামিয়াবী ও সফলতা। আমার আলোচনায় অনেকেই তওবা করে সঠিকপথে ফিরে এলেন। মানবতার ধ্বজাধারী আমেরিকা, রাশিয়া ফ্রান্স, ইসরাইল, ও যুক্ত রাজ্যের দু-পাবিশিষ্ট লেজ বিহিন কুকুরেরা খেউখেও করে দুনিয়া বাসীকে জাগিয়ে তুলে। মানবাধিকারের জিকির তুলে। আসলে এরা জারজ সন্মান। বাপের কোন ঠিকানা তাদের মায়েরাও বলতে পারে না। তাই তারা মুখে বলে একটা অন্তরে থাকে আরেকটা। কাজ করে অন্যটা। এগুলো হল নেতা খেতাদের আচরণ। জেলখানার মধ্যে কাগজে পত্রে দেখায়। আমাদেরকে এদিচ্ছে এখাওয়াচ্ছে। আসলে শত ভাগের এক ভাগও আমাদেরকে দিচ্ছে না। মুসলমানদের খাবার পরিবেশন না করে নিষিদ্ধ খাবার যেমন শূকর, শিয়াল, ভাল্লুক ইত্যাদি। অর্থাৎ হারাম খাদ্য দেয়। পানি হিসাবে এনে দেয় পাকা মদ। অনেকেই না জেনে না বুঝে এগুলো খাচ্ছে। তিন দিন পর পর খানা দেয়। ধর্মীয় অনুশাসন মানতে দেয় না। মেয়ে ও পরুষের জন্য একই পোষাক, একই সেল। এরা মুসলমানদেরকে এতই কষ্ট দেয়। মুসলিম নামধারী তাদের পা চাটা গোলাম কিছু রাষ্ট্র প্রধানরাও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে মানবাধিকরের জিকির তুলে। তারা কোন দিন পশ্চিমাদের আচরনের প্রতিবাদ করে না। আমাদের উপর যখন নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল তখন আর বরদাস্ত করতে পারলাম না। আমি আমার প্রশিক্ষণ লব্ধ এলেমকে কাজে লাগাতে

লাগলাম। অর্থাৎ কমান্ডোজ ষ্টাইলে হাত পা এস্তেমাল করতে লাগলাম। একই দিনে ৭ জন জালেম জেল কর্মকর্তাকে বালিশ ছাড়া করিডোরে জীবনের তরে ঘুম পারালাম। এ সংবাদ ছড়িয়ে পরলে কর্মকর্তারা এসে পাইকারীহারে মাইর পিট আরম্ভ করল। আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম,সাবধান পাইকারী হারে মারবেন না। জালেমদেরকে আমি হত্যা করেছি,তখন এরা আমার উপর চটে গিয়ে ডান হাতটি কেটে দেয়।

আটাইশ

অমানিশার ঘোর অন্ধাকারে ছেয়ে আছে দশদিক কাঁটা-গুল্ম আর ঘন ঝোঁপ ঝারে ভরা চার দিক। কোন মনুষ্য এমন পথ দিয়ে চলেনি কোন দিন। কাঁটারা যেন পূর্ব শত্রুতা বশত কেবলই আঘাত করে যাচ্ছে। জুলাইখার মত অঙ্গবসন ছিড়ে দিচ্ছে পথিকের। বন্য হায়েনার ভয়ে গা ছম ছম করছে। শুকনো পাতর আর্তনাদে গা শিউরে উঠছে। বন বাদুরের পালকের পত পত ধ্বনিতে ও শরীর কাঁপছে। কখনো কখনো দূরে শোনা যাচ্ছিল কিসের আওয়ায। কোন হিংস্র প্রাণী যেন নিরীহ কোন জানোয়াররকে ধরে ভক্ষণ করার জন্য দৌড়াচ্ছে। রাত পোহানোর কোন নামগন্ধ নেই। এত লম্বা রজনীর সাথে আর কোন দিন সাক্ষাত হয়নি। দেখেনি অমন কুলহীন কান্তার। চলতে চলতে শরীর ক্লান্ত হয়ে পরল। পা দুটি দেহের ভার বহন করতে অক্ষমতা প্রাকাশ করছে বার বার। ক্ষুধায় জীবন ওষ্টাগত। প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জির থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে । দিক হারা পথিক দল। কোথায় যাচ্ছে কোথায় তাদের ঠিকানা কারো জানা নেই। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের সম্মুখে এসে ছালাম ঠুকছে। কূলহীন গহিন কান্তারে হারিয়ে গেল অনীক দল। সাথীদের চলার অক্ষমতা দেখে মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী চিন্তায় পরে গেলেন। তিনি ফগুদায়েভকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, অরন্য পথ শেষ হওয়ার বাকি কতটুকু ? ফাগুদায়েভ ছিলেন রাহাবর। কিন্তু তিনিও জানতেন না কোন দিকে যাচ্ছেন বা অরন্য পথ শেষ হবে কতক্ষনে। তিনি আমীর সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, হযরত আপনাদের চেয়ে আমি বেশী জানি বলে ধারণা করাটা অধমের উপর জুলুম হবে। সিপাহ সালার বলখী নিরুৎসাহিত

হয়ে বললেন কোথাও চলার ইতি টানা হোক। বিশ্রাম না নিয়ে আর চলা যাবে না। ফাগুদায়েভ একটি স্থানে দাড়ালেন। স্থানটি ছিল ঘন ঝোঁপ-ঝার থেকে মুক্ত। সবাই বসে পরলেন। কার সাথে কে বসলেন, অন্ধকারে তাও চিনা যাচ্ছিল না। সিপাহ সালার বলখী সকলকে বললেন, ভাই সব তোমদের কাছে যে সব খাবার রয়েছে তা বের করে খেয়ে নাও। তোমরা হীনবল ও নিরাশ হয়োনা। হীন বল ও নিরাশ হওয়া মুসলমানের কাজ নয়। তা ছাড়া মুজাহিদদের জন্য তো মুটেই, শোভা পায় না।

কমান্ডারের নির্দেশ পেয়ে সবাই নিজ নিজ খাদ্য ভাঁন্ডারে হাত ঢুকিয়ে আহার করতে লাগল। এমন সময় বৃক্ষরাজির ফাঁক দিয়ে আকাশ ছোঁয়া অদভুত আকৃতির এক দৈত্য হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল। সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিল সে জন্তুটি। এমন ভয়ন্‌কর আকৃতি দেখে কয়েক জনই মুর্চা খেয়ে জমিনে লুটিয়ে পরল। আর অন্যরা চোখ বন্ধ করে সিংহ তাড়িত শশক শাবকের ন্যায় র র করে কাঁপতে ছিল। কারো মুখে কোন ভাষা নেই। ভয়জনিত শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। সিপাহ সালার মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী বুঝতে পারলেন এটা জ্বীন দের এলাকা। এটা জিন্নাতেরই কাজ। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বললেন, হে আল্লার এক রহস্যময় সৃষ্টি আমরা দ্বীনের মুজাহিদ, আল্লাহর পথের সৈনিক । আমাদেরকে উক্তত্ব করা তোমাদের উচিত হয়নি। তোমরা সীমা লঙ্গন করেছ। আল্লাহ তোমাদের কে মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর এখন তোমরা ভয়ংকর আকৃতিতে আমাদের সামনে হাজির হয়ে ভয় দেখাচ্ছ। মনে রেখ কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ নিজে তোমাদেরকে ভয় দেখাবেন। সে দিন তোমাদের সাহায্যকারী বলতে কেউ থাকবে না নবীজীও (সাঃ) ঘার ফিরিয়ে থাকবেন তোমাদের থেকে। কিয়ামতের বিভিষিকাময় দিবস থেকে পরিত্রান পেতে হলে সুরত পাল্টিয়ে আমাদের মাঝে এস, ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থী হও। আমরা ক্ষমা করে দেব। আর যদি কোন অভিযোগ হাকে তাহলে বল, আমরা বিবেচনা করে দেখব।

এতটুকু বলার সাথে সাথে জ্বীনটি ভয় পেয়ে গেল। আখেরাতের ভয়ে তাকে কাবু করে ফেলল। অতঃপর জ্বীনটি তার ছুরত বদলিয়ে এক জন মানুয়ের আকৃতি ধারন করল। তার পর একটি উজ্জল প্রদীপ জ্বেলে দিল এ

প্রদীপের আলোতে গোটাবন আলোকৃত হয়ে গেল। অতঃ পর সে নিজেই এসে দাঁড়াল কাফেলার মধ্যে চলল সালাম মোসাফাহা। যারা মুর্চা খেয়ে ছিল তারাও চোখ খুলতে লাগল। তার পর জীনটি অনেক ফল মুল ও নানান প্রকারের সুস্বাদু খাবার এনে সবাইকে খাওয়াল। সুবহে সাদিকের আগমণ আর রাতের পলায়ন এক সাথেই হল। সাথীরা কয়েকটি জামাতে ভিবক্ত হয়ে নামায আদায় করলেন। জামাতে জামাতে আরম্ভ এলা এস্তেমায়ী আমল অর্থাৎ ৪১ বার সুরায়ে ইয়াসিন, এক বার সুরায়ে ওয়াকেয়া ও সুরায়ে আর রাহমান, শত বার দরূদ সহ বেশ কিছু তাসবিহাত। এতে কেটে গেল এক ঘন্টা। তার পর আরম্ভ হল সালাতুল এশরাক। নামায সমাপনে আরম্ভ হল দোয়া, ভাব সাগরে উঠল কান্নার রোল, চোখে ডাকল অশ্রুর বাণ, প্লাবিত হল গন্ডদেশ ও বক্ষদেশ।

কান্নাকাটির মধ্যে রয়েছে দিলের প্রশান্তি, আল্লাহ হন খুশী। তাই আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কাঁদো, নাপারলে কান্নার ভান ধরো। শুস্ক মরু প্রান্তরে যেমন শষ্যদানা অংকুরিত হয়না, ঠিক তেমনিভাবে পাষান হৃদয়ে রহমতের বীজ গজায়ে না। অনুতপ্ত উর্বর হৃদয় ভূমিতে তওবা নামক সশ্য বীজ বপন কর, তার পর মাঝে মধ্যে অশ্রুর সেচ দাও, দেখবে আল্লাহর রহমতে ছোট বড় সব ধরনের গোনার কৃষ্ণ ফসল গোলো নেকী নামক সোনালী ফসলে হৃদয় মাঠ ভরে যাবে। তোমার মাওলা তোমাকে ইয়া আবদী বলে ডাক দিবেন। হযরত মূসা (আঃ) এক দিন আনমনে পথ চলছেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে তাঁর র্কন কুহরে ইথারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসল এক করুন কান্নার সুর। হযরত মূসা (আঃ) অন্ত্মরে বড় ব্যথা পেলেন। তিনি ভাবলেন, এজনহীন বিজনবনে কেউ হয়ত বিপন্ন অবস্থায় কাঁদছে, হয়ত কোন ডাকাত দলের কবলে পরে সর্বহারা হয়ে গেছে, নাহয় পথ ভুলে গহীন কান্তারে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। তানাহয় হিংস্র হায়েনারা আক্রমন করছে। এসব ভেবে নবী তাকে উদ্ধার করার জন্য কান্নার সুর ধরে এগিয়ে গেলেন। কিছু অগ্রসর হয়ে দেখলেন এ কান্না মানুষের নয়। একটি বিশাল কৃষ্ণ শিলা থেকে এসুর লহরী বেরিয়ে আসছে এবং সে পাথর থেকে পানি বের হচ্ছে। হযরত মূসা (আঃ) কিছুক্ষণ বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন হে পাথর তুমি অমন করে কাঁদছ কেন, তোমার কি হয়েছে ? অমনি পাথরের যবান খুলে গেল। প্রস্তর খন্ড বিধৃত কন্ঠে বলল, আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন দোযখের ইন্দন হবে মানুয এবং পাথর। কি করে অনাদী অনন্তকাল জাহান্নামের

আগুনে দগ্ধ হব, কি করে তা সয্য করব এ ভয়ে কাঁদছি। পাথর থেকে বেরিয়ে আশা শব্দগুলো শোনে হযরত মূসা (আঃ) স্তম্বিত হয়ে গেলেন এবং মনে মনে ভাবতে ছিলেন যে, হায় নির্জীব পাথর হয়ে বিভিষিকাময় জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে দগ্ধ হওয়ার ভয়ে কাঁদতেছে, আর আমরা মানুষ নিশ্চিন্তে বসে আছি। তিনি পাথরকে শান্তনা দিয়ে বললেন তুমি কেঁদনা আমি তোমার মুক্তির জন্য পরওয়ারদেগার আল্লাহর নিকট সুপারিশ করব। এবলে তিনি চলে গেলেন।

তুর পাহাড়ে চলল আশেক আর মাশুকের প্রেমালাপ। এক পর্যায়ে মূসা বলে ফেললেন, হে আমার মাওলা আমার ফরিয়াদ কবুল কর,তানাহয় আর কোন দিন তোমার সাথে কথা বলবনা। তোমার ভয়ে কঠিন শিলা কেঁদে কেঁদে বিগলিত হচ্ছে। তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান কর। প্রেমিকের আবদার কে না রাখে আল্লাহ জালস্নাশানুহু পাথরকে ক্ষমা করে দিলেন। হযরত মুসা (আঃ) প্রেমালাপের ইতি টেনে খুশী মনে চলেছেন। পাথরের নিকট গিয়ে শোনিয়ে দিলেন শুভ সংবাদটি এবং বললেন; আর কেদনা। আলস্নাহ আমার ফরিয়াদ কবুল করেছেন, তোমাকে জাহান্নাম থেকে নিস্কিতি দান করেছেন। এবলে তিনি চলে গেলেন। কিছু দিন পর মুসা (আঃ) সে পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। কানে এল পূর্বের তুলনায় আরো বেশী বিলাপ গীতি। চললেন কান্নার সুর ধরে। দেখলেন সে পাথরটিই কাঁদছে। তিনি অগ্নিশর্মা ধারন করে ধমকিয়ে সুধালেন তোমাকে সে দিন মুক্তি র পয়গাম শোানিয়ে ছিলাম, তাকি তুমি শোননি ? না বিশ্বাস করনি ? সে দিনও কঠিন শিলার যবান খুলে বেরিয়ে আসল হে কালিমুল্লাহ আল্লাহর বন্ধু আপনার সুসংবাদ শোনেছি এবং বিশ্বাস ও করেছি। যে কান্নার উসিলায় আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছি, সে কান্নাকে আমি ভুলি কি করে ? কান্না আমার বন্ধু, কান্না আমার আপনজন, আজীবন আমি কেঁদে যাব। কান্না আমার দিলের প্রশান্তি। হযরত মূসা (আঃ) পাথর থেকে মহা মূল্যবান উপদেশ পেয়ে আশ্চার্য্য হয়ে গেলেন। হ্যাঁ পাথর তো ঠিকই বলেছে। আল্লাহর সুরে সুর মিলিয়েছে "আল্লাহ বলেন অল্পসময় হাস, আর কাঁদ বেশী সময়। তাই মুজাহিদদের বক্ষদেশ প্লাবিত হচ্ছে অশ্রুর স্রেত ধারায়। আয় আল্লাহ ! অমন করে সবাইকে কাঁদার তওফিক দাও। পাষাণ হৃদয় কোমল করে দাও।

দোয়া সমাপন করে সবাইকে হালকা নাস্তার অনুমতি দিলেন। সবাই নিজ নিজ থলে থেকে খেজুর কিসমিস বা শুখনো রুটি দিয়ে নাস্তা সারলেন। কমান্ডার সবাইকে পরামর্শের জন্য আহব্বান করলেন। নিজ নিজ অস্ত্রগুলো সুম্মখে রেখে কমান্ডারের দিকে মুখকরে বসলেন কমান্ডার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা যত টুকু বিশ্রাম নিয়েছেন এতটুকু চলবে, না আরো বিশ্রাম নিতে চান ? এক জন দাঁড়িয়ে বললেন হযরত কাঁটার আঘাতে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত। পাদুকা ভেদ করে মাংস পেশিতে প্রবেশ করেছে অগনিত কাঁটা। এখন কেউ দাঁড়াতে পারছে না সোজা হয়ে। এগুলো খুলতে হবে। দূর্গম পথ যেতে হবে বহুদূর। নেই কোন সাওয়ারী, দুটু পা আমাদের বাহন। দু এক দিনেই যদি অচল হয়ে যাই তাহলে বাকি পথ চলব কি করে ? আমি মনে করি যে পরিমান হাটব, সে পরিমান বিশ্রাম নিব, যে পরিমান জাগব সে পরিমান ঘুমাব, তাহলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে কর্ম স্পৃহা থাকবে অটুট। তা নাহয় আমাদেরকে বিপদের সম্মুখিন হতে হবে। দু এক জন সাথী ও যদি অসুস্থ হয়ে যায় তা হলে সকলেরই কষ্ট হবে দ্বীগুন। তার পরও যদি আপনি আমাদেরকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন তাহলে আমরা হুকুম তামিলে প্রস্তুত আছি। আমীর সাহেব চিন্তা-বিবেচনা করে বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন তোমরা ৫ জনে মিলে একটি তাঁবু রচনা করে নাও। তাহলে আরামের সাথে বিশ্রাম করতে পারবে। এবার সবাই তাঁবু রচনা করে বিছনা বিছিয়ে ঘুমাতে লাগলেন। কোন কোন খিমায় সাথীরা একে অপরের পায়ের কাঁটা খুঁটিয়ে খাঁটিয়ে তালাশ করে বের করে দিচ্ছে। সারা রাতের অসহনীয় ক্লান্তি আর পেরেশানী কিছু কিছু বিদায় নিতে লাগল। কেউ কেউ রাতের দৈত্যের উপস্থিতি আর ভয়ঙ্কর বিভৎস চেহারার কথা আলাপ করতে যেয়ে গা জারা দিয়ে উঠছে।সবাই নিজ নিজ খিমায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে আমীর সাহেবের চোখে ঘুম নেই। কখন আসে দুশমনের আক্রমন, কখন আসে হিংস্র বন্য পশুর থাবা, কখন বিকট চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয় দৈত্য দানব, সে চিন্তায় তিনি অস্থির। তাই তিনি সাথীদের হেফাজতের জন্য ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছেন। হাঁ যারা বড় হয়, তাদের চিন্তাও থাকে বড় কাজও থাকে বেশী, আল্লাহর নৈকট্যেও তারা অগ্রগামী।

ঊনত্রিশ

কমান্ডার আলায়েভ সাথীদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন আশপাশের এলাকা গুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। এটাও গেরিলা যুদ্ধের অংশবিশেষ। তিনি আরো বলেন, গেরিলারা এক স্থান থেকে দুশমনের উপরে হামলা চালাবে, অন্য স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেবে। আক্রমন করে চলে যাবে উল্টোদিকে। শত্র পক্ষ যেন কল্পনাও করতে না পারে যে, আসল কোত্থেকে,আর গেল বা কোথায় ? দুশমন যেন সর্বদা ভীতসন্ত্রস্থ থাকে। দুশমনের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়া, আরাম, আয়েশ, শান্তি ও চাইন থেকে বঞ্চিত করে আত্বসমর্পনে বাধ্য করাই হল গেরিলা আক্রমনের লক্ষ্য। তাই প্রত্যেক গেরিলাদের ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা কোন পথে কি ভাবে বাধা দেয়া যায় তাছাড়া চলে যাওয়ার জন্য কোন কোন রাস্থা ব্যবহার করতে পারে সে সব রাস্তায় কি করে আক্রমন করা যায় এসব বিষয় খুব চিন্তা গবেষণা করে পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয়। তাই তোমাদের বলছি, তোমরা আশ-পাশের পাহাড়গুলো যেমন মারদানিয়া, মারবেলিয়া ও মাদাসিকো ঘুরে ঘুরে দেখ কোথায় মুর্চা তৈরী করা যায়, কোথায় নিরাপদে কিছু দিন থাকা যায়।

কমান্ডারের আলাপ শেষ হতে না হতেই এক জন মুজাহিদ দাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন হযরত আমরা তো শোনেছি আগে দাওয়াত দিতে হয়, দাওয়াত না মানলে যুদ্ধের জন্য প্রকাশ্যে আহব্বান জানাতে হয়। আমরা যে দাওয়াত না দিয়ে গোপনে আক্রমণ করে বসি এটা কি শরীয়তে জায়েজ হবে ? নবী বা সাহাবাদের পক্ষ থেকে এর কোন প্রমান আছে কি না তা জানতে চাই। কমান্ডার সাহেব উত্তরে বললেন, তুমি যা বলছ তা ঠিক। বার্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন ভূখন্ড নেই যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি। মুসলমান যে পৃথিবীর বুকে আছে তা কে নাজানে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, মুসলমানরা যতটুকু না চেনে,তার চেয়ে শতগুন বেশী চিনে কাফির, মুশরীক ও বেঈমানেরা। তারা ভাল বাবে বুঝে সুজেই ইসলামের বিরোধিতা করতেছে। তারা চায় ইসলামের নাম নিশান মিটিয়ে দিতে। তাই তো তারা ইসলামের অর্থ নীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার সবগুলো আইন কানুন পরিহার করে কমিউনিজম নামে এক কুফুরী মতবাদ প্রনয়ণ

করে জোর পূর্বক আমাদের গারে চাপিয়ে দিচ্ছে। যারা তাদের মতবাদ মানতে অস্বীকৃতি জানাল তাদেরকেই স্বপরিবারে হত্যা করে চলছে। আলেম উলামা পীর মাশায়েখ থেকে নিয়ে দ্বীনদার, পরহেজগার সাধারণ মুসলমানকে ও রেহায় দেয়নি। রেহাই পায়নি মহিলা ও মাছুম বাচ্চারা। কাজেই এখন আর দাওয়াতের অপেক্ষা রাখে না তাই আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করছেন তাদেরকে যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করো। আরোও বলেছেন, কাফির দের ধর, বন্দি কর, মজবুত করে বাঁধ, গর্দানে মার , পাকড়াও করতে ওৎপেতে বসে থাক, ইত্যাদি। কাজেই এদের কে হত্যা করতে আর কোন সন্দেহ নেই বরং ফরয। আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল আমরা মন গড়া ভাবে গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ন হইনি। বলা যেতে পারে জলিলকদর সাহাবী হযরত আবু বাছির (রাঃ) ছিলেন গেরিলা যুদ্ধের প্রথম পুরুষ। তিনি হুজুর (সাঃ) এর কাছে আশ্রয় নিতে মক্কা থেকে গিয়ে ছিলেন মদীনায়। তখন ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি হচ্ছিল। মক্কার কুরাইশরা দাবী জানাল,আবু বাছিরকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। আবু বাছির কেঁদে কেঁদে দয়াল নবী (সাঃ) এর নিকট বললেন, ইয়া রাসুরুল্লাহ ইসলাম গ্রহন করার অপরাধে কুরাইশরা আমাকে অনেক প্রহার করেছিল। দেখুন এখনো শরীরে সে কালো দাগগুলো সুপ্রকট। আমাকে আপনার কাছে থাকতে দিন।

মহানবী (সাঃ) আবু বাছিরের কথা শোনে কুরাইশদের বললেন, এখনো তো সন্ধি পত্রের মধ্যে স্বাক্ষর করিনি। অতএব তাকে মদীনাতে থাকতে দাও। কাফেররা নবীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। অতঃপর দুজন কাফিরের সাথে আবু বাছির (রাঃ) কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। আবু বাছির রাস্তায় গিয়ে একজন কাফিরের তলোয়ারের প্রশংসা করতেছিলেন। উক্ত কাফির বলল, আরে হাতে নিয়ে দেখনা এটার কত ওজন, কত মজবুত ও কত ধার। এবলে তলোয়ারটি আবু বাছিরের হাতে দিল। আবু বাছির তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করলেন উক্ত কাফিরের উপর। কাফির দ্বীখন্ডিত হয়ে যমিনে লুটিয়ে পরলে, অপর কাফির দৌড়িয়ে মদীনায় গিয়ে ঘটনা জানাল। আবু বাছিরও রক্ত মাখা তলোয়ার হাতে নবীজীর বিকট গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল কাফিরদের সাথে সন্ধি আপনি করেছেন আমি করিনি। আপনার চুক্তি অনুসারে আমাকে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আমার

জীবন রক্ষা করার হকদার আমিই আপনি নন। আপনার কাজ আপনি করেছেন আর আমার কাজ আমি করেছি। আবু বাছিরের কথা শোনে নবীজী বললেন, আবু বাছির এটা যুদ্ধের উস্কানি মূলক একটি কাজ করেছ।

আবু বাছির (রাঃ) নবীর কথা শোনে ভাবলেন তাকে আবার মক্কায় পাঠানো হবে। তাই তিনি তরবারী হস্তে নবীর দরবার থেকে বেরিয়ে এসে সিরিয়া গামী রাস্থার পাহাড়ের আড়ালে গাঁ ঢাকা দিলেন। সিরিয়া থেকে যতসব পন্যসামগ্রী মক্কায় আসত তা আবু বাছির (রাঃ)একাই লুঁঠ করতেন। আবার মক্কা থেকে নতুন ইসলাম গ্রহণ করে নবীর নিকট নাগিয়ে আবু বাছির (রাঃ) এর সাথে এসে যোগদিতে লাগলেন। অল্প দিনেই আবু বাছিরের দল বিরাট শক্তিশালী হয়ে উঠল। ওরা রাস্তায় এমন লুটতরাজ করতে লাগলেন যে মক্কায় হাহাকার পড়ে গেল। তখন কুরাইশরা মানবাধিকার বিবর্জিত চুক্তি ভাঙ্গতে বাধ্য হল। আবু বাছিরের এহেন কর্ম কান্ডে নবীজি বেজার হননি, ধমক দেননি। এটাই প্রমান করে গেরিলা যুদ্ধ জায়েজ। প্রিয় বন্ধুরা তোমরা হয়ত কিংবদন্তি বীর পুরুষ, দাগোস্তানের সিংহপুরুষ ইমাম শাশেলের কথা শোনেছ। তিনি কিন্তু গেরিলা যুদ্ধ করতেন। কাজেই তোমরা এব্যপারে আর কোন সন্দেহ করবে না। তোমরা দুপুরের খানা খেয়ে তিনজন করে দুটি দল বেরিয়ে যাবে এলাকা ঘুরে দেখার জন্য ফিরে এসে রিপোর্ট দিবে। আর সবাই সাথে অস্ত্র নিয়ে যাবে। ফিরে আসবে সন্ধ্যার আগে। আর অন্য তিন জন আমার সাথে মার্কাজে থাকবে। তোমরা তিন জনকে নিয়ে আগামি কাল আমি বের হব। এনিদের্শ দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। সাথীরা খানা খেয়ে, কিছু সময় বিশ্রাম নিলেন। দুপর দুটার দিকে তিন জন তিন জন করে দুটি দল পার্শ্বেবতী পাহাড়ে বের হল। একটি দল যাত্রা করে মারদানিয়া ও অপর দল মারবেনিয়া। সবাই রণসাজে সুসজ্জিত। অস্ত্র ও গোলা-বারম্নদ যে যা পারল তাই নিয়ে গেল। উভয় দলের উপর নির্দেশ ছিল গোধুলী লগনে ফিরে আসার। একটি দল ফিরে এল রাত দুপুরে। অপর দলের কোন সন্ধান নেই। কাফেলার সকল সাথীরা হয়রান পেরেশান। নামাজ পড়ে দোয়া করছে। অঘুম নয়নে রাত জেগে অপেক্ষা করছে। ফিরে আসা দলটির কার গুজারী দলপতির যবানে শুনুন।

আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে নিচেনেমে পাহাড় উপত্যকা দিয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলাম। উপত্যকা জুড়ে রয়েছে খর্জুর বিথীকা। ফাকে ফাকে

রয়েছে বন্য আখরুট, বাদাম অন্যান্ন ফল-ফলাদির বৃক্ষ। মনে হয় এখানে কোন কালে বস্তি ছিল। কালের বিবর্তনে সে সব জাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। বা কোথাও হিজরত করে চলে গেছে। বাগবাগিচাগুলো তারই স্মৃতি বহন করে আছে। এ সমতল ভূমিটা সত্যিই যেন মন মাতানো ভূসর্গ। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অজয় কে জয় করার তীব্র ভাসনা বক্ষে লালন করে কাফেলা নিয়ে ছলছি আপন গতিতে। সমস্ত বাধা-বন্দন, আর প্রতিরোধ পদানত করে কাফেলা এগিয়ে যাবে তার লক্ষ্যে। এমন মনোবল ও ঈমানী চেতনা সকলের অন্তরে। আমরা সমতল উপত্যকা পশচাতে রেখে ক্রমান্নয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। প্রথম ভাবছিলাম পাহাড়াটি অত খাড়া নয় কিন্তু কিছু দুর অগ্রসর হয়ে বুঝতে পরলাম আমার ধারণা সম্পূর্ন অলীক। অনেক কষ্টে উপরে উঠছি। মাঝা-মাঝি স্থানে গিয়ে দেখি বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে সমতল ভূমি। গাছ-গাছালী ও বেশ বড় ও ঘন। সূর্যের কিরণ জমিনে আসতে বাধার সৃষ্টি করে বৃক্ষরাজির পত্র পল্লব। তাই একটু আঁধারাচ্ছন্ন। আরো কিছুদুর অগ্রসর হয়ে মানুষের পদ চিহ্ন দেখতে পেলাম পাহাড়ের গায়। পদ চিহ্নগুলো অপেক্ষা কৃত একটু বড়। বৃক্ষগুলোর দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখি কান্ড ও ঢাল- পালা গুলো খুবই মসৃণ মনে হল এসব বৃক্ষগুলোতে কোন প্রাণী বা মানুষ একাধিক বার উঠা নামা করেছে। আর সামনে গিয়ে দেখি বিশাল এলাকা জুড়ে জমিনে কোন ঘাস নেই। মানুষ চলাচলের রাস্তা যেম পরিস্কার দেখতে অনেকটা সে রকম। এ এলাকার বৃক্ষগুলো ডাল-পালা শাখা প্রশাখা বিহীন দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হয় মরা। গাছ গুলোর ডালা-পালা ছিল না,বা গজায়নি, এমন নয়। সবগুলো ডাল দুমরিয়ে মুচরিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে। এ কারণেই এ জায়গায় সূর্যের কিরণ বিনা বাধায় প্রবেশ করে। প্রকান্ড বৃক্ষগুলোর বড় বড় ডাল-পালাকে ভেঙ্গেছে কোন দৈত্য দানব না মানুষ। না কালবৈশাখীর ছোবল দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে উড়িয়ে নিয়েছে, এনিয়ে আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম কিন্তু কোন কুল কিনার পেলাম না। বাড়ী নেই, ঘর নেই, নেই লোকের চলা চল, তাহলে এমন হল কেন? পায়ের যে দাগ দেখেছি তা কি কোন কাঠুরিয়ার কি না, আর কাঠুরীয়ার পায়ের চিহ্ন থাকলে গাছও তো কাটা থাকত। তাওতো দেখি না। এসব চিন্তায় আমরা অস্থির। পওে ভাবলাম হয়ত আরো সামনে কোন লোকালয় আছে। তাই চলতে

লাগলাম। আরো একটু অগ্রসর হয়ে দেখি মাটির মধ্যে বড় বড় গর্ত। এগর্তগুলোর সামনে রয়েছে ছোট বড় প্রস্তরের স্তুপ। গর্তগুলো যে কোন মানুষ খনন করেছে তার কোন আলামত নেই। মনে হয় বন্য কোন প্রাণী এসব গর্ত খুড়েছে। গর্ত গুলোর মাটি গর্তের সম্মুখে রেখেছে এখন মাটিগোলো সে স্থানের মাটির সাথে শক্ত হয়ে বসে গেছে। গর্তগুলো সদ্য কোন প্রাণী ব্যবহার করতেছে তা বুঝাযায়। কারণ গর্তগুলো পরিতেক্ত বা পুরাতন নয়।

গর্তগুলোর অভ্যন্তরে কোন প্রাণী লুকিয়ে আছে কিনা তা বাইর থেকে বুঝা যাচ্ছিল না। তাই আমরা গর্তের মুখে গিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখি অন্ধ কারের কারখানা। গুহাগুলো সোজা নয়, ব্যাংকারের মত আকাঁ বাকাঁ। ভিতরে গুলী বা গ্রেনেড নিক্ষেপ করলেত কোন ফায়দা হবে না। এটা যে প্রাণীর গর্ত সে প্রাণীকে সামরীক প্রাণী বললে ভুল হবে না। কোন কিছুর সাড়া শব্দ না পেয়ে আমরা আজান দিয়ে আসরের নামাজ পড়তে দাঁড়ালাম। এমন সময় অকস্মাত একটি মাজারি ধরনের প্রস্তর খন্ড এসে আমাদের পার্শ্বে এক বৃক্ষে আঘাতহেনে বৃক্ষের ছাল থেতলিয়েদূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। আমরা নামাজ ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম কিচ্ছুই দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে এ পাথর আসল কোথেকে ? কে নিক্ষেপ করল, কোথা থেকে নিক্ষেপ করল। কোন এক জন মানুষ তো পাথরটি উঠাতে পারবে না। তাহলে এখানেও কি দেও-দানবের আনা গুনা আছে ? সবাই এদিক ও দিগ টগবগ করে তাকিয়ে দেখতেছিলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই। তার পর এক জন এক জন করে নামাজ আদায় করে অস্ত্র কাকিং করে গ্রেনেডের রিং খুলে সামনে এগিয়ে গেলাম। অনেক সামনে। হঠাৎ দেখি বিশালাকৃতির মনুষ্য মূর্তি দৌড়িয়ে পালাচ্ছে। লোকগুলো আমাদের তুলনায় ৫ গুণ বড়। কালো পোষাকে শরীর আবৃত। বুঝলাম মানুষগুলো হয়ত পাহাড়েই থাকে, আমাদের দেখে ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। সম্মুখে হয়ত নিশ্চয় তাদের বাড়ী ঘর রয়েছে। আমরা এপাহেড়ে থাকতে হলে তাদের সাথে সুহার্দ পূর্ণ ভাল বাসা স্থাপন করা দরকার, আমাদের মাঝে যেন কোন ভুল বুঝা বুঝি না থাকে। তাই তাদের মহল্লার দিকে যেতে লাগলাম। চলার পথে একই ধরনের অসংখ্য গর্ত দেখতে পেলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখি হায় কোন বাড়ী ঘরের চিহ্ন টুকু

নেই। অরন্য আরো ঘন থেকে ঘন বলে অনুমান হল। তাই নিরাশ হয়ে পিছনে ফিরে আসতে লাগলাম। হায় পশ্চাতে তাকিয়ে দেখি প্রতেক গর্তের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তর হস্তে মানুষ রুপী এক প্রকার হিংস্র প্রাণী। দেখতে সর্ম্পুর্ণ মানুষ কিন্তু কালো পশমে সারা দেহ ঢাকা। আসলে এদের কেই বন মানুষ বলে। এরা প্রস্তর নিক্ষেপ করে দৌড়িয়ে গর্তে লুকায়। আবার বের হয়ে প্রস্থর মেরে চোখের পলকে পালিয়ে যায়। আমরা বড় বড় গাছের আড়ালে আমাদের দেহ লুকিয়ে নেই। তারা একে অপরকে হাতের ইশারায় আমাদেরকে দেখাচ্ছে। এরা হল সামাজিক প্রাণী। দলবদ্ধভাবে চলে সবসময়। এদেরকে কেউ কেউ বন মানুষ আবার কেউ কেউ শিম্পাঞ্জি বলে ডাকে। এরা খুব হিংস্র স্বভাবের প্রাণী। এরা আমাদের দিকে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করে গর্তে গিয়ে লুকায়। তাদের এদৃশ্য আমাদের নিকট খুব আনন্দ লাগছিল। এদেরকে দেখে যে ভয় পাইনি এমন নয়। ভয়ও পেয়েছি প্রচুর। আমাদের অন্তরে ভয় আর আনন্দ খেলা করছিল। এক পার্য্যায়ে অসভ্য প্রাণীগুলো আমাদের উপর খুব বেশী পথর ছুড়তে লাগল। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে বললাম যে, ওহে প্রাণী সকল তোমরা আমাদেরকে ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না আর ক্ষতি করতে আসিওনি । তোমরা পাথর ছুড়া বন্ধ কর। হায় ওরা আমাদের ভাষা বুঝল না। তার পর আবার বললাম যে, আমরা কিন্তু গুলি চালিয়ে হত্যা করব। কিন্তু কার কথা কেশোনে ? ওদের তো সে জ্ঞান নেই। ওরা আমাদেরকে তাদের দুশমন মনে করেই এমনটি করতেছে। গুলি ছুড়াও বিবেক সায় দিচ্ছিল না। তার পর ওদেরকে অস্ত্র দেখালাম কিন্তু কোন কাজ হল না। নিরূপায় হয়ে একটি ফাকা গুলি ছুড়লাম। তখন ভয়ে হুমরি খেয়ে গর্তের ভিতর লুকিয়ে গেল।

তার পর আমরা গর্তের মুখে গিয়ে ডাক ডাকি করলাম কিন্তু বের হল না। আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য বুঝবার সাধ্য কারো নেই। তারাও আল্লাহর এক সামাজিক প্রাণী, স্ত্রী, পুত্র নিয়ে সংসার করছে গভীর অরণ্যে। এসব দৃশ্য নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অতঃপর সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা সেখান থেকে চলে আসি। দুরত্বের কারনে এপর্যন্ত পৌছতে দেরি হয়ে গেল। রাত পেরিয়ে ভোর হল, ভোরের পরে এল দুপুর। এখনো দ্বীতিয় দল মার্কাজে ফিরে এল না। সবাই চিন্তায় অস্থির। এরা কি

দুশমনের হাতে বন্দি হয়ে গেল, না পথ হারিয়েছে, না বন্য প্রাণীদের খোরাকে পরিণত হয়েছে তা কে জানে? মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী বললেন প্রিয় ভায়েরা তোমরা মার্কাজের জিম্মাদারী পালন কর। আমি তিনজন সাথী নিয়ে ওদের খোঁজতে যাব, দেখি তাদের ভাগ্যে কি আছে। পরামর্শ হল যোহরের পর বেরিয়ে যাবেন। চারটি অশ্ব সাজানো জল। অস্ত্র ও গোলাবারুদ সবই মওজুদ। আমীর সাহেব বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কাফেলা ফিরে এল। তাদের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দলপতি বললেন-

আমরা মারবানিয়া পাহাড় ত্যাগ করে মারবেলীয়া পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। দুদিকে চিল সারি সারি ফল-ফুলের বাগান। আসলে বাগান বলা যায় না। ফল ফুলের জঙ্গল। কারণ এসব বাগানের কোন পরিচর্যা কেও কোন দিন করেছে বলে মনে হয় না। যাক,থাক ওসব কথা। আমরা মারবেলিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠার সময় এক জন হুজুরকে আমাদের অগ্রে হাটতে দেখে ডাক দিলাম। লোকটি পিছনে তাকিয়ে দাড়িয়ে গেলন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে সালাম মুসাফা করে জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর এ গভীর অরন্যে আপনি কোত্থেকে এলন? আপনি কোন গ্রোপের মুজাহিদ ? উত্তরে বললেন, ঐতো আমাদের গাঁ। আমরা এখানেই বসবাস করি। হুজুরের কথা শোনে খুব আনন্দ পেলাম যে, এ অঞ্চলে লোকালয় আছে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদীর চাহিদা এখান থেকে পুরা করা যাবে। লোকটি বললেন বাবা তোমরাকি আমাদের গাঁয়ে যাবে? জিজ্ঞাসা করলাম কত দূর? উত্তর এল এই তো বেশী দূরে নয়, মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা। আমরা লোকটির পিছু পিছু চললাম। যতই হাটি পথ শেষ হচ্ছে না। অগত্যা জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর আর কত দূর ? তিনি অঙ্গুলী নির্দেশে কয়েকটি গাছ দেখিয়ে বললেন ঐ গাছগুলোর পরেই আমাদের গ্রাম। আমি দেখলাম সেখানে যেতে দু থেকে তিন মিনিট সময় লাগবে। মনে মনে আনন্দ যে, এই তো এসে গেছি সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করব। হায় দুঘন্টা হাটার পরও দেখি গাছগুলো আগের মতই দূর। এবার কিছু কিছু ভয় পেতে লাগলাম। হুজুর আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, তোমাদের পিছনে কে আসে বাপু? আমরা পিছনে তাকিয়ে কিছুই দেখছি না। আবার সম্মুখে তাকিয়ে দেখি এক সুন্দর ও মনোরম গ্রামে ঘুরা

ফেরা করতেছি। আমদের কে দেখার জন্য খুব সুন্দুর সুন্দর নারী পুরুষরা ভাব জমাল। সকলের সাথে ভাব বিনিময় হল। তার পর আমারেকে অনেক মেহমানদারী করলেন। এত সুস্বাদু খাবার জীবনে কোন দিন খাইনি। যা দেখলাম এখান কার লোক খুবই সুন্দর। কালো বা বিশ্রী কোন লোকই নেই। মেয়েরা সবচেয়ে বেশী সুন্দুরী। তাদের সুন্দরের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না। যাক তার পর হুজুর,

আমাদেরকে সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। সেখানেকার মানুষের আঁচার ব্যবহার খুবই সুন্দর। যা বুঝলাম সে খানে পুরম্নষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি। আদর আপ্যায়ন ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই করে বেশী। অনেক চেষ্ঠা করেও আসতে পারিনি। ওদের সাথে রাত্রি যাপন করে সকালে চলে এলাম। আসার সময় হুজুর আমাদেরকে গ্রামের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে আসলেন। গ্রামটি পশচাতে রেখে আমরা যখন আসছিলাম, তখন এসুন্দর গ্রাম টি আবার দেখার জন্যে পিছনে দৃষ্ট নিক্ষেপ করলাম। চেয়ে দেখি হায় কোনবস্তির নেই শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ঘার ফিরিয়ে দেখি হুজুরও উদাও হয়ে গেল। ব্যপারটা কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হল। তার পর ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। আসলে এটা ছিল জিন্নাতের কান্ড।

ত্রিশ

শরীয়তে চোরের শাস্তি বিধান হল হল কর্তন করা। আমারও ডান হস্ত কব্জি থেকে কেটে দিয়েছে। তা হলে আমি ও কি চোর ? প্রশ্ন জাগল আমার মনে। এহাত আমি কোন দিন অন্যায় কাজে ব্যবহার করিনি। তা হলে হাত কাটা হল কেন? অনেক চিন্তা গবেষণা করে আমাকে চোর সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছি। তা হল বয়স প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে এই ২০/২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত যত নামায পড়েছি। যত সেজদা করেছি কোন একটি নামাজ এত সুন্দরভাবে আদায় করতে পারিনি। যেমনটি মাওলার পছন্দ। জিন্দেগীতে এমন একটি সেজদাও আমার মাওলাকে দিতে পারিনি যেমনটি মাওলা পাওয়ার হক রাখে। জীবনের অনেক এবাদতই ছিল রিয়া মিশ্রিত। মাওলা আমার কত সুন্দর, কত পবিত্র। আমার এবাদতও তেমন সুন্দর ও পবিত্র হওয়ার দরকার ছিল তা আমার দ্বারা

আদায় হয়নি। এর চেয়ে বড় চোর আর কে হতে পারে ? জীবনের কত সময় ছিলাম প্রভুর জিকির থেকে গাফেল। আল্লাহর দেয়া এ মহা মূল্যবান সময়গুলো চুরি করেছি। এটা কি চুরি নয় ? নিশ্চয় এগুলো চুরি। তাই তার শাস্তিস্ব স্বরূপ আমার দক্ষীণ হাতটি কাটা হয়েছে। আমি আমার মাওলাকে বললাম, প্রভু হে তুমি আমাকে অতিদয়া করে দুটি হাত দান করেছিলে। আমার বদ আমল ও চুরির কারনে তোমার দেয়া হাতটি যত্ন করে রাখতে পারিনি। সে হাতের উপর শরীয়তের বিচার করা হয়েছে। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ওগো আমার মাওলা আমি তো তোমার নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করি। তুমি আমাকে কবুল না করে আমার হাতটি শহীদ করে দিলে। তাহলে কি আমার একটি অঙ্গ আমার আগেই জান্নাতে চলে গিয়েছে ? আহঃ ওর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারিনি। আবার তুমি আমাকে গ্রহণ করে নিও।

হে আল্লাহ আমাকে যদি তুমি বন্ধু হিসাবে ধরে নিয়ে থাক তাহলে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এহেন আচরণ বৈচিত্রের কিছু নেই। মনসুর হেলস্নাজের সাথে তো তুমি এমনটি ব্যবহারই করেছ। এটা মাশুকের পক্ষ থেকে আশেকের পরম্নস্কার। হস্ত কর্তন করে ডক্তার বেন্ডিস লাগিয়ে দিল। কোনঔষধ লাগিয়ে ছিল কি না, তা আমার মনে নেই। ডাক্তার চলে গেল। টপ টপ করে ঝরতেছিল শোনিত ধারা এ সংবাদ ছড়িয়ে পরল জেলখানার প্রতিটি স্যেলে স্যেলে। যেসব কয়েদিরা স্যেল ত্যাগ করতে পারত এরা ছুটে এল আমার নিকট। সকলেরই অক্ষি পল্লব অশ্রুতে ভেজা। এক জন বর্ষীয়ান লোক এসে কান্না বিধৃত কণ্ঠে বললেন আহাঃ তামাম জাহানের সমস্ত হাত গুলো থেকে মুজাহিদদের একটি হাত আল্লাহর নিকট অধিক শ্রেয়। আমাদের হাতের কোন মূল্যনেই আল্লাহর কাছে, কারণ আমাদের হাত ব্যবহার হয় দুনিয়ার কাজে। আমাদের হাত ব্যাবাহার হয় সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত বাজে কাজে। আমাদের হাত জিন্দেগী ভরে পেটের গোলামী করে আসছে। আর মুজাহিদদের হাত নড়া-চড়া করে আল্লাহর হুকুমে। মুজাহিদদের হাত ব্যাবহৃত হয় আল্লাহর শক্ত একটি হুকুম (জিহাদ) পালনে। আহাঃ আমার হাত দুটির বিনিময়ে যদি এ হাতটি বাঁচাতে পারতাম। আমার জীববের বদলে যদি এ হাতটি বেঁচে থাকত আহাঃ যে হাতটি এতদিন কোটি কোটি মানুষের জান মাল ও ইজ্জতের

হেফাযতের জন্য কাজ-করে যাচ্ছিল,সে হাতটি শাহাদতবরণ করেছে। হে খোদা এর মধ্যে তোমার কি হেকমত নিহিত রয়েছে তা একমাত্র তুমিই জান।

আমি বৃদ্ধের অশ্রু সজল আঁখি দুটি মুছে দিয়ে বললাম। বাবা আল্লাহর মর্জির বাইরে আপছুছ করাও বান্দার ঠিক নয়। যার হাত তিনি নিয়ে নিলেন। এতে বিলাপ করার কি আছে? এ দ্বীনের জন্য অনেক ছাহাবায়েকেরাম হাত দিয়েছে, জান দিয়েছেন। সে তুলনায় দ্বীনের জন্য আমি তো কিছুই করতে পারিনি। আমি তো আমার প্রেমাস্পদের নিকট অনেক হাদিয়া তুহফা পেশ করেছি। তার মধ্যে থেকে প্রিয়জন মাত্র সামান্য একটি জিনিস পছন্দ করেছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। বাকি হাদিয়া গুলো গ্রহণ না করলে আমি কি করতে পারি ? প্রেমাস্পদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করাতো শক্ত বেয়াদবী। বরং সেগুলো গ্রহণ করার জন্য আজীবন প্রার্থনা করা-যেতে পারে। আমার গোটা দেহ থেকে তিনি মাত্র একটি হাত কবুল করেছেণ। আসলে হাত ও আমার না,দেহও আমার না। এগুলো প্রেমাস্পদ থেকেই পেয়েছিলাম। এগুলো তাকে ফেরত দেয়ার জন্যই তো এত ছুটা ছুটি আর দৌড়া দৌড়ি করছি। যে দিন তার পছন্দ হবে,সেদিন বাকি দেহটি ও নিয়ে নিবেন। এতে আমার কোন শেকায়েত নেই। নেই কোন অভিযোগ।

বিশ, পচিশ বৎসর বয়সে আমি আল্লাহর শোকরগোজার বান্দাদের দলভুক্ত হতে পারিনি। মায়ের উদর থেকে নিয়ে এপর্যন্ত আল্লাহর অফুরন্ত নেয়াততের অপ্রচয় করেছি। বেশুমার নেয়ামত নষ্ট করেছি। তার একটিরও শোকর আদায় করতে পারিনি। আল্লাহর নেয়ামতের কূলহীন পারাবারে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সাঁতার কেটেছি। এসব নেয়ামত রাশি নিয়ে কোন দিন একটু ভাবার সময় পাইনি। যে বাতাস আমাকে জীবন ধারনে সাহায্য করেছিল। যে পানি আমাকে পিপাসায় জীবন দান করেছিল। সূর্যের আলো, চাদের কিরণ, অক্সিজেন হাইড্রোজেন, নাইড্রোজেনসহ অগণিত. অসংখ্য নেয়ামত। কত ফল- মুল,কত সুস্বাদু খাদ্য দান করেছেন তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। আহারে শুধু নেয়ামত আর নেয়ামত,সামনে. পিছনে, ডানে বামে. উপরে, নিচে শুধু নেয়ামত,আর নেয়ামত। আমার জীবনে পৃথকভাবে কোন একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করিনি। এর

চেয়ে বড় নাফরমানী আর ফরামুশি আর কি হতে পারে ? আল্লাহ যদি এক মাসের হিসাব নেন যে, হে বান্দাহ এক মাসে তুমি কত পাউন্ড খাদ্য গ্রহণ করেছ, কত গেলন পানি পান করেছ, কি পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহন করেছ, কি পরিমান শর্করা ও আমিষ জাতিয় খাবার খেয়েছ ? এপ্রশ্নের উত্তর এক কথায় জানতে চাইলে উত্তর হবে হাহা লা আদরী হাহা লা আদরি। আমি কিছুই জানিনা,আমি কিছুই জানি না।

আমি যে মালিকের রাজ্যে থাকি, যে মালিক আমাকে মাঠের শশ্য, বাগানের ফল নদীর মাছ, খাওয়ায়ে পালাপোষা করতেছেন যার মাটিতে চলি, যার শেখানো ভাষায় কথা বলি, যে আমাকে ঠান্ডায় গরমে চলতে শিখিয়েছেন এমন দয়ালোও মেহেরবান মালিককে ভুলে থাকা কত বড় নাফরমানী। এ নাফরমানীর চেহারা নিয়ে মাওলার দরবারে হাজির হওয়া কতইনা লজ্জাস্কর ব্যপার। ছিঃ এজীবনে আল্লাহর রাশি রাশি নেয়ামতকে কোন দিন অন্তর চক্ষু দ্বারা তাকিয়ে দেখিনি। হাত কাটার পরে আমার ভুলের দুয়ার খুলে গেল।

এত দিন আমি আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি গাফেল ছিলাম। কোন নেয়ামতকে, নেয়মতই মনে করতাম না। কল্পনায়ই আসত না। হাত কাটার পর নেয়ামত অবলোকনের চক্ষু খুলে গেল। অনুধাবনের মত অন্স্তর পয়দা হল। উস্তাদের নিকট শোনেছিলাম “কদরে নেয়ামত, বাদে যাওয়াল। অর্থাৎ নেয়ামত চলে গেলে তার কদর, তার দাম, তার মূল্য তার প্রয়োজনীতা বুঝে আসে। নেয়ামত থাকতে তা বুঝে আসে না। হায়রে আমার এ হাতটি ছিল আমার পরম বন্ধু আমাকে সে সবসময় পাহারা দিয়ে রাখত । আমার প্রয়োজন মিটাতো। আজ সে বন্ধুটিকে হারিয়ে এতই অসহায় হয়ে পড়েছি তা বুঝিয়ে বলার ভাষা নেই। এখন যে বন্ধুটি (বাম হাত) আমার সাথে রয়েছে তার একার দ্বারা আমার প্রয়োজন মিটাতে পারছে না। শয়নে-স্বপনে,ভোর বিহানে অর্থাৎ অঘুম নয়নে সারাক্ষণ আমার খেদমতে নিয়োজিত ছিল আজ তাকে হারিয়ে পলে-পলে ক্ষনে-ক্ষনে, ধমনিতে ধমনিতে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এখন বন্ধুর বিচ্ছেদের কারনে হৃদয় কাঁদছে। এমন হিতৈষি বন্ধু আর পবনা।

আমার হস্ত কর্তন ও আমার জন্য বহুত বড় এক নেয়ামত। কারণ হস্ত কর্তনের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত আমি শাকিরিনদে দলভুক্ত হতে পারিনি হাত

কাটার পর আমি শাকিরিনদের সোপনে পা রাখতে সক্ষম হয়েছি এখন আল্লাহর সমস্ত নেয়ামত হিসাবে চিনতে পেরেছি। সবই যে আল্লাহর নেয়ামত অন্তর তা অতি সহজে মেনে নিয়েছে। এখন পবিত্র কুরআনের সুরা রাহমানের প্রতিটি আয়াতের হাকিকত আমার চোখের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে গেছে। কোন নেয়ামত কেই এখন অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন বুঝতে পেরেছি দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব আল্লাহর নেয়ামত। সব নেয়ামত স্বীকার করে তার শোকর আদয় করতে দিল প্রস্তুত হয়ে গেছে। হাত কাটা যাওয়াতে আমার অন্তরে কোন দুঃখ নেই। এখন আমি দাবি করতে পারি যে, আমি আল্লাহর শোকর গুজারী বান্দা। তাই আমার যবান থেকে বেরিয়ে আসছে–

শোকরে নেয়ামত হায়েতু।
চাঁন্দাকে নেয়ামত হায়েতু।
উজরে, তাকছিরাতেমা-
চাঁন্দাকে তাকছিরাতে মা ॥

একত্রিশ

কখনো কখনো মাতার উপর দিয়ে বয়ে যায় ঝড়ো হাওয়া। আবার কখনো উপর থেকে ঝর ঝর করে মাটি পতিত হয়। কখনো রাতের অন্ধকারকে পরাজিত করে বড় বড় অগ্নি কুন্ডলী আশপাশে এসে পতিত হয়। কখনো শোনাযায় বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ আর শত শত কণ্ঠে মিহিন সুরে গাওয়া গানের সুর লহরী ও নৃত্যের শব্দ। কোন সাময় ভেসে আসে আজানের ধ্বনি আবার শোনা যায় কালামে পাকের মধুর তিলাওয়াত। সমস্ত সাথীরা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী এসব কান্ড কীর্তি দেখ অতিষ্ট হয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষনা করলেন, ওহে জ্বীন সম্প্রদায়েরা আমরা দ্বীনের মুজাহিদ। দ্বীনের খাতিরেই আমরা এ অরন্যে এসেছি। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি। আমরা বিশ্রাম নিয়ে আমাদের গন্তব্যের দিকে চলে যাব। তোমাদের এসব আচরনে সাথীরা খুব ভয় পাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি তোমরা আমাদেরকে নিশ্চন্তভাবে বিশ্রামের সুযোগ করে দাও। মাওলানার ঘোষনার পর গায়েব থেকে আওয়াজ এল, এ এলাকা আমাদের, খোদার দোহাই আপনারা অন্যাত্র চলে যান। আপনাদের আগমনে আমাদের কষ্ট হচ্ছে।

মাওলানা সাথীদের বললেন, বন্ধুরা আমরা আল্লাহর সৈনিক। আমাদের দ্বারা যদি আল্লাহর কোন মাখলুক কষ্ট পায় তা হলে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আমরা চাইনা, আমদের দ্বারা অন্য কোন মাখলুক কষ্ট পাক। চল এখনি,আমরা জিন্নাতদের আবাস ভুমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাই। কমান্ডারের নির্দেশ পেয়ে সাথীরা নিজ নিজ ছামানা ঘুচিয়ে নিয়ে যাত্রা করল্ কাঁটার আঘাতগুলো এখনো ভাল হয়নি। অনেকের পায়ের তলায় এখনো কাঁটা রয়েগেছে, বের করতে পারেনি। তাই চলতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। পা উঠায়ে আবার ফেলতে পারছে না। কেঁপে কেঁপে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। তার পরও চলছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই,চলছে তো চলছেই। এক ঘন্টার রাস্ত্মা অতিক্রম করছে তিন ঘন্টায়। এভাবে প্রায় সারা দিন পথ চলেছে। দিনের শেষ ভাগে ক্ষুদা পিপাসায় কাঁতর হয়ে চলতে পারছেনা সাথীরা। এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। কমান্ডার রাহাবর ফাগুদায়েভকে হুকুম দিলেন বিশ্রামের জন্য কোন একটি মনোরম স্থান খোজে বের করতে। ফাগুদায়েভ একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিলেন।

সাথীরা কেউ রান্না করছে আর কেউ করছে তাঁবু রচনা। এদিকে পশ্চিমাকাশে লালিমা ছড়িয়ে আদিত্য লুকাচ্ছে ভূধরালে। বিভাভরী আসছে তমস লয়ে। এক জন দ্ন্ডায়মান হয়ে চাপাকন্ঠে আজান দিল। পাহারাদার ছাড়া সবাই এসে জামাতে নামায আদায় করল। এখানে রাত পারি দিয়ে আবার কাফেলা সামনে এগিয়ে চলল। বিশ্রাম নিতে নিতে একটানা ১২ দিন চলার পর সাথে আনা সমস্ত খাদ্য ও পানি ফুরিয়ে গেল। ক্ষুধার তাড়নায় অনেকেই পত্র পল্লব চিবায়ে রস পান করে বাঁচার চেষ্ঠা করছিল্ । কারো কারো কুখাদ্য বক্ষণ করার কারণে পেট খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার পর আরম্ভ দাস্ত বুমি। এসব রোগীদের ঔষধ খাওয়ানোর পর আরোগ্য লাভ করল। আর বাকি তিনজন এনশ্বর পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করে, অন্যসব সাথীদেরকে জিহাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শুহাদাদের কাফেলায় গিয়ে মিলিত হল।

কয়েক দিনের উপবাস থেকে সকলেই অচলহয়ে গেল। চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। চক্ষুগুলো কুটুরাগত শরীর জীর্ণষির্ন। হীনোদ্দমে সকলেই শয্যা গ্রহণ করে আযরাঈলের এন্তেজার করছে। আজরাঈলের মুলাকাত ছাড়া এখন আর তাদের কোন কাজ নেই, আশা নেই।

সকলেই ক্ষুধা পিপাসায় কাঁতর হয়ে ঘুমুচ্ছে। মাওলানা ঘুরে ঘুরে পাহরা দিচ্ছেন। কখনো শহীদদের কবর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে দাঁড়িধৌত করছেন, আবার কখনো ঘুমিয়ে পরা সাথীদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, অপলক নেত্রে সুন্দর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছেন আহাঃ এটাই কি জীবনের শেষ ঘুম কি না এঘুম থেকে কিয়ামতের আগে জাগ্রত হয়কি না এমনি ভাবেই কি ওরা গহীন অরণ্যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে কি না। এসব চিন্তায় মাওলানার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। একবার সেজদায় লুটিয়ে পরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে ছিলেন, ওগো আমার মাওলা রাহমানুর রাহীম আমরা আপনার গোনাহগার ও নাফরমান বান্দা। আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। বান্দা আজ অসহায় বেশে তোমার ক্ষমার দুয়ারে হাজির। দয়া করে ক্ষমার দুয়ার খুলো দাও। ওগো আমার মাওলা আমার অপরাধের কারনে আমাদের রিজিকের দ্বার ব্নন্ধ করে দিয়েছ। ওগো রাজ্জাক আমার কারনে আমার মুজাহিদ ভাইয়ের রিজিক বন্ধ করো না। মাওলা গো আমরা তো তোমারই আহব্বানে তোমার হুকুম পালন করতে বাড়ী ঘর ত্যাগ করেছি,পিতা মাতাকে কাঁদিয়ে, কলিজার টুকরা, নয়য়ের পুতুলী, অতি আদরের সন্তানদের ফাঁকি দিয়ে,প্রিয়মতা স্ত্রীর কলিজা বির্দীণ করে, সুখ, শান্তি, আরাম, আয়েশ আর বন্ধু বান্ধব ও আত্বীয় স্বজনের মায়াজাল ছিন্ন করে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময় জানে জিগর বাচ্ছা কেঁদে কেঁদে পিছু পিছু আসছিল আর সুধাচ্ছিল আব্বু তুমি আমায় রেখে কোথায় যাচ্ছ, তুমি না আমাকে নিয়ে খানা খাবে বলে ছিলে ? বাচ্চাকে খেলনা আনতে যাচ্ছি এ প্রলোভনে বিদায় দিয়ে ছুটে এসেছি। কত শত মানুষ বাল-বাচ্চা নিয়ে স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই বেরাদার আর বন্ধু বান্ধব নিয়ে দিব্যি আরামে দিন যাপন করতেছে। ওরা তাদের পশুপাল, শষ্য ক্ষেত্র, ফলের বাগান আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত্ম। ওগো রাজ্জাক তাদের রিজিক তো বন্ধ করে দাওনি। তবে এটা আমার হিংসা বা শেকায়েত নয়। আমার প্রার্থনা হল, আমাদের রিজিক জারি করে দাও। আমার কারণে সাথীদের কষ্ট দিওনা। ওগো দয়ার সাগর, অসহায়ের সহায় ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্থল আমাদের তো অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমাকে ছাড়া অভাব অভিযোগ পেশকরার আর তো কেউ নেই।

তোমাকে ছাড়া কার কাছে যাব? ওগো গাফফার তামাম দুনিয়ার জ্বীন আর ইনসান মিলে যদি ৭ তবক আসমান আর ৭ তবক জমিন পরিমান গোনাহ করে বসে তা হলে ক্ষমা করে দিতে তোমাকে কোন বেগ পেতে হবে না। যে পরিমাণ তোমার ক্ষমার গুণ আছে সে পরিমাণ গোনাহ সমস্ত সৃষ্টি মিলেও করতে পারবে না। অতএব আমাদের ক্ষমা করে দাও। মাবুদ হয়ে বান্দা থেকে পরীক্ষা নেয়া রবুবিয়াতের শানের খোলাফ তোমার সমকক্ষ কেউ থাকলে তার থেকে পরিক্ষা নিলে শোভা পেত। সিংহ যদি পিপিলিকার শক্তি পরীক্ষা করে এটা সিংহের ইজ্জতের প্রশ্ন।

ওগো মাওলা আমাদের এ অন্তিম সময়ে তোমার রাহমান নামের রাহমানিয়াত রাজ্জাকের রাজ্জাকিয়াত, গাফফারের গাফাফারিয়াত, সাত্তারের সাত্তারিয়াত, কাহ্হারের কাহ্হারিয়াত (শত্রুর উপর) জালালের জালালিয়াত প্রকাশ কর। ওগো মাওলা তোমার দয়ার চোখে তাকিয়ে দেখ সাথীদের মুখের দিকে। মাওলানার অশ্রুতে সেজদার জায়গাকর্দ মাক্ত হয়ে গেল। চোখ ছেয়ে আসছে ঘুম। এমন সময় কোত্থেকে এক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে পার্শ্বে দাড়ালেন। আমীর সাহেব আর্শ্চায্যান্বিত হয়ে সালামের জবাব দিতে দিতে মস্তক উঠালেন । চেয়ে দেখেন শুভ্র পোষাক পরিহিত বর্ষিয়ান এক সাধু পুরুষ। মুখে সুফায়েদ দাঁড়ি। নূরানী মুখশ্রী। মানান সই দেহ। অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে এমন মনে হয় না। লোকটি বিস্ফারিত নয়নে ঘুমন্ত সাথীগুলোর দিকে তাকালেন। আমীর সাহেব লোকটির চাহনী ও ভাব ভঙ্গি দেখে মনে মনে ভাবলেন আবার বুঝি জিন্নাতের কবলে

পরে গেছি। লোকটি এদিকে সেদিক তাকিয়ে মাওলানার দিকে লক্ষ্য করে বললেন

আপনাকেই মনে হচ্ছে কাফেলার জিম্মাদার, আপনারা এখানে কতজন সাথী আছেন ?

আমরা ছিলাম ৪০ জন, এর মধ্যে তিন জন অনাহারে ও পেটের পীড়ায় শাহাদাত বরন করেছে। এখন আমরা ৩৭ জন আছি।

আপনাদের কাছে খাবার মত কি আছে ?

কিছুই নেই।

এসব লোক গুলো কি অসুস্থ না ক্ষুধার্ত ?

কেউ আছে অসুস্থ আর সাবাই ক্ষুধার্ত।

খাদ্য কেনার মত কোন পয়সা কড়ি আছে কি ?

না থাকার মত , তবে যা আছে তা দিয়ে এ বিজনারন্যে খাদ্য পাব কোত্থেকে ? হাট নেই, বাজার নেই, লোকালয় নেই।

আপনাদের নিকট যা পয়সা কড়ি আছে তা বের করম্নন এবং আমার সাথে তিন জন লোক দিন। আমি কিছু খাবার বিক্রি করব।

সবাই দুর্বল, কউ যেতে পারবে না। তা ছাড়া আপনাকে চিনি না। আপনার সাথে তিন জন লোক দেয়া সামরিক আইনের ও খেলাফ আবর বুদ্ধিরও স্বল্পতা। অতএব একটিও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পেটে কিছু দিতে হলে একটু হাত পা মারতে হয়।

ব্যবসা করতে হলেও হাত পা মারতে হয়।

আমি আপনাদের নিকট ব্যবসা করতে আসিনি, এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে।

আপনার চেহারা ব্যবসায়ী বলে সাক্ষি দেয় না কিন্তু আপনার কথাতে বুঝতে পারছি আপনি এক জন খাদ্য ব্যবসায়ী। নতুবা পয়সা কড়ি চাইতেন না।

আল্লাহর নিকট কিছু চাইলে নিস্বঃ হয়ে চাইতে হয় আর যদি হাতে কিছু থাকে তা হলে চাওয়া লজ্জাস্কর। এখনো আপনাদের অন্‍ত্মর টাকা পয়সার সাথে লেগে রয়েছে। অনেকেই ভাবছে হাট বাজার পেলে খাদ্য ক্রয় করবে। এমন দু'দুল্য মনের কারনে রহমতের দরজা আলস্নাহ খুলতেছেন না। যখন সকলের অন্তর এক মাত্র খালেক মুখি হবে। তখনই খালেক রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। গায়বুল্লাহ থেকে আপনাদের আত্বা পবিত্র করার জন্যই আমি সব টাকা পয়সা তলব করছি। জিহাদের ময়দানে আসবাবের প্রতি নজন দেয়া বেয়দবী। আসাব থাকবে কিন্তু আসবাবের প্রতি একিন রাখতে নেই। তা হলে পদে পদে আল্লাহর নুসরত তার মদদের সাথে মুলাকাত হবে।

আগুন্তকের মহামূল্যবান উপদেশ শোনে মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী হয়রান পেরেশান হয়ে গেলেন। এ আবার কোন লোক, যে এবীজন

কান্তরে তাওয়াক কুলের সবক পড়াতে এসেছেন। উপযুক্ত সময়ে তাওয়ককুলের প্রেক্টিক্যাল ক্লাশ করাচ্ছেন একি কোন মানুষ, না জ্বীন, না ফেরেস্তা। মাওলানার মনে এ প্রশ্ন উদয়হল। মাওলানা নির্ভয়ে প্রশ্ন করলেন,

দোস্ত আপনার পরিচয় দিয়ে আমার

বিগলিত অন্তরে শান্তনা দান করবেন বলে আশা রাখি। দেবেন কি আপনার পরিচয় ?

আমি আপনার মতই খালেকের এক সৃষ্টি। এর চেয়ে পরিচয়ের বেশী কিছু নেই। আপনাকে যা বলা হচ্ছে এর উপর আমল করুন অর্থাৎ যার কাছে যা টাকা পয়সা আছে তা খাদ্য ক্রয়ের কথা বলে আপনার হাতে নিয়ে নিন।

এতটুকু বলে লোকটি গভীর অরন্যের কোথায় জানি চলে গেলেন। আমীর সাহেব সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যার কাছে যা টাকা পয়সা ছিল সব গুলো টাকা নিয়ে নিলেন। এমন সময় সেই আগুন্তক মাজারী ধরনের একটি পাতিল ভর্তি গরম খাবার ,পানীয় ও পর্যাপ্ত পরিমান পাক করা গোস্তের শুখনো সুটকি নিয়ে হাজির হলেন এবং বললেন এ পাতিল থেকে যার যার পরিমাণ মত খাদ্য গ্রহণ করুন। সবাই খাবার বের করে তৃপ্তি সহকারে আহার করার পরও প্রচুর খাবার রয়ে গেল। খাবার খেয়ে সাথীরা ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। সকলের চেহারাই পুর্বের ন্যায় রিষ্ট পুষ্ঠ হয়ে গেল। সকলেই আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করতে লাগলেন। আগুন্তক ফিরে গেলেন। কিন্তু পরিচয় নাজানাই রয়ে গেল।

অবশিষ্ট খাবার তিন দিন পর্যন্ত খেলেন, পঁচেওনি নষ্টও হয়নি। বাকি ছিল গোস্তের শুটকী। এগুলো পানিতে ভিজিয়ে মজাকরে খাওয়া যায়। এসব খাবার ৪০ দিন পর্যন্ত খেয়েছিলেন। কাফেলা চলতে চলতে মরুভূমিতে এসে হাজির হল। যানবাহন ছাড়া এ মরুভূমি পারি দেয়ার সাধ্য কার আছে ? সাথীরা সবঘাবড়িয়ে গেলেন। ৩০ মাইল মরু পথ পারি দিতেই হবে। তাছাড়া মারবানিয়া পর্বত মালায় পৌছার কোন পথ নেই কাফেলা আল্লাহর উপর ভরসা করে পথ চলছে। অগ্নিবৎ মরুহাওয়া শরীর জলসিয়ে দিচ্ছে। ছাতি ফাটা পিপাসায় জীবন ওষ্ঠাগত। দু'চার কদম যেতে না যেতেই গলা শুকিয়ে কাষ্ঠের মত হয়ে যায়। একটু পর পরই

পানিতে গলা ভিজিয়ে নিতে হয়। মরম্ন লুহাওয়া নাসারন্দ্রে প্রবেশ করে চৌচির করে দিচ্ছে তাই ফুটা ফুটা ঝরছে রুধির ধারা। সকলের পায়ে ফুসকা পরে গেছে। যেন আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে মাঠ জুড়ে। গ্রাউন শীট মাথার উপর ধরে ৪/৫ জন এক সাথে চলছে। মাঝে মধ্যে আরম্ভ হয় মরম্ন সাইমম। উড়িয়ে নিতে চায় গ্রাউন শীট। পানি শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ চলার পর। এখন জিব চুসে বাঁচার চেষ্ঠা করছে। রাহাবর, আমির সাহেব আর অন্য একজন সাথী চলে গেছেন বেশ কিছু সামনে। ৩৪ জন সাথী প্রায় ৩ হাজার মিটার পিছনে। আমীর সাহেবের নির্দেশ ছিল ৩ জন করে সাথী ১০ মিটার দুরে দুরে চলবে। কিন্তু অধিক পরিশ্রমের কারণে একে অপরের কাঁদে ভরদিয়ে প্রায় কাছাকাছি চলছিল।

দুশমন দূর্বীনের সাহায্যে দেখতে পেল অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে মুজাহিদরা মরু ভুমি পারিদিচ্ছে। এরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মিসাইল নিক্ষেপ করল। তাদের টারগেট মিছ যায়নি। ৩৪ জন সাথীর মধ্যখানে মিসাইল এসে পতিত হল। সাথে সাথে সাথীদের গ্রেনেড,ও গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হল। ৩৪ জন সাথী টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন ধুধু মরু প্রান্তরে। এক মিসাইলেই কেড়ে নিল ৩৪ জন জানবাজ মুজাহিদের প্রাণ। বাকি ৩ জন সাথী বেঁচে গেলেন। এরা অনেক কষ্টে আরো কয়েক দিন হেঁটে মারবারিয়া পর্বত শিখরে গিয়ে প্রথম কাফেলার সাথে মিলিত হলেন।

বত্রিশ

ডাক্তার রাগেব মিকচি ও জামাতা ডাক্তার এস, করিম কাবুল হাসাপাতাল থেকে বদলি হয়ে চলেগেলেন বামিয়ানে। সেখানে গিয়ে উভয়ে মিলে একটি বাড়ী রেখে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। বাসা থেকেই প্রতিদিন গিয়ে অফিস করেন। দিন যাচ্ছে সুখ শান্তির মধ্য দিয়ে। প্রাইভেট রোগী দেখেও টাকা কামান প্রচুর। মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে ছওদার নাম ডাকও কম নয়। গাইনী বিভাগে সে এক জন নামকড়া ডাক্তার।

হারেছ মিকাইলী ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাবুলে আসার পর ব্যবসার কোন লইন ঘাট করতে পারেননি। কাজের মানুষ বেকার থাকতে পারে না। বেকার জীবন হল শয়তানের দোসর। জমাকৃত টাকা বসে বসে করচ

করলে একদিন রাজ ভান্ডারও শেষ হয়ে যায়। তাই তিনি কোন একটি ব্যবসা ধরার জন্য এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করছেন। এছুটা ছুটির মধ্য দিয়ে আমাকেও খুঁজে বেড়ান তিনি। বেগম মিকাইলী (আমার শ্বাশুরী) মেয়ের চিন্তায় অস্থির। মেয়েকে বাড়ী করার জন্য,সুখ শান্তিতে যেন থাকতে পারে সে জন্য দিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকা ও সোনা দানা। বাড়ী ঘর তো দুরের কথা মেয়ে ও জামাতার খবরই নেই। এরা কি আফগানিস্তনে আছে না জিহাদের ময়দানে চলে গেছে তার কোন হদিস নেই। মেয়ের শোকে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। খানা নিয়ে বসে বেচারী দু'এক লুকমাও উদওস্ত করতে পারছেন না। কোন হেজাব পরিহিতা যুবতী দেখলেই এগিয়ে যান তিনি। ভাবেন হতে পারে এমাহমুদা। আবার কখনো কখনো ভাবেন, সে তো এদিকে ঘুরা ফেরা করার পাত্রী নয়। তার প্রতিটি রগে-রেশায় ধমনিতে ধমনিতে রয়েছে জিহাদের স্পীহা। জিহাদ ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না সে। ভাই এর রক্তের বদলা নেয়া, আলেম উলামাদের খুনের প্রতিশোধ নেয়া, মা-বোনের ইজ্জত হরণের শাস্তির বিধান করা, মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংসের বিচার নিজ হাতে করা। প্রিয় জন্মভূমি থেকে কমিউনিজম নামক কুফুরি শাসনের কবর রচনা করে খোদায়ী নেজাম চালু করা। নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিস্পেসিত মজলুম মানুষকে জালেমদের হাত থেকে উদ্ধার করা ও জালিমের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেয়া। ঈমান বাচানোর তাগিদে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে যারা ভিন দেশে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে, তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা। অনাথ-অনাথিনী ওদুখিনী মায়ের অশ্রুন্ন মুছে দিয়ে তাদের অন্তরে শান্তনার বিজ বপন করা। সন্মান হারা জননী আর বিধবা রমনীর বুক ফাটা আর্তনাদ বন্ধ করে তাদের মলিন মুখে হাসি ফুটানো। জুলুম, শোষণ, নিপীড়ন বন্ধ করে শান্তিময় জীবন ও সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বের দিকে দিকে জিহাদী কার্যক্রম চালু করে সমস্ত তাগুতি শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুর মার করে দেয়া। সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসীদের উপরে ইসলামকে বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্টা করা। এগুলোই তার স্বপ্ন। এগুলিই তার হৃদয়ের কামনা,ভাসনা ওপ্রবল প্রচেষ্ঠা। এসব করতে গিয়ে সময় যায় যাক, অর্থ যায় যাক, কান যায় যাক। কোন পরওয়া নেই। এটাই তার জীবনের বজ্র শপথ। এসব সে বাস্তবায়ন করবে বলেই এক জন জিহাদ

পিপাসি, জান বাজ, অকুতোভয় মুজাহিদকে স্বামী হিসাবে বেছে নিয়েছে। দেখেনি, ঘর-বাড়ী দেখেনি ধন-দৌলত ও সুখ শান্তি। এমন মেয়েকে ইহকালে পাবে, সে আশা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। তবু কিন্তু আপন রূপসী কন্যাকে ভুলতে পারেন নি। ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসে ভূবন জ্বালানো দীর্ঘশ্বাস। হারেছ সাহেবও আশা ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে মধ্যে শান্তনা দেয়ার পর ও মাজননীর অবুঝ হৃদয় কোন বুঝ মানছে না। মন কেবলই ছুটে বেড়াচ্ছে মাঠ-ঘাট, বন-বাদার, গিরি কান্তার কন্দরে কন্দরে। মাঝে মাঝে ভেজা চোখে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেন- প্রভুহে। তুমি আমার মাহমুদা ও খোবায়েবকে বাচিয়ে রাখ। কাফেরদের উপর বিজয় দান কর তাদেরকে।

এদিকে কমান্ডার মুহাম্মদ ইয়ার (প্রশিক্ষণ শিবিরের উস্মাদ) আমার তালাশে লোক পাঠিয়ে দিলেন দিকে দিকে। চষে বেড়াচ্ছেন আফগাস্থিনের পাহাড় পর্বত আর গিরি কন্দরে। হাট বাজার আর শহর বন্ধরে। জনে জনে পৌছেন তোমরাকি মুজাহিদ কমান্ডার আবদুলস্নাহ বিন মাসরম্নরকে দেখেছ ? ও খোবায়েব নাম জানতনা। ছদ্ম নামেই চিনত আমাকে। কোন ঘোর সোরকে দেখলেই আমাকে মনে করে তার পিছনে ঘোটক দাবড়িয়ে ছুটে যেত মাইলের পর মাইল পথ। চেহারায় তালাশ করত আমার ছবি। জিজ্ঞেস করতেন আমার কথা। এভাবে চলছে তালাশাভিযান। কিন্তু কোথাও খোঁজে পাচ্ছেনা আমাকে। কমান্ডার সাহেবের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আল্লামা সামসুল হক নজদীর উপর। তিনি মনে করতেন খতিব সাহেব আমার কথা জানেন। কারণ প্রথম দিনের আলাপ সালাপে কেমন যেন চাপা চাপা একটা ভাব খতিব সাহেবের মধ্যে বিরাজ করছিল। তাঁর কথায় এটাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে তিনি নিশ্চয় জানেন কিন্তু বলছেন না। এসন্দেহের উপর ভিত্তি করেই কমান্ডার সাহেব বার বার যেতেন খতিব সাহেবের নিকট এবং বলতেন, হুজুর আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আপনি মুজাহিদ সাহেবের কথা জানেন। দয়া করে আমাকে বলেদিন তিনি কোথায় আছেন কিভাবে আছেন। আমার উসিলায় আপনি এবং আপনার ষোড়সী কন্যা জীবনে রক্ষা পেয়েছেন, সে উপকারের দিকে লক্ষ্য করে আমাকে বলে দিন। সে দিন বাসা থেকে বিদায় নিয়ে গভীর রজনীতে আপনার কাছেই এসেছিলেন। আর যদি আপনার শাগরেদ মুরীদ ও খুলফারা তাঁকে কিছু করে থাকেন তাহলে ও বলেদিন। ইহুদী

নাসারাদের উকালতী ছেড়ে মুজাহিদদের উকালতী করুন। দ্বীনের খাতিরে তা প্রকাশ করুন।

এত শত কথা বলার পরও খতিব সাহেব মানুষের ধীক্কার আর ভৎসনার ভয়ে মুখ খুলেননি। খতিব সাহেব দীর্ঘ শ্বাস নির্গত করে বলতেন বাবারা ছেলেটি আমার বড় প্রিয় ছিল। তার জন্য বেশী দোয়া কর আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন, আবার যেন ফিরিয়ে আনেন আমাদের কাছে। কমান্ডার হাজারও চেষ্টা করে খতিব সাহেব থেকে কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারেননি। ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে আসতেন বার বার। এভাবে তিন মাস পর্যন্ত সবধরনের চেষ্ঠা প্রচেষ্ঠা করেও যখন কোনফল হল না তখন সাথীদের ডেকে বললেন ভায়েরা তোমরা অনেক চেষ্টা করেছ আলস্নাহ পাক তার বদলা দান করুক। এখন আর তাঁর খোঁজ নিয়ে দরকার নেই। আলস্নাহ তার হেফাজত করম্নন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে কোন না কোন ভাবে আমাদের নিকট সংবাদ আসত। হয়ত গুপ্ত ঘাতকরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছে না হয় বন্দি করে রেখেছ। কাজেই আর খোঁজে খোঁজে কষ্ট করো না। নিরাশ হয়ে এখন থেকে খোঁজা খোঁজি ছেড়ে দিলেন।

কমান্ডার সাহেব ছাড়া আমার বাসা কেউ চিনত না জানত না। তাই সপ্তাহে দু এক বার বাসায় গিয়ে খোজ খবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় হাট বাজার করে দিতেন। কমান্ডার সাহেব এবং তাঁর সহচরদের মধ্যে আমার ব্যপারে যত পেরেশানি বিরাজ করতেছিল এর শত ভাগের এক ভাগ পেরেশানি ছিল না মাহমুদা ও হেলেনার মধ্যে। ওরা জানত, রনাঙ্গনে গিয়েছেন নিরাপদ জায়গা তালাশ করার জন্য। জায়গা খোজে বের করে তাদেরকে নিয়ে যাবে। আর মুনাসেব মত জায়গা পাওয়া অত সহজ নয়। সময়ের প্রয়োজন। জায়গা বের করে, সেখানে মুর্চা তৈরী করবে, ব্যাংকার খনন করবে পাহারা চৌকি নির্ম্মান করবে,রসদ পত্র পৌছাবে। তার পর হল থাকার প্রশ্ন। এগুলো কাজ সম্পাদন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই তারা এত চিন্তা করত না।

হেলেনা ইন্টেলিজেন্সে ভর্ভি হয়ে বেশ কয়টি ভাষার উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ভালই দক্ষতা অর্জন করেছে। এরমধ্যে তার মাতৃভাষা, আরবী, রুশী, পোস্তুন, ও ফার্সি। এ ৫টি ভাষা সে লিখতে ও পড়তে পারে। কুরআনশরীফ পড়তে পারে অথর্ও বুঝে মাগার একটি শব্দের উচ্চারনও ঠিক হয় না। ১০/১৫ টি সুরা সে মাহমুদার নিকট মুখেমুখে মুখস্ত করেছে। একয়টি সুরাই শুদ্ধ। মাহমুদা জানতনা সে যে আরবী পড়তে পারে।

একদিন ফজরের নামায পড়ে খোলা বাতায়নে বসে হেলেনা কুরআন শরীফ নিয়ে পড়তে লাগল। মাহমুদা ওজিফা সেরে হেলেনার কাছে গিয়ে বসল, তার পড়া শোনে হাসতে হাসতে লুটু পুটো খাচ্ছে। গড়িয়ে পড়ছে হেলেনার উপর হেলেনা লজ্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি গো আপা তোমার কি হয়েছে ? এত হাসছ কেন ?

মুন্সি তোমার পড়া শোনে হাসছি। কোন ক্কারীর নিকট মশক করেছ ? ইস কিসুন্দর পড়া মনে হচ্ছে ক্কারী বাসকেট। কত সুন্দর লহান আস্তে পড় বেশী শব্দ করে পড়লে লোক এসে ভীর জমাবে দাওয়াতের জন্য। যাক দশ গেরামের মোল্লাকী পাবে।

কেন আপা কিচ্ছুই কি হয় না?

হবে না কেন ? এ এলেম এত দিন রেখেছিস কোথায় ?

আপনিযে গলার ভিতর থেকে কিভাবে বের করেন এটা তেমন পারিনা। তাছাড়া বাকীগুলো তো হওয়ার কথা ?

আরে মুন্সি শোন গলার ভিতর থেকে বের করলেই কি হবে ? নামাজ পড়ার জন্য আমি তোমাকে মাত্র কয়েকটা সুরা মুখে মুখে শুদ্ধ করে শিখিয়েছি। সব টুকু কুরআন শরীফ পড়তে হলে কিছু নিয়ম কানুন জানতে হয়, যেমন আরবী যে ২৯ টি অক্ষর আছে তা ১৭ টি স্থান থেকে বের হবে। তাছাড়া লম্বা খাটো কোথায় হবে এসব জানতে হবে। বিশেষ বিশেষ কিছু অক্ষর আছে তা বিশেষ নিয়মে উচ্চারণ করে পড়তে হয়। এভাবে পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ টি করে নেকি পাওয়া যাবে। আর যদি ভুল পড় তবে কুরআন তোমাকে অভিসম্মাত করবে।

তা হলে ওসব আমাকে শিখাওনি কেন ?

একদিনেই কি সব হয় ? প্রথম তোমাকে নামায পড়া পরিমান কয়টি সুরা শিখিয়েছি। এখন আস্তে আস্তে সব কিছু শিকাব। বুঝলে ?

মাহমুদা তাকে আস্তে আস্তে কারআন শরীফ শিক্ষা দিতে লাগল। দু'জনের মাঝে এত মিল যেন এক জন আর একজনকে ছাড়া বাঁচে না। যেন একই বিন্তে দুটি ফুল। হেলেনা মাঝে মধ্যে রসিকতা করে মাহমুদার সাথে। এব্যপারে মাহমুদাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। হেলেনা এক দিন রসিকতা করে বলল, আমি কিন্তু চুরি করব আপা ! পরে যেন ঝগড়া না হয়।

ঝগড়া হবে কেন আল্লাহর যে ফায়সালা তাই হবে। চোর আর চুরণীর হাত কেটে দিতে বলেছেন।

ইসসেরে হাত কাটবে ? হাত কাটা অত সহজ নয়। আমি চুরি করবই করব। পরে কিন্তু----------- ।

কার কি চুরি করবে বল শোনি ?

না এখন বলা যাবে না।

বলনা লক্ষিমণি ?

চোরে কি চুরি করবে, তা বলে দিলে তো আগেই সতর্ক হয়ে যাবে। তাই বলতে নেই।

বুঝেছি তুমি কি চুরি করতে পার, আমি জানি কি চুরি করবে।

সত্যিই বলতে পারবে ? বলতো, বলতে পারলে এনাম পাবে।

তুমি আর কি চুরি করতে পারবে ? চুরি করবে একজন কেই।

সে জনটি কে ?

কে আর হবে, খোবায়েব।

দুততুরী খোবায়েব তো আমরা দুজনেরই। ওকে আবার চুরি করা লাগবে কেণ ?

অন্যের হিসাসা টুকু।

ছিঃ তোমার পেটে শুধু দুষ্টমী। মনে রাখবেন আমি কিন্তু চুরি করবই করব।

এই চুন্নী তুই কি চুরি করবি বলতে পারিস না। চুরি ছাড়া যদি পেয়ে যাস, তাহলে চুরি করতে যাবি কোন ?

আমি চুরি করব সোনা নয়, গয়না নয়,টাকা নয়, পয়সা নয় আমি চুরি করব মানুষের বুকের ধন। বুঝলে আপা ?

আমি অত সাহিত্যিকতা বুঝি না। তোর কথা তুই বুঝ।

এখন তো বুঝেননি আপা সময় হলে সব বুঝবেন !

সময় হলে কি সব বুঝব ?

কি সব বুঝব

আপনার ই হলে, ই কে, ই করব। এখন বুঝলেন ?

শয়াতান পরিস্কা[illegible] বলতে পারিস না ?

বলতে পা[illegible] না কেন, আপনার প্রসব হলে সন্তানটিকে আমি নিয়ে নব। আমি তাকে অ ---নে------ক----আদর করব, সোহগ করব।

আমার বুকে তাকে দুলা দিয়ে ঘুম পারাব, সে বড় হলে আমাকে ডাকবে আম্মু আর আপনাকে ডাকবে খালামনী। এবার বুঝলেন, কি চুরির করব ? মাহমুদা মুখে হাসির রেখা টেনে বলল, তুই তাকে খাওয়াবে কি ?

গাভী-কিনে আনব কালো গাভী। দুধ ভারী মজা।

তুলা দুধে পোলা বাচেঁ না।

আরে বাচবে বাঁচবে। তুমি যখন নাক ডেকে ঘুমাবে তখন তাকে লাগিয়ে দেব সব দুধ উজার করতে।

কোন কোন সময় হেলেনা বলত। আপা আপনার তো জিহাদ করার অনেক সখ, আমার সাথে কিন্তু আপনি আমার মত দৌড়াতে পারবেন না। আপনার -----

মাহমুদা এত বড়াই করিসনে,স্বামী বাড়ী ফিরলে আগামী চাঁদেই খবর হবে। অবস্থা টাইট হয়ে যা্বে। ওদের মধ্যে কল্পণা জল্পণা যাই হয় এরমধ্যে জিহাদের অধ্যায় বাদ পড়েনি। জিহাদ করবে, কাফের মারবে শহীদ হবে এগুলো তাদের আলোচনার বস্তু। মাহমুদা শোয়ে শোয়ে জিহাদের প্রোগ্রাম তৈরী করে। কোন কোন সময় জিহাদ করতে করতে হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। অনেক সময় গভীর রজনীতে স্বপ্নের ঘোরে চিল্লায়ে বলে উঠে ফায়ার কর, ফায়ার কর, ঐ যে পালাচ্ছে। ঐযে পাল্লাচ্ছে। যাও যাও আরো আগে যাও। এসব নিয়ে দিনেও হাসা হাসি চলে দুজনের মধ্যে।

তেত্রিশ

মারবানিয়া পর্বতমালা প্রকম্পিত হল তাকবীর ধ্বনিতে। আকশে-বাতাসে, গিরি কন্দরে সে তাকবীর প্রতিধ্বনিত হয়ে সৃষ্টি হল বিশেষ ধরনের এক পোলক শিহরণ। লতায়,পাতায়, অনু- পরমানুতে আনন্দের দুলা লেগেছিল বিজয়উল্লাসে সকলের চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। এবিজয় রাষ্ট্র জয়ের বিজয় নয়,এ বিজয় কোন পোষ্ট দখল করার বিজয় নয়। এবিজয় তাদের প্রাণ প্রিয় সিপাহসালারকে কাছে পাওয়ার। এ আনন্দ নতুন করে জিহাদের প্রোগ্রাম তৈরী করার। এ উল্লাসে দীর্ঘ কাঙ্খিত প্রিয় জনকে কাছে পাওয়ার।

সিপাহসালার মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী ও তার সহযোগী. ফাগুদায়েভ ও মাওলানা আলাউদ্দীন শরাফী ক্লান্ত, শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত।

বসেগেলেন বিটপী মূলে প্রস্তর খন্ডে। মলিন চেহারা, ভাষাহীন আনন। অক্ষি পল্লব অশ্রু ভেজা। সবাই অপল নেত্রে তাকিয়ে আছে প্রাণ প্রিয় কমান্ডারের ইন্দুনিভাননে। চেহেরা দর্শনে প্রকট হয়ে উঠছে যে কোন দুসংবাদের। এতক্ষণে অনেকেরই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এক চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু কেউ সুধানোর সাহস পাচ্ছে না। কমান্ডার আলায়েভ ডাগর দুটি আঁখি মেলে বিস্ফোরিত লোচনে তাকিয়ে আছেন। এরই মধ্যে জয়নাল আবেদিন হাক্কানী বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন–

হযরত আমীরে মুহতারাম আপনি অনেক দুর থেকে পদব্রজে সফর করে এসেছেন। ক্লান্তি জনিত দুর্বলতা মিশে আছে আপনার সর্বাঙ্গে। হাত পা ধুয়ে কিছু নাস্তা করলে ক্লান্তি অনেকটা দুর হবে। তার পর আমরা আরামের সাথে বসে আমাদের সফর কাহিনী ও এখানে অবস্থানের সুবিধা অসুবিধার দিকগুলো আলোচনা করব এবং আপনার সফর কাহিনী ও শরনার্থী শিবিরের অন্যান্য সংবাদ শোনব। এইতো পানি রাখা আছে আর তাবুঁতে সাজানো রয়েছে খাবার। অতঃপর তাঁরা অজু এস্তেঞ্জা সেরে নাস্তা খেতে বসলেন। মাওলান সামান্য বিশ্রাম নিয়ে দুরাকাত নামাজ পরে, খিমার বাইরে এসে বসলেন। অন্যসব সাথীরা এসে বসে গেল মাওলানাকে কেন্দ্র করে। যেন চাঁদকে ঘিরে তারকাপুঞ্জ। মাওলানা সবাইকে লক্ষ্যকরে বললেন, প্রিয় মুজাহিদ সাথী ও বন্ধুরা আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। সবাই সাওয়ারী পৌছে গেছেন। তাই আদায় করছি মাওলায়ে কারীমের অসংখ্য শুকরিয়া বাকি, কিভাবে এপর্যন্ত এসেছেন এবং বর্তমানে কি অবস্থায় আছেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে শোনালে ভাল হয়। মাওলানার নির্দেশে কমান্ডারবলখী সাহেব আদি-অন্ত সব কিছুই শোনালেন। এর মধ্যে মরম্ন প্রান্তরের অপারেশন ও গনিমতের কথা ব্যক্ত করলেন। তার পর বর্তমান অবস্থানের কথা জানাতেগিয়ে বললেন বর্তমানে আমরা দুই পরাশক্তির সাথে মোকাবেলা করে আছি। জানিনা কত দিন আলস্নাহপাক আমাদেরকে টিকিয়ে রাখেন। পরাশক্তি হল, আমাদের উত্তর পার্শ্বে মারদানিয়া পাহাড়ে রয়েছে হিংস্র বনমানুষের বাস। আর দক্ষীণ পূর্ব পার্শ্বের মারবেনিয়া পাহাড় হল দৈত্য-দানবের (জ্বীন)আবাস ভূমি। মাদাসিকো পাহাড়ে এখনো কোন অভিযান চালাইনি। মনে হয় সেখানেই রয়েছে বন্য হিংস্র প্রানী। বন্যমানুষগুলো খুবই শক্তিশালি। ওরা রোদ পোহানোর জন্য

যে উঠান তৈরী করেছে এতেই তাদের শক্তির প্রমান মিলে। প্রকান্ড বৃক্ষের বড় বড় ডালাগুলো ভেঙ্গে ও ধুমড়িয়ে মুচড়িয়ে একাকার করে দিয়েছে যেন রোদের কিরন সহজেই নিচে এসে পৌছায়। ঘন বন বনানীর পত্রাবরন ভেদ করে সূর্যের কিরণ নিচে আসত না। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে এসব করেছে। ওরা বসবাস করে মৃত্তিকা গর্ভে। বাসস্থানগুলো যেন গোলন্দাজ বাহিনীর সুনিপুণ মজবুত দূর্গ বা ব্যাংকার। আত্বরক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যাংকারের নিকট স্তুপীকৃত করে রেখেছে ছোট বড় ও মাজারী ধরনের পাথর। একজনে একটি হাতীকে অনায়াসে প্রস্তর নিক্ষেপ করে কাবু করতে পারে।

অপর পাহাড়ে দৈত্য-দানবের আস্তানা, ওরা নিক্ষেপ করে অগ্নিবাণ' পাথর। অযথা শোনা যায় আজানের ধ্বনী। শোনাযায় নৃত্য গীতের আওয়াজ। কখনো শোনা যায় সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত। ওরা মানুষস্তুপে প্রকাশ হয়ে এলাকা ছেড়ে যেতে বলে। কখনো কখনো দেখলে পঞ্চ আত্বা দেহ পিঞ্জর ছেড়ে পালানোর পথ খোঁজে। এ পরিস্তির মধ্যে দিয়ে আমরা দিন কাটিচ্ছি। এখন আপনার যবান থেকে কাবুলের ও শরনার্থী শিবিরের অবস্থা, সাথীদের হালাত, আমাদের শ্রদ্ধেয় আমীরে মুহতারাম ও রাস্তার কারগুজারী শোনতে চাই। কমান্ডার সাহেবের কার গুজারী শোনে তার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই মাওলানা সাহেবের চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে গেল। কয়েক ফোটা অশ্রু মুক্তার দানার মত গড়িয়ে পরল নিম্মদেশে। তিনি রুমালে চোখ দুটি মুছে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, প্রিয় ভায়েরা আমাদের অবস্থা খুবই করুন বলতে হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। বেদনার ভার সইতে পারছি না। আমাদের আমীরে মোহতারাম, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসরুর (খোবায়েব) আজ অনেকদিন হয় নিখোঁজ রয়েছেন। অনেক খোঁজা খোজির পরও তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় তিনি আমাদেরকে ছেড়ে শোহাদাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। নাহয় দুশমনের হাতে বন্দি হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছিলেন সে সেন্টার হয়ত কোন মুনাফিকের উস্কানিতে বন্ধ করে দিয়েছে। নিয়মিত রিলিফ না পাওয়ায় শরনার্থীরা খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। কোলের বাচ্চারা ক্ষুধার তাড়নায় মায়ের কোলে

কাতরাচ্ছে। সীমান্তের এপার ওপার নিরাপত্তা জোরদার করায় কোন শরনার্থী পারাপার হতে পারতেছে না। সীমান্ত পারি দেয়ার সময় অনেক শরনার্থীকে বলসেবিকরা গুলী করে হত্যা করে দিয়েছে আমি ৪০ জন সাথী নিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আর বাধা বিপত্তি এড়ায়ে অনেক দুর চলে আসার পর রোগাক্রান্ত হয়ে ৩ জন সাথী শাহাদাত বরন করেন। বাকি ৩৭ জন সাথী নিয়ে মরু ভূমি পার হওয়ার সময় দুশমনের নিক্ষিপ্ত মিসাইল ৩৪ জন জানবাজ মুজাহিদের জীবন কেড়ে নেয়। ওদের নিকট যা ছামান ছিল সবই বিধ্বস্তহয়ে যায়। এ ৩৪ জন সাথী চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন মরু প্রান্স্তরে। এঘুম থেকে আর জাগবে না, ইসরাফিলের সিংগার ধ্বনি ছাড়া। বাকি আমরা তিন জন অনেক লাঞ্চনা,গঞ্জনা সয়ে অনেক কষ্ঠে আপনাদের নিকট এসে পৌছেছি। আফছুছ আল্লাহ যদি আমাকে কবুল করে সাথীদের জিবীত রাখতেন তাহলে মনে হয় দ্বীনের অনেক ফায়দা হত।

মাওলানা সব কিছু শোনে বললেন অত্র এলাকায় কোন লোকালয় গড়ে না উঠার কারণ যা বুঝা যাচ্ছে তা হল এঅসভ্য বন মানুষ ও জ্বীন্নাতের উপদ্রব। মনে হয় এদিকে কোন কাঠুরীয়া ও শিকারী আসে না। তবে আমাদের আগমন বলসেবিকরা জেনে গেছে। এদিকে আসছে এবং উভয় কাফেলাকে ঠেকানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্ঠাও করেছে, ট্রেংক বহর পর্যন্ত পাঠিয়েছে যদিও আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি কিন্তু আমাদের ব্যপারে তো তারা বিজয়ী হয়েছে। আমরা আসার পথে পরিত্যেক্ত ট্রেঙ্ক গুলোর সাথে সাক্ষাত হয়নি। মনে হয় ওগুলো পরবর্তীতে এসে নিয়ে গেছে। আমার যতদূর ধারণা হয় ওরা আমাদের উপর বিমান হামলা চালাবে। অথবা কমান্ডো নামাবে। সম্ভাব্য বিপদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করা যায়, আত্বরক্ষার কি পথ আবিস্কার করা যায় , তার দ্রম্নত পদক্ষেপ নেয়ার দরকার। ওরা এক হামলাতেই আমাদের মুজাহিদ সংখ্যা শূন্য কোঠায় নিয়ে এসেছে। আমাদেরও অস্থিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। কমান্ডার আলায়েভ বললেন হযরত সমর বিদ্যায় ও সম্মুখ সমরে আমরা যদিও তেমন পারদর্শী নই্ কিন্তু তবু আমরা এক কদম ও পিছপা হব না। কিন্তু হারামজাদারাতো কোন সময় নীতি অনুস্বরণ করে না। তাদের আক্রমণ বরবরোচিত। এরা কিছু হতে না হতেই বিমান হামলা চালিয়ে

দেয়। দু একজনের জন্য এরা কামান দাগাতে ও কসুর করে না। সব দিক বিবেচনা করে আপনি একটি সিদ্ধান্ত নিন অবিলম্বে। বিমান হামলার আশংখা সুপ্রকট। কারণ গত কল্য দুপুরে অনেক উপর দিয়ে একটি বিমানকে চক্কর দিতে দেখেছি।

কমান্ডার আলায়েভের কথা শোনে, মাওলানা বললেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে একটু এলাকা জরীপ করে দেখতে হবে। চল আমার সাথে কে রাহাবরী করবে? এতটুকু বলার সাথে সাথে দারিয়ে গেলন। আলায়েভ, ফাগুদায়েভ আলাউদ্দীন, ও জয়নাল। চললেন এলাকা জরীপে, ফিরে এলেন ৩ ঘন্টা পর। এবার চলল আত্বরক্ষার ও পরিস্থিতি টেকেল দেয়ার পরামর্শ। মাওলানা বললেন, আমাদের পশ্চিমে বৃক্ষরাজির যে বিশাল টিলা রয়েছে এটাই হেলিকপ্টার অবতরণের উপযুক্ত স্থান। এর উত্তর পার্শ্বে ঘন ঝোপ ঝারের অন্তম্বরালে তিন জন লোক সংকুলান হয় এমন একটি ব্যাংকার তৈরী করতে হবে। ব্যাংকারের ছাদ হবে মোটা কাঠ তার উপর মাটি ও পাথর। তার উপর এমনভাবে ঘাস আর লতা পাতা লাগতে হবে উপরে দাঁড়ালেও যেন কেউ চিনতে না পারে। আমরা বর্তমানে যেখানে আছি এখানে ভাল তাঁবুগুলো উঠায়ে ছেড়া ফাড়া কয়েক তাঁবু নির্মান করতে হবে। তারই এক পার্শ্বে একটি উনুন তৈরী করতে হবে এর উপর হাঁড়ি বসিয়ে পানি জ্বাল দিতে হবে অর্থাৎ এখান থেকে যেন অনবরত ধুমার কুন্ডলী আকাশে উড়তে থাকে। বাকি পূর্ব-উত্তর ও দক্ষীণে যে দুটি গুহা দেখেছি এর সম্মুখে মাটি ও পাথরের স্তুপ এমনভাবে সাজাতে হবে। মানুষ দেখলে যেন মনে করে এটা কুদরতীভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এটায়ে নতুন কিছু তা যেন বুঝা না যায়। আর পূর্ব দিকেও সেরূপ একটি ব্যাংকার খনন করতে হবে। এখান থেকে আমাদের যাবতীয় ছামানা অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। আমি দুজন সাথী, দুটি থ্রি-নাট থ্রি রাইফেল, এক টি মেশিনগান, প্রয়োজনীয় গোলা বারম্নদ ও গ্রেনেড নিয়ে পশ্চিমের টিলায় অবস্থান করব। আর তোমরা, তিন জন, চার জন করে সাথী এস,এল,আর। এল,এম,জি। ক্লাশিনকভ।ও ষ্টেনগান নিয়ে গুহাও ব্যাংকারে অবস্থান করবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তোমরা কখনো বেরোবে না। এর ভিতরে বসে খুব বেশী

বেশী নামায, জিকির ও তিলাওয়াত করবে। কম পক্ষে এক সপ্তাহ আমরা এভাবে বিমান আক্রমনের অপেক্ষা করব। তার পর অন্য ফিকির। অশ্বগুলো নিয়ে লম্বা করে বেধে রাখতে হবে যেন লতা পাতা খেতে পারে। নিকটে রয়েছে ঝর্ণা, সেখান থেকে নিজেরাই পানি পান করতে পারবে। তিনি আরো বললেন–

প্রিয় মুজাহিদ সাথীরা, আমি আগে যা মনে করেছিলাম যে,এখান থেকে দুশমনের ইউনিট বা মুর্চাগুলোতে আক্রমন করা যাবে। এখন দেখলাম তার উল্টো। এত দূর থেকে এক মাসে একটি হামলা করা সম্ভব নয়। এখানে যেহেতু এসেই গিয়েছি তাই ছবরের সাথে একটু অপেক্ষা করে দেখি একটা কিছু করা যায় কি না। প্রিয় বন্ধুরা আমি যতটুকু জানি বলসেবিকরা কোন বন বা পাহাড়াঞ্চলে আক্রমন করতে হলে প্রথমেই নামায় কমান্ডো, দ্বিতীয় পর্যায়ে করে বামভিং আর কমান্ডো নামালে নামাবে টিলার উপর। কপ্টার কমান্ডো নামিয়ে খুব ধীর গতিতে উপরে চক্কর দিতে থাকবে, ওয়ারলেছে খবর আদান প্রদান করবে। অভিযান শেষে কপ্টার ল্যেন্ড করবে উক্ত টিলায়। সেখান থেকে সৈন্যদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা যারা টিলায় অবস্থান করব আমরা প্রথমে কোন ফায়ার করব না। সৈন্যরা যখন আমাদের বর্তমান অবস্থানে, তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসবে তখন যার রেঞ্জে যাদেরকে পাবো তাকেই ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করবে। সাবধান তোমরা সর্ব প্রথম ওয়ারলেছ সেট ছিনিয়ে নেবে যেন কোন খবর পাইলটকে দিতে না পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে চোখের পলকে পাখির মত বিমান বহর এসে বোমভিং করে পাহাড় ঝাঁঝরা করে দেবে। যে গ্রোপ প্রথমে ওয়ারলেছ সেট ছিনিয়ে নিবে, তারা প্রথমে ফায়ার করবে। যদি ওয়ার লেছ ছিনিয়ে নিতে ১৫/ ২০ মিনিট বিলম্বও করতে হয়, তবু আমরা তাই করব। আর যদি ছিনিয়ে নেয়ার মত কোন ব্যবস্থা না হয় তবে প্রথমে নিশানা করবে ওয়ারলেছ সেটে,তার পর ব্যক্তি কে। একজন সৈন্য কেও আমরা ফিরে যেতে দেবনা ইনশালস্নাহ। আলস্নাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এখন তোমাদেরকে কমান্ডার সাহেব কাজ বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর কার কি কাজ, কার সাথে

কে থাকবে, কোথায় থাকবে এসব বন্টন করে দিলেন। সাথীরা দৌড়া দৌড়ি করে ব্যাংকার খনন করতে লাগলেন। কার ব্যাংকার কত মজবুত হয়,কারটা কত সুন্দর হয় তা নিয়ে চলছে প্রতিযোগীতা।

দু'দিনে সব কাজ সুম্পর্ণ করলেন। মাওলানা ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন, প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শও দিলেন পূর্বের স্থানে উচুঁ উঁচু গাছ-গাছরার উপর আলজিহাদ খচিত একটি পতাকা উড়িয়ে দিলেন। সব সাথীরা গুহা ও ব্যাংকারে চলে গেলেন। চলল ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা দুদিন পর আনুমানিক দুপুর ১২টার দিকে একদম কালো বর্ণের একটি বিশাল দেহী হেলিকপ্টার আমাদের মাথার উপর দিয়ে খুব মন্থর গতিতে চক্কর দিতে লাগল। সে সময় সাথীরা খুশীতে আত্বহারা, উল্লাসে মাতোয়ারা, আনন্দে আপন হারা পুলুকে দিশে হারা। শিকার সামনে এসে গেছে। এবার খেলা জমাবে ইচ্ছামত। সবাই সেজদায় লুটিয়ে পরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে লাগল। তাদের আনন্দ দেখে কে ?

কাপ্টারটি কয়েক চক্কর দেয়ার পর দরজা খুলে গেল। প্রসব করতে লাগল গাভুর গাভুর বপুত্মান বলাম্বিত কমান্ডো বাহিনী। ওরা যমিনে অবতরণ করে বিপুল দম্ভের সাথে অত্যন্ত সতর্কাবস্থায় এক অভিনব ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে চলছে। হেলিকাপ্টার অপেক্ষা কৃত একটু উপর দিয়ে টহল দিচ্ছে। কমান্ডোরা দৌড়িয়ে গিয়ে আমাদের নির্ম্মিত প্রস্তারটিলার উপর দাড়িয়ে খবর পাঠাচ্ছে যে, আমরা ঠিক ঠিক মত দুশমনের ঘাটিতে পৌঁছে গেছি। এতটুকু বলার সাথে সাথে ব্যাংকার থেকে আমাদের দুজন সাথী বেরহয়ে তার ওয়ারলেছ সেটটি ছিনিয়ে নিয়ে কমান্ডো কায়দায় তার মুখ চেপে ধরে নিয়ে গেল গর্তের ভিতর। বেধে ফেললে মজবুত করে তার হাত পা। এবার ব্যাংকার গুলো থেকে আরম্ভ এক যুগে ফায়ার চোখের পলকে ৫০ জন কমান্ডারের মধ্যে ৪২ জনই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল ভুমি তলে। ৭ জন আহত অবস্থায় এত গুলো জীবন কেড়ে নিল তা ঠাহর করতে পারেনি। অব শেষে এরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এদিকে হেলি কপ্টার থেকে পাইলট বার বার খবর জানতে চাচ্ছে। অন করা ওয়ারলেছে চিলস্না পাল্লা করতেছিল। এর মধ্যে আলাউদ্দীন শরাফী খবর দিয়ে দিল যে, আমরা সফল অভিযান

চালাচ্ছি। কিছু আত্মসমর্পণ করেছে। বেশ অস্ত্র উদ্ধার করেছি। আমাদের অভিযান ৬ ঘন্টা চলবে। আমাদের খাদ্য সর্বরাহ দরকার। এসংবাদ পেয়ে কপ্টার চলে গেল তাদের ঘাটিতে।

তার পর সাথীরা সব জড়ো হয়ে জরুরী পরামর্শ করলেন। আমীর সাহেব আহত ৭ জনকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। এক জনকে রেখে দিলেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। আমীর সাহেব বললেন তোমরা কমান্ডোদের ইউনিফরম পড়ে নাও। সবাই তা করল। বিকাল ৪ টার সময় হেলিকপ্টার ফিরে এসে আবার চক্কর দিতে লাগল। এবার পাইলটকে জানিয়ে দেয়া হল হেলিকপ্টার লেন্ড করানোর জন্য। কপ্টার উক্ত টিলার উপর অবতরন করার সাথে সাথে সিপাহসালার আরো দুজন উর্দি পরিহিত সাথীকে নিয়ে কপ্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। কপ্টারের দরজা খুলে গেলে তারা ভিতরে প্রবেশ করে ৩ জন পাইলটকে বন্দি করে। পাইলট পোষাক দেখে ভাবছিল এরা কমান্ডো। তাই প্রথমে বাঁচার জন্য কোন চিন্তা করেনি। এবার সবই বন্দি।

হেলিকপ্টারে যে সব খাবার এনেছিল তা মুজাহিদরা উদর পূর্ণ করে আহার করলেন। তারপরও যে খাবার রয়ে গেছে তা তিন দিন অনায়াসে খাওয়া যাবে। আমীর সাহেব বন্দিদের কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করলেন। সারা দেশে কোথায় কি হচ্ছে তা জানলেন। তার পর সিপাহসালার ওয়ারলেছে আর্মী হেডকোয়াটারের প্রধান সেনা নায়ককে বললেন হে-হেল্যো। আমি খোবেয়েব বলছি। পাহাড় অরণ্যে কমান্ডো আক্রমনে আপনাদের ৫০ জন কমান্ডার, ৩ জন পাইলট এবং একটি কপ্টার আটক করেছি। আমাদের যত মুজাহিদ সাথী আছে তাদেরকে দু'ঘন্টার ভিতর ছেড়ে না দিলে সবাইকে হত্যা করা হবে এবং কপ্টার ধ্বংশ করা হবে। দু ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে অবশ্যই নিউজ পাঠাতে হবে।

এসংবাদে বিরাট আতংক ছড়িয়ে পরল আর্মী হেড কোয়াটারে। বড় বড় জেনারেল আর কর্নেলরা পরামর্শে বসে গেল এতে ডাকা হল কমিউনিজমের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে। দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর এক জন নেতা বললেন, দশজন কমান্ডোর সমান এক জন মুজাহিদ। শত শত মুজাহিদকে মুক্তি দিয়ে ৫০জন কমান্ডোকে ফিরিয়ে আনার কোন যুক্তি

কতা নেই। অতএব এব্যাপারে নমনীয় হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না অপর এক জন বললেন, আপনার কথা সত্য। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একজন কমান্ডো তৈরী করি। এরা কি কমান্ডো না, ভেড়া বকরি তা কিছুই বুঝে আসে না। তা নাহয় ৫০ জন উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কমান্ডো আবার অত্যাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এক শক্তি শালী বাহিনী। আবার একটি গানশীপ হেলিকপ্টার। এসব নিয়ে এরা কি করে কয়েক জন মুজাহিদদের হাতে জিম্মি হল তা কিছুই বুঝে আসে না। বুঝা যায় আমরা এতদিন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভেড়া বকরি পোষেছি। একথা ভাবতেও লজ্জা লাগে। আমার খেয়াল হল এসব কমন্ডো আর পাইলটরা যদি কপ্টার সহ মুক্তির পথ খোঁজে বেরকরতে না পারে তাহলে এসব গর্দব্যের জন্য আর কোন উদ্ধার কর্মি পাঠানোর প্রয়োজন নেই। এরা সেখানেই ধ্বংশ হয়ে যাক। উক্ত প্রস্তাবে বেশ কজন নেতা কর্মি হাত তালী দিয়ে সমর্থন জানালেন।

সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক দাঁড়িয়ে বললেন নেতৃত্ব দেয়া আর যুদ্ধ করা এক বিষয় নয়। দেশকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আনতে হলে থাকতে হবে সেনাবাহিনীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও প্রশাসনিক সহযোগিতা। এদুই জিনিস ছাড়া কোন দেশই নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে না। প্রশাসনিক দিক থেকে যদি সৈনিকদের কোন মূল্যায়ন না করে তবে সৈনিকরা হয়ে যাবে হতোদ্দম। তখন কোন অপারেশনেই সাকসেসফুল হওয়া যাবে না। কারণ সৈন্যরা নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবে না। জিম্মি সৈন্যদের উদ্ধার না করলে এধরনের আক্রমণে ভবিষ্যতে আর কোন সৈন্য পাঠানো যাবে না। আবার কোন সময় দেখাযাবে সামান্য ব্যপারেই তারা লক্ষ লক্ষ্য টাকার অস্ত্র নিয়ে আত্ব সমর্পন করবে। দুশমনের নিকট মহামুল্যবান অস্ত্রগুলো তুলে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে আসবে।

আমর নিকট যে ওয়ারলেছ আসছে তা দুধর্ষ্য মুজাহিদ খোবায়েব জাম্বুলীর। এত দিন পর্যন্ত তার কোন সংবাদ আমরা পাইনি। এবার ওরা সুসংগঠিত হয়ে বিপুল শক্তি নিয়ে তাতারিদের মত পতিত হবে আমাদের সৈন্যদের উপর। মুজাহিদদের বিরূদ্ধে অভিযান চালিয়ে সবগুলোর উপর বিজয় অর্জন করা এত সহজ নয়। কাজেই জিম্মিদের ব্যপারে আপনাদের তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

সর্বাধিনায়কের কথা শেষ হতে না হতেই কেন্দ্রীয় নেতা হ্যাপীষ্টন্স দন্ত পাটি কটমট করতে করতে বলে উঠলেন, একজন সেনাপতির পক্ষে শত্রূর

প্রতি দুর্বলাতা প্রকাশ করার অর্থই হল দুশমনের পক্ষে উকালতি করা এবং অধিনস্ত সৈন্যদের মনোবল দুর্বল করে দেয়া। সেনা পতি যদি সর্ব দিক দিয়ে সুচ্চার নাহয় তা হলে উক্ত পদে থাকার তার কোন অধিকার নেই। অত এব আজকের আহুত বৈঠকেই এব্যপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হাউসকে অনুরুদ জানাচ্ছি। সে সময় হাউসের পিনপতন নিরবতা ভঙ্গ করে কমরেড রোগান গর্জে উঠে বললেন, এখনই সর্বাধিনায়কের ইউনিফরম খুলে সহকারী সর্বাধিনায়ক মিষ্টার বোইংজয়ীকে পড়িয়ে দিতে নির্দেশ করা হল। এখন থেকে ভার প্রাপ্ত হিসাবে সর্বাধিনায়কের পূর্ণ দায়িত পালন করবে মিঃবোইংজয়ী। আর সেনাবাহিনীর কলংক সর্বাধিনায়ককে বন্দি করে সামরিক কারাগরে নিক্ষেপ করা হোক। হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে তাই করা হল। এরই মধ্যে অন করা ওয়ারলেছ সেটটি হ্যালো হ্যালো শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। সাথে সাথে কমরেড রোগান হাত বারিয়ে সেটটি মুখের কাছে এনে বললেন হ্যালো,কথা বলেন। সাথে সাথে বেজেউঠল আমি পাইলট সুরাসিকো বলছি মারবানিয়া পর্বত মালা থেকে আমরা খোবায়েব জাম্বুলীর মুজাহিদ বাহিনী কতৃক জিম্মি হয়ে আছি। আমাদের সমস্ত অস্ত্র-সস্ত্র ও হেলিকপ্টার মুজাহিদদের দখলে। জেলখানায় বন্দি সকল মুজাহিদেরকে মুক্তি দিলে আমাদেরকে ছেড়ে দিবে। আমরা সবাই ভাল আছি। আমাদের প্রতি কোন র্দুব্যবাহার করা হয়নি। মুজাহিদদের কে মুক্তি না দিলে আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোন সামরিক স্থাপনার উপর হামলা চালাবে। মুজাহিদদের আক্রমন প্রতিহত করা খুব কঠিন হযে দাঁড়াবে। মুজাহিদরা আমাদের পার্শ্বে ঘড়ি নিয়ে বসে আছে খবরের অপেক্ষায়। এখন আপনারা বলুন কি করবেন ? একথাগুলো হাউসের সবাই শোনছিল। (আতংক সৃষ্টির জন্য খোবায়েবের নাম বলা হয়েছে)

সভাকক্ষ নিরব নিস্তব্দ। কারো মুখ থেকে কোন শব্দ বের হচ্ছে না। কমরেড রোগান আবার সভ্যমন্ডলী কে প্রশ্ন করলেন, আপনার সবাই শোনেছেন। এখনবলুন আমি কি সংবাদ পাঠাতে পারি? একজন বললেন নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন কি জানিয়ে দিলেই তো পারেন। এবার কমরেড রোগান বলে উঠলেন তোমাদের মত ভিন্ন, কাপুরুষ, অনভিজ্ঞ ভেড়ার পালের আমাদের প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি তোমাদের মুক্তির

পথ আবিস্কার করতে পার তা হলে ফিরে এসো। ফিরে এসে সোজা বাড়ী চলে যাবে,সেনা ব্যারাকে নয়। এখন থেকে তোমরা আমাদের কেউ নও। এত টুকু বলে ওয়ারলেছ সেট অফকরে দিলেন। আর এক দফা হাত তালীতে সভা কক্ষ গরম করে তুলল।

অতঃপর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গড় গড় করে মদের বোতলগুলো ডেলে দিলেন নিজ নিজ মুখগহবরে। জেনারেল গনের মুখ মুজাহিদদের পাঠানো সংবাদে ফেকাশে হয়ে গেল। কখন কোন পোষ্টে বা ক্যানটনমেন্টে কিয়ামত নাজিল হয়ে যায় তা কে জানে ? আবার একটু চুঁ-চেরা করলে আসামী সেজে যেতে হয় লালদালানের অন্ধকার প্রকুষ্টে। খোয়া যায় চাকরী। আর কত কিছু। প্রশাসনের এহেন নিষ্ঠুর আচরনে জেনারেলদের মুখের হাসি কেড়ে নিল। মুজাহিদদের বার্তায় রাতের ঘুমকে হারাম করে দিল। চোখে দেখে হলদে সর্ষেফুল। অর্থাৎ বিপদ সংকেত। মুজাহিদরা পাহাড়ে বসেই নেতাজীদের সভার সমস্ত খবর পেয়ে গেল, কারণ ওয়ারলেছ সেটটি ছিল অন। আবার পাইলটের দ্বারা যখন ওয়ারলেছ করালেন তখনো কমরেড রোগানের হুমকী ধমকী শোনতে পাচ্ছিলেন। এবার মাওলানা আঃসাত্তার বলখী পাইলটদের লক্ষ্য করে বললেন, কি মিয়া ভাইএরা এখন উপায় কি তা পরামর্শকরে ঠিক করম্নন। আপনাদের নেতা কর্মীগন আপনাদেরকে কত টুকু মূল্যায়ন করেন তা তো এখন বুঝতে পারলেন ? পৃথিবীতে আছে কি কোন এমন দেশ যেখানে প্রশাসন সামরিক বাহিনীর উপর এমন নিষ্ঠুর আচরন করে ? ওরা তো সাধারণ নাগরীকদের মর্যাদা ও আপনাদেরকে দিল না। আপনাদেরকে ছেড়ে দিলে যদি নিরাপদে থাকতে পারেন তা হলে আমরা ছেড়ে দেব। আর যদি মনে করেন দেশে ফিরে গেলে কারা নির্যাতন ভোগ করতে হবে তা হলে আমাদের সাথে থাকতে পারেন। এটা আপনাদের অভিরুচী। এখন চিন্তা করে দেখুন কোনটি বেছে নিবেন ? কমান্ডার সাহেবের কথা শোনে পাইলট প্রধান সুরাসিকো বললেন, কমিউনিষ্ট হায়েনাদের মধ্যে মনুষত্ব ও মমত্ব বোধ নেই। ৪৯ জন সাথী, অস্ত্র-সস্ত্র ও হেলি কপ্টার রেখে আমরা ৪ জন গিয়ে যদি হাজির হয় তা হলে যেসব নির্যাতন আমরা নেতাদের কথায়

মুসলমানদের উপর করেছিলাম, এর চেয়ে শতগুন বেশী নির্যাতন করা হবে আমাদের উপর। না হয় ব্রাশ ফায়ারে জীবন লিলা সাঙ্গ করে দেবে। ওরা যখন আমাদের সাথে এনিষ্ঠুর আচরণ করেছে তাহলে ,আর দেশে ফিরে যাব না। আপনারা যদি আশ্রয় দেন তাহলে বলসেবিকদের বিরুদ্ধে আপনাদের পক্ষ হয়ে লড়াই করে যাব। আমরা আপনাদেরকে পাইলট বানাব এবং এমন কিছু কলা কৌশল শিখিয়ে দেব যা দ্বারা আপনারা অনেক উপকৃত হবেন। তাছাড়া আমাদের সাথে একজন কমান্ডো রয়েছেন, তিনিও আপনাদেরকে অনেক কলা কৌশল শিখাতে পারবেন। অতঃপর মাওলানা সাহেব তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন এখন আপনারা আমাদের মেহমান। নির্ভয়ে আমাদের সাথে অবস্থান করতে থাকুন।

চৌত্রিশ

মিস জমিলিনা ব্রক্স একদিন মস্কোর কারাগার পরিদর্শনে গেলেন। সঙ্গে তার এক বান্ধবী,মিস্ কেনিডলী। পায়ে হিলসু ,পরনে জিন্সের পত প্যান্ট, গায়ে মোটা গেঞ্জি চোখে গগচ,মাথায় লেডিস কেপ। পিংগল বর্ণের দু জোড়া চোখ দুজনের কপালের নিচে স্থাপীত। বিথান কেশ গুচ্ছ এদিক ও দিক উড়ছে। পিছন দিক দিয়ে তাকালে অনেকেই মনে করবে ভার্সিটির ছাত্র। বিলোল তাদের হাঁটার গতি। চঞ্চলা হরিণীর মত চাহনী। কেউ দেখলে মনে করবে নাট্য মঞ্চের অভিনেত্রী। দুবান্ধাবী কারাগারে প্রবেশের সাথে সাথে জেল কর্মকতারা তাদের অভ্যর্থনা জানাতে গেইট পর্যন্ত এলেন। অন্য দিনের তুলনায় আজকের জেলখানার চেহারা অন্য রকম। এক দিন আগেই আমাদের দ্বারা পরিস্কার করায়েছে সবগুলো সেল। আমরা এন্তেজার করতে ছিলাম নতুন কোন আইটেমের নির্যাতনের জন্য। কারণ এর আগেও কোন নেতা জেল পরিদর্শনে আসলে তাদের সম্মুখে আমাদেরকে আনাহত উলঙ্গ করে। এর মধ্যে নারীরাও বাদ পরত না। ছিঃ কত নোংড়ামী ও বিভৎস চিত্র। নেতাজিরা বসতেন তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। তার পর চলত আমাদের উপর নতুন নতুন নির্যাতন। যে সমস্ত কর্ম কর্তারা বেশী নির্যাতন করতে পারত, তাদেরকে নেতাজিরা পুরুস্কৃত করতেন। তাই আমরা নতুন নির্যাতনের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আজকের ব্যপারটা

দেখলাম তার উল্টো। আমাদেরকে ডাকা হয়নি নির্যাতন সেল। দেখলাম নেতাজিরা দুজন মহিলাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ঘুরে ঘুরে সেলগুলো দেখাচ্ছেন। কায়েকটি স্যেল পরিদর্শন করে এলেন আমাদের সেলে। দেখতেছেন কয়েদিদেরকে। আমার নিকট আসতেই মেহমানের চোখে আমার চোখ পরেগেল চেয়ে দেখি এ তো সাইবেরিয়া সফরের সেই মেয়েটি যে আমার নিকট জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল। এতো সেই মেয়েটি যাকে আমি আজিম ভাই মনে করে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলাম। এ তো সেই মেয়েটি যে আমাকে নিরাপত্তার ওয়াদা দিয়ে ছিল। মিসজমিলিনা ও আমাকে চিনতে কসুর করেনি। অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মায়া ভরা চাহনী। অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তখনো আমার হাতে পট্রি বাঁধা ছিল। তার চোখ দুটি ছল ছল করছিল। এতক্ষণ উভয়েই যেন ভাব সাগরে সাঁতার কেটে নিরব ভাষায় কথা হচ্ছিল। এবার আমি কিছু বলার আগেই তার জবান খুলে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, ভাই আবদুল্লাহ আপনার এ অবস্থা কেন ? মেয়েটি আমাকে নাম ধরে ডাকার কারণে সবাই বুঝে নিল সে আমার পূর্ব পরিচিতা তাই সবাই আমাদের দিকে বিস্ফরিত নয়নে তাকিয়ে দেখছিলেন।

মিস জামিলিনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, আমি আপনাদের নিকট য পাওনা ছিলাম, তা পেয়েছি। আপনাদের যা পাওনা ছিল তা নিয়ে নিয়েছেন।

আমাকে বুঝিয়ে বলুন ঘটনা কি ঘটেছে ?

আমাকে দুটি হাত আল্লাহ দান করেছেন জালিমের হাত গুড়িয়ে দেয়ার জন্যে অত্যাচারির কালো হাত ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। তাই আমি আমার হাতকে জালিমের উপর ব্যবহার করেছি। সাত জন জেল কর্মচারিকে জাহান্নামের ভিসা ও আকামা দিয়ে পাঠিয়েছি। তাই আমার এ অবস্থা।

আপনি কেন এমনটি করলেন ?

আমরা হতে পারি কয়েদি, কিন্তু মানুষ। আমাদের আছে বাঁচার অধিকার , আছে মান ইজ্জত রক্ষার অধিকার। আপনারা আমাদের যে সব খাবারদেন সেসব খাবার যারা চুরি করে। মজলুম মানুষের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নেয়, এমন সব জালিমদের দুনিয়ায় থাকার অধিকার নেই। তাই----------- ।

আমাদের আলাপ আলোচনার সময় জেলকর্মকর্তাসহ অনেক কর্মচারী বৃদ্ধ আমাদের পার্শ্বে ছিলেন। এদের সামনে কথা না বারিয়ে চলে গেল বিশেষ অতিথী ভবনে। সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে যাবে। সবাই চলে গেলেন। তার পর সমস্ত কয়েদিরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল এসব উচ্চ পর্যায়ের নেতার সাথে কি করে আমার পরিচয় হল। কিভাবে সে আমাকে চেনে। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সাইবেরিয়ার নির্মম কাহিনী ওদের শোনালাম তা শোনে বিস্মৃত হলেন এবং আফছুছ করতে ছিলেন। একটু পরে একজন লোক এসে আমাকে রেষ্ট হাউসে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি কেইক, কিস্কুট, ফল মুল, সহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার ও নেশাজাতিয় পানিয় নিয়ে ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি যাওয়ার সাথে সাথে পার্শ্বে বসায়ে নাস্তা করতে লাগলেন। আমও তাদের সাথে খানায় শরীক হলাম। উক্তরুমে আমরা ৩ জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমি মনে মনে একটু ভয় করতে ছিলাম। নাস্তা খাওয়ার শেষে একটি বোতলের ছিপি খুলে আমার সামনে ধরল। আমি চেহারা বিক্রিত করে বললাম,আপা আমার মদের অভ্যাস নেই।

কারণ ?

আমাদের ধর্মমতে নিশাজাতিয় পাণীয় পানকারা হারাম অর্থাৎ একে বারে নিষিদ্ধ। কারণ এতে মস্তিস্কের মধ্যে বিক্রিতি আসে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এসময় তার দ্বারা ভাল কোন কাজের আশা করা যায় না। এমন কি মা-বেটা ও ভাই-বোনের প্রার্থক্য পর্যন্ত বুঝে না। এধরনের অসভ্যপনা ইসলামে নেই। ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলাম শান্তি র ধর্ম।

ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে তা হলে তোমরা যুদ্ধ কর কেন ?

আমরা যুদ্ধ করি শান্তি প্রতিষ্টার জন্য। ইনসাফ কায়েম করার জন্য। মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য। আমরা যুদ্ধ করি শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন বন্ধ করার জন্য। বঞ্চিতের অধিকার আদায় করার জন্য। বাক স্বাধীনতা, ও ধর্মীয় স্বাধীনতা আদায়ের জন্য। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হল, জিহাদ করা আল্লাহর হুকুম। সমস্ত কুফুরি ফেৎনার মূল উপাটন করে ইসলামকে বিজয়ী করা।

অ ----তাহলে ক্রোসেড, তাইনা ?

ক্রোসেড নয় জিহাদ।

যাক তোমার নিকট থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সত্য ধর্ম,মানবতার ধর্ম তা ঠিক। সাইবেরিয়া সফরে যাওয়ার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে,এটা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। সকল ধর্মের সেরা ধর্ম। তোমাদের ধর্মে খোজে পাওয়া যায় পবিত্রতা ও শরাফত। আর আমাদের ধর্মে, বরবরতা, হীন মনমানসিকতা, অভদ্রতা, পরশ্রীকাঁতরতা, মূর্খতা, লৌকিকতা, কৃত্রিমতা,হঠকারিতা আরো কত্তসব জঞ্জাল।

না, আপা আমি আপনার ধর্মকে এত কিছু বলি না। আমাদের মাঝে ও আপনাদের মাঝে বেশকম এতটুকু যে আপনার তৃত্ববাদী অর্থ্যৎ তিন খোদায় বিশ্বাসী। আর আমরা একত্ববাদী অর্থাৎ এক খোদায় বিশ্বাসী। ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক মূলত আমরা সবাই মানুষ। সকলের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, আরম-আয়েশ একই ধরনের। কেন আমাদের উপাসনালয় আপনাদের আস্তাবলে ও ক্লাবে পরিণত হবে? কেন আপনাদের হাতে আমার মা-বোন লাঞ্ছিতা হবে? কেন আমাদের স্বাধীকার ও বাক স্বাধীনতা হরন করা হবে? কেন আপনাদের দ্বারা আমাদের দোকান পাট ও বাড়ী ঘর লুণ্ঠিত হবে । কেন আপনারা আমাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করছেন? কেন আমাদেরকে আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন মানতে বাধা প্রদান করেন ? কেন আমাদের ইচ্ছার বাইরে আমাদের ঘারে কমিউনিজম শাসন চাপিয়ে দিচ্ছেন? যে মানুষকে তার মায়েরা স্বাধীন হিসাবে প্রসব করেছে,সে মানুষকে কেন আপনারা গোলাম বানিয়ে রাখতে চান ? এধরনের হাজার প্রশ্নের জবাব দেবেন কি আপা ?

ভাই আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়া আমি কেন কোন নেতা-নেত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সত্য কথা বলতে কি ? আমরা যে মতবাদ (কমিউনিজম) নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এটা আসলেই মানবতা বিরোধী। তার পরেও চাচ্ছি ধনি-গরীবকে এক সারিতে আনতে। এতে আমরা ৮০ পার্সেন সফল হয়েছি।

বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয় তো ?

সবাইকি হাসি-খুশী, মেনে নিয়েছে তা নয়, কিছু বল প্রয়োগও করতে হচ্ছে।

৮০ ভাগ যে আপনারা সফল হয়েছেন তা সত্য, তবে হিসাবটা মনে হয় এভাবে হবে। শ্রমিকদেরকে লোভ দেখিয়ে হাত করেছেন। আর কৃষকদেরকেও দেখিয়েছেন বিরাট লাভ। গরীব দেরেও তাই যখন কৃষক,

শ্রমিক, আর গরীবদের কে পেয়ে গেছেন তখন ৫০ ভাগ লোক আপনারা পেয়েছেন। এ ৫০ ভাগ লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আপনারা শক্তি শালী এক বাহিনীতে পরিণত করেছেন। তার পর চলল নির্যাতন। পরে জোর খাটিয়ে আনছেন ১০ ভাগ। ভয়ে আসছে ১০ ভাগ আর ভয় দেখিয়ে আনছেন ১০ ভাগ। এভাবে মোট ৮০ ভাগ আপনারা পেয়ে গেলেন। বাকি রইল ২০ ভাগ। এ বিশ ভাগকে যে কোন মূল্যে পদানতা করার জন্য আপনারা কোন কিছু করতে বাকি রাখেননি। এ বিশ ভাগের মধ্যে আলেম উলামা সহ ১০ ভাগকে করেছেন হত্যা। ৫ ভাগকে করেছেন ভিটা বাড়ী থেকে বঞ্চিত তাই বাধ্য হয়ে তারা দেশান্তরিত হয়েছে ,৪ ভাগকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন জেল খানায় আর এক ভাগ আপনাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে অর্থাৎ জিহাদ করতেছে। এহল আপনাদের বিপ্লবের কুৎসিত চিত্র। আমার এ জরীপ রিপোর্টে সম্পাদনা যদি আপনি নিজে করতেন, তাহলে খুব খুশী হব।

আপনার রিপোর্টে লাল কালি নির্দেশ করবে এমন কেউ নেই তবে সর্ব শেষ ভাগের উপর আমার একটু সন্দেহ রয়েছে, তা দূর করে দিলে ভাল হত।

কোনটির উপর আপনার সন্দেহ ?

এক ভাগের উপর, অর্থাৎ মুজাহিদদের উপর।

বলুন ! কি ধরনের সন্দেহ আপনার ?

আপনি বলছেন মাত্র এক ভাগ লোক জিহাদ করতেছে। এহিসাবে বুঝা যায় মুজাহিদদের শক্তি এক ভাগ, আর আমাদের শক্তি ৮০ ভাগ। এক ভাগ শক্তি নিয়ে ৮০ ভাগ শক্তির ঘুম হারাম করে দেয়ার যুক্তিকতা কোথায়? নিশ্চয় আপনার এ জরীপের উপর আমার যথেষ্ঠ সন্দেহ রয়েছে। এত কাঠোর নিরাপত্তা ও দমন নীতির পরও মুজাহিদরা লয় প্রাপ্ত হয়নি। দেশময় চলছে তাদের তৎপরতা। এই তো মাত্র কিছু দিন আগে একদল স্বশস্ত্র অশ্বারোহী মুজাহিদ শিয়ান মরুভূমি পেরিয়ে যাচ্ছিল। তাও রাতের আঁধারে নয়, দিবালোকে। তখন আমাদের আর্টেলারী প্রধান তাদের অগ্রযাত্রা বাধা দেয়ার জন্য তাদের পিছু পাঠিয়ে দেন ট্যাংক বহর। মুজাহিদরা তাদের উপর উল্টো আক্রমন করে সব কজন হত্যা করে তাদের অস্ত্র-সস্ত্র ও গোলা বারুদসহ ট্যাংকের ভিতর যা কিছু ছিল সব

ছিনিয়ে যায়। ভাগ্যিস ট্যাংকের কোন যন্ত্র পাতি নষ্ট করেনি। এর তিন দিন পর আর এক বিশাল ট্যাংক বাহিনী পাঠিয়ে ওগোলাকে উদ্ধার করে। তবে এর প্রতি শোধ নেয়া হয়েছে এর কিছু দিন পর ৩৪ জন মুজাহিদ হত্যা করে। সে সময়ও এরা শিয়ান মরু ভূমি পারি দিয়ে মারবানিয়া পর্বত মালার দিকে যাচ্ছিল। এ হামলায় যদিও আমরা বিজয় অর্জন করেছি কিন্ত মাসুল দিতে হচ্ছে প্রচুর। এ ৩৪ জনকে হত্যা করতে আমাদের মিজাইল খরচ করতে হচ্ছে ৭ টি। বার বার টারগেট মিস করার কারনেই এমনটি হয়েছে এতে আমাদের মেরুদণ্ড কুঁজু করেদিয়েছে, সেনাবাহিনীর ভীত নেড়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় মুজাহিদদের দৌরাত্ব অনেকগুনে বেড়ে যাবে। আমার প্রশ্ন এরা যদি এতই দুর্বল হত তাহলে এত বড় একটি কাজ কি করে করতে পারল ?

এমন কি কাজ করেছে এরা একে বারে সেনা বাহিনীর ভিতে ভূমিকম্প লেগেছে ?

আহঃ বড়ই দুঃখ আর পরিতাপের বিষয়, তাহল আমরা ইন্টালিজেন্স এর মাধ্যমে জানতে পারলাম মারবানিয়া, মারদানিয়া, মারবেনিয়া ও মাদাসিকো পর্বতমালায় মুজাহিদদের শক্তি শালী ঘাটি রয়েছে। এসব ঘাটি উৎক্ষাত করার জন্য ৫০ জন শক্তিশালী কমান্ডো বাহিনীর একটি গ্রোপ বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র, গোলা-বারুদ ও গানশীপ, হেলিকপ্টার উক্ত পর্বতমালায় অভিযান চালায় এঅভিযানে মুজাহিদরা ৫০ জন কমান্ডো ৩ জন পাইলট ও কাপ্টার আটক করেছে এবং ২ ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়েছে এর মধ্যে জেলখানায় মুজাহিদসহ যত মুসলমান আছে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। অন্যথায় জিম্মিদেরকে হত্যা করবে এবং সামরিক স্থাপনার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে। আমরা পরামর্শ করে জিম্মিদের মেরে ফেলার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছি। এ সংবাদে সারা দেশে একটি চাপা অস্থিরতা বিরাজ করছে। সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে। সামনে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে কেউ যেতে চাবে না। দেখতো কত বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার এবং স্বশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ইচ্ছা ছিল উদ্ধার কর্মি পাঠাতে, কিন্তু কমরেড রোগানের চিন্তার সাথে আমাদের

চিন্তার মিল হয়নি বিধায় আমাদের চিন্তায় ছাই ঢাকা পরেছে। আর সর্বাধিনায়কের চাকরীই তো চলে গেছে। সে এখন কারাগারে। এসব আচারণ খুবই মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। সে মুখে প্রকাশ করছে দুঃখজনক, কিন্তু চেহারায় তা প্রকাশ পাচ্ছে না। ওর বান্দবীটি এক বার আমার দিকে আবার জমিলিনার দিকে তাকিয়ে কথা গিলছিল। সে আরো বলল-

আমার মনে এসেছে পঞ্চম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষাতে একটি প্রশ্ন এসেছিল, পরী ও বনমানুষের দেশ কোনটি তা বুঝিয়ে লিখ ? এতে নম্বর ছিল ১০ টি। আমি উত্তর লিখেছিলাম পরীদের দেশ মারবেনিয়া ও মাদাসিকো আর বনমানুষের দেশ হল মারদানিয়া। এ উত্তর লিখায় আমাকে ৯ নম্বর দিয়েছিলেন। এখন আমার প্রশ্ন হল এমন দেওদানবের দেশে মুজাহিদরা কিভাবে এত বড় ঘাটি তৈরী করে থাকতেছে। যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া নিশ্চয় তাদের মধ্যে আরো কিছু শক্তি আছে যা ধরা ছোঁয়া ও অনুধাবন করার বাইরে।

মিস্ জামিলিনার কথা শোনে আমার একিন হয়ে গেল যে, কাবুলের মুজাহিদরা মারবানিয়া গিয়ে পৌঁছেছে। দীর্ঘ দিন যাবত আমি এ আশংখায় ছিলাম, মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী তার বাহিনী নিয়ে সে খানে পৌছেন কিনা। মেয়েটির সংবাদ শোনে চিন্তা মুক্ত হলাম আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তার পর মেয়েটির চিন্তাকে আরো একটু শানিত করে দিলাম এই বলে যে, মুজাহিদদের মধ্যে বাড়তি যে শক্তিটি নিয়ে আপনি ভাবতেছেন তা হল ঈমানী শক্তি। যে শক্তি সমস্ত শক্তির উর্দ্ধে যে শক্তির মোকাবেলায় অন্য কোন শক্তি কাজ করে না। সে বলল আমি অঙ্গিকার করতেছি এখন থেকে ঈমানী শক্তির পক্ষে কাজ করব। বাকি আলাপ পরে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ আপার তো কোন পরিচয়ই দিলেন না। এখন বিদায় হয়ে যাচ্ছেন। উত্তরে সে বলল এহল আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী। নাম মিস কেনিডলী। আমরা এক সাথেই থাকি। তবে ফরাক এতটুকু, আমি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষনা করি আর করি রাজনীতি। আর আমার বান্দবী মস্কোর সবচেয়ে বড় অর্থশালী ব্যক্তি, যার মাসিক আয় ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। সে হোটেল গার্ডেনের মালিক। পর্যটন এলাকায় এর চেয়ে অত্যধুনিক ও বড় হোটেল আর নেই। দেশ বিদেশের বিত্তশালীরা উক্ত হোটেলে মাসে ২/১ বার না এসে থাকতে পারেনা। আমাদের মুক্তি দাতা মিঃ লেনিন ও

এখানে আসেন আর কেনিডলীর সাথে রয়েছে ব্যক্তিগত খাতির। এত টুকু বলে আমাকে বিদায় দিয়ে দিল। আমি চলে আসার কিছুক্ষণ পর দুজনেই জেল খানা ত্যাগ করল।

পঁয়ত্রিশ

মাওলানা আঃ সাত্তার বলখী সাহেব,কমান্ডার মাওঃ আলাউদ্দীন শরাফী ও জয়নাল আবদীন হাক্কানীকে ডেকে বললেন, চার জন জিম্মিকে আপনাদের তত্বাবধানে রাখবেন। তাদের প্রতি সদা সর্বদা সর্তক নজর রাখবেন। নিরস্ত্র রাখবেন, ঈমানের দাওয়াত দিবেন। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। তাদের আরাম আয়েশের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। ভাল বাসার দ্বারা তাদের অন্তর জয় করে তাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবেন। মাওলানার কথা শেষ হলে কমান্ডার আলায়েভ বললেন, হযরত ! আপনার সবগুলো কথা ঠিক আছে, তবে আপনার প্রথম কথার উপর আমার পরামর্শ হল চার জন জিম্মিকে চার জনের হাওলা করে দেন। এতে তাদের শক্তি খর্ব হবে, পরার্মশ করে কিছু অঘটন ঘটাতে পারবে না। আর এক ফায়দা হল চার জনের ভালবাসা গড়ে উঠবে চার জনের সাথে। এভাবে কিছু দিন রাখার পর তাদের প্রতি আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা হয়ে যাবে। তার পর আমরা তাদের এক সাথে থাকতে দেব। তাছাড়া বাকি যে পরার্মশগুলো দিয়েছেন তা সবই ঠিক ও যথার্থ। এর উপর আমল করতে হবে পুরাপরি। এখন চিন্তা করে একটা ফায়সালা দিয়েদেন। মাওলানা সাহেবের অন্তরে কমান্ডার আলায়েভের কথাগুলো গেঁথে গেল। তাই তিনি মাওঃ আলাউদ্দীন শরাফী, জয়নাল আবদীন হাক্কানী। কমান্ডার আলায়েভ ও ফাগুদায়েভের উপর জিম্মিদের দেখা-শোনার দায়িত্ব দিলেন। ওরা সবাই নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তাদের অমায়ীক আচার ব্যবাহার দেখে অল্প দিনের মধ্যেই জিম্মিরা ইসলাম গ্রহণে ধন্য

হলেন। হেলিকপ্টার যে টিলায় অবতরণ করে ছিল পাইলটের পরামর্শে কপ্টারের উপরে ডালপালা ও লতা পাতা দিয়ে এক ছাউনির ব্যবস্থা করলেন, যেন উপর থেকে কপ্টার হিসাবে কোন দূর্বীনে কেস করতে না পারে। এবার চলল পাইলট প্রশিক্ষণ। কপ্টারের ভিতর বসে বসে ইঞ্জিন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর নিয়মিত ক্লাশ চলছে। মুজাহিদরা এবার খুশিতে বাক্ বাকুম। যে প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ হত বিমান বাহিনীতে ভর্তি হয়ে। আজ গনিমতের কপ্টারে বসে সে শিক্ষা নিচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে আদায় করছেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা।

কিছু দিনের মধ্যেই যান্ত্রিক বিষয়ে বেশ জ্ঞান আহরন করলেন মুজাহিদরা। এখন সবাই মুক্ত আকাশে পাখীর মত ডানা মেলে বিচরণ করতে চায়। এক দিন দুজন পাইলট এবং তিন জন মুজাহিদ নিয়ে কপ্টারটি উম্মুক্ত আকাশে উড়াল দিল। এবার তাদের অনন্দ দেখে কে ? শুধু পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিতে লাগল। এভাবে অল্প অল্প করে কিছু দিন উড়ার পর জ্বালাণী সংকট দেখাদিলে পাইলট বললেন জীবনের ঝুকি নিয়ে জ্বালানি সংগ্রহের চেষ্ঠা করা যেতে পারে। মাওলানা কিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে কোথা থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন ? পাইলট উত্তর দিলেন আমাদের একদম নিকটতম দেশ হল কিরগিজিয়া। আমরা যে পর্বতে অবস্থান করছি এর সোজা পূর্ব দিকের দু তিনটি পর্বতের পরই দেশটি অবস্থিত। সেখান থেকে আমি অনেকবারই জ্বালানি নিয়েছি। কিজগিজিয়া শহরের উত্তরে রয়েছে ফ্রাঞ্জে নগরী। সেখান থেকেও জ্বালানি নিয়েছি।

তবে টাকা পয়সা ?

যদি ভাগ্য ভাল থাকে তবে টাকা নাও লাগতে পারে আর যদি ভাগ্য খারাপ হয়ে যায় তা হলে কপ্টারসহ আটক হতে হবে। তবে একটি বুদ্ধি খাটিয়ে দেখতে পারি কোন সুরাহা করা যায় কি না।

সে বুদ্ধিটা শোনা যাবে। বুদ্ধিটা হল,আমি কপ্টারনিয়ে আকাশে উরে যাব। তার পর আমাদের সর্বাধিনায়কের নিকট ওয়ারলেছে বলব,স্যার আমরা মুজাহিদদের নিকট থেকে আটক কপ্টারটি উদ্ধার করেছি। এখন আমরা কিরগিজিয়ার আকশে উড়তেছি। জ্বালাণী সংকটের কারনে আসতে পারছিনা। আপনি যদি কিরগিজিয়াকে জ্বালাণী দেয়ার জন্য বলে দেন, তাহলে অন্য সময়ের মত জ্বালানী নিয়ে ফিরে আসতে পারি। একবার হয়ত এভাবে আম্মরা সাকসেস হতে পারি। পরবর্তীতে তা আর সম্ভব হবে না। পাইলটের কথা শোনে মাওলানা বললেন, ঠিক আছে একবারও যদি হয় তবে হোক। আপনি সে ব্যবস্থা করেন।

পর দিন সকাল ৯টায় আহারাদি সেরে মাওলানা বলখী ও কমান্ডার আলায়েভ আর দুজন পাইলট সহ কিরগিজিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই রাশিয়ান কমান্ডো পোষাক পরে আর দুটি গ্রেনেড নিয়ে কপ্টারে উঠে বসলেন। উঠার পূর্ব মুহুর্তে দু-দু রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে কামিয়াবির জন্য দোয়া করলেন। রেখে যাওয়া সাথীরাও কেঁদে কেঁদে তাদেরকে আল্লাহর কুদরতী হাতে সুপে দিলেন। কপ্টার তার চিরা চরিত অভ্যাস অনুযায়ী গগন ফাটা চিৎকার আরম্ভ করে দিল। তার কণ্ঠ স্বর তীব্র হতে হতে এক প্রলয়ন্ধরী আওয়াজের রূপ ধারন করল। তার পশ্চাত দিক দিয়ে জাহান্নামের লেলিহান নির্গত করতে লাগল এবং ধুলু বালি উড়িয়ে সাইমুম ঝড়ের সৃষ্ট করে আস্তে করে উপরে উঠে গেল। অতঃপর অন্য সব সাথীদের মাথার উপর দিয়ে একটি চক্কর দিয়ে খুব ধীর গতিতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আকাশে উড়ে পাইল্ট সুরাসিকো ওয়ারলেছ অন করে সর্বাধিনায়কের নকট র্বাতা প্রেরনের চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হলেন। অনেক চেষ্ঠা করেও যখন তাকে পেলেন না তখন সরা সরি হেডকোয়ার্টারের সদর দপ্তরে র্বাতা পৌছালেন যে আমরা ৩ জন পাইলট ও এক জন কমান্ডোকে নিয়ে কপ্টার সহ পালিযে আর্সাছ। বর্তমানে আমরা

কিরগিজিয়ার আকাশ সীমা পেরিয়ে মহাকাশে বিচরন করছি। আমাদের জ্বালানীর ব্যবস্থা না হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আকাশে সমাধি রচিত হবে। হেড কোয়াটার থেকে সরাসরি বার্তা আসল, আপনারা কিরগিজিয়া এয়ারপোর্ট থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করুন, আমরা এখনই কিরগিজিয়াকে তেল দেয়ার জন্য অনুরুদ বার্তা প্রেরন করছি।

পাইলট কাপ্টার নিয়ে কিরগিজিয়ার এয়ার্পোর্টি এর উপর দিয়ে বিপদ সংকেত দিয়ে অবতরণের লাইন চাচ্ছিলেন। কিরগিজিয়ার বিমান ঘাটি ছিল খুবই ছোট কয়েকটি বিমান ল্যেন্ড করার কারনে লাইন দিতে বিলম্ব হচ্ছিল। পাইলট নিরুপায় হয়ে সর্বশেষ বিপদ সংকেত দিয়ে দিলেন এবং সাথীদের সতর্ক করে বললেন আপনারা প্যারাসুড নিয়ে প্রস্তুত হন, কপ্টারটি আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। আরোহীরা ভয়ে ভিত হয়ে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেছিলেন। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে লাইন পেয়ে গেলেন। ঠিক তখনই আস্তে করে জমিন ছুয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাইলট বললেন, কপ্টারটি আর ১০/১৫ সেকেন্ড আকাশে থাকলে নির্ঘাত মারা যেতাম।

পাইলট কপ্টারটি তেলের ডিপোতে রেখে চলেগেলেন রেষ্ট হাইজে। তাদের জন্য নিয়ে এল উচ্ছমানের নাস্তা। সবাই তৃপ্তির সাথে নাস্তা করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এরই মধ্যে পাগলের মত ছুটে এল সাংবাদিকরা। পাইলট খুব কৌশলে মুজাহিদদের বিপুল শক্তির কথা বার বার জানানোর চেষ্ঠা করছেন পাইলটের উপস্থাপনায় এটাই বুঝাচ্ছিল মুজাহিদরা সুসংগঠিত হয়ে পর্বত গুলোতে বিশাল বিশাল ঘাটি তৈরী করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদিকে মস্কো বেতার থেকে একটু পরপরই বিশেষ বুলেটিন প্রচার করছে যে, মারবানিয়া ও আশপাশের সমস্ত মুজাহিদ ঘাটি সমূলে ধ্বংস করে পাইলট সুরাসিকো জিম্মিদেরকে ও কাপ্টার নিয়ে কিরগিজিয়া বন্দরে পৌছেছেন। জ্বালানি সংগ্রহ করে কিছু সময়ের মধ্যেই মস্কো এসে

পৌঁছবে। এ সংবাদের পর পরই শকুনের মত দলে দলে মস্কোর ইয়ারপোর্টে আসতে লাগল সংবাদিকদের দল। তাদের স্বাগত জানাতে সেনানিবাস সুসজ্জিত করলেন। বড় বড় নেতাগণও হাজির হতে লাগলেন সেনানিবাসে। শোনবেন তাদের থেকে মুক্তির ঘটনাবলী। একটু পর পরই সদর দপ্তর খবর নিতে ছিল। বিশ্রাম, তেল নেয়া সব মিলে প্রায় দু'তিন ঘন্টা সময় চলে গেল। আজাহাটি (গানশীপ হেলিকপ্টার) ১২ হাজার গেলন তেল পান করল। অতঃপর পাইলট সবাইকে নিয়ে আকাশে ডানা মেলল। আকাশে উঠার সময় ওয়ারলেছ শেটটি বন্ধ করে দিলেন।

একটি আরজ

আধাঁর রাতের বন্দিনীর ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড আপনাদের কেমন লাগল তা জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। আপনার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, গঠনমুলক সমালোচনা, পরামর্শ ইত্যাদি অল্প কথায় লিখে নাম ঠিকানাসহ আজই পাঠিয়ে দিন। পঞ্চম খণ্ডে আমাদের এই সিরিজ সমাপ্ত হবে। আর আপনাদের মন্তব্য গ্রন্থবদ্ধ করতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন ধরনের ত্রুটি থাকবে না, ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক

আধাঁর রাতের বন্দিনী ৫ম খণ্ডে পাঠক পাঠিকাদের হৃদয় জুড়ানো কাহিনী নিয়ে , বিদায়ের বার্তা জানাতে আসছে।

অপেক্ষা করুন,

আমাদের প্রকাশীত গ্রন্থ সমুহ

০১। আধাঁর রাতের বন্দিনী -------প্রথম খন্ড
০২। আধাঁর রাতের বন্দিনী ------দিতীয় খন্ড
০৩। আধাঁর রাতের বন্দিনী ------তৃতিয় খন্ড
০৪। খুনরাঙ্গা প্রান্তর ------------প্রথম খন্ড
০৫। খুনরাঙ্গা প্রান্তর ------------দিতিয় খন্ড
০৬। খুনরাঙ্গা প্রান্তর ------------তৃতিয় খন্ড
০৭। রাখাল বন্ধু --------------------------
০৮। পথ ভোলা সৈনিক ------------------

শীগ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে

০১। আধাঁর রাতের বন্দিনী ----------৫ম খন্ড
০২। খুনরাঙ্গা প্রান্তর ---------------৪র্থ খন্ড
০৩। রক্তে ভেজাকাশ্মীর --------------১ম খন্ড
০৪। রক্তে ভেজাকাশ্মীর --------------২য় খন্ড
০৫। রঞ্জিতের হেরেমে নুরজাহান-------------
০৬। রিক্ত পথিক -------------------------